মনোজ বসুর গল্প সমগ্র

আদি পর্ব

ডঃ ভূদেব চৌধুরী সম্পাদিত

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

ভূমিকা

—"...মানুষের জীবন হল গল্প। কত বেদনা, কত ঘটনা; সুখ দুঃখ রাগ-বিরাগ ভালোমন্দের কত ঘাতপ্রতিঘাত। ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার, একের সঙ্গে দশের, সাধনার সঙ্গে স্বভাবের, কামনার সঙ্গে ঘটনার সংঘাতে কত আবর্তন। নদী যেমন জলস্রোতের ধারা, মানুষ তেমনি গল্পের প্রবাহ।"—

—রবীন্দ্রনাথ

মনোজ বসু (নয় শ্রাবণ, ১৩০৮; পঁচিশ জুলাই ১৯০১) একত্র এক গোলায় তুলে বাঁধছেন তাঁর সারাজীবনের গল্পের ফসল। কম লেখা হয় নি তো, আর কত দিন ধরে লেখা! এ পর্যন্ত যে প্রথম মুদ্রিত গল্পের সন্ধান মিলেছে ১৩২৭ বাংলা সনের 'বিকাশ' পত্রিকায়, —'গৃহহারা' সে গল্পের নাম[১]; লেখকের বয়স তখন উনিশ; বয়ঃসন্ধির দিগন্তসীমায়। কিন্তু তখনো, এবং তারপরেও মনোজ বসু অনেক দিন ধরেই ছিলেন পদ্য-শিল্পী। গদ্যের, গল্প-সাহিত্যের রাজসভায় অভিষেক হয়ে গেল 'প্রবাসী'র আড্ডায়, —বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন বুকে জড়িয়ে ধরলেন, আর সজনীকান্ত দাস ও অশোক চট্টোপাধ্যায় টেনে নিলেন একই পাত্র থেকে বারোইয়ারি ফুলুরি খাবার রাজভোজে। 'প্রবাসী'তে সদ্য প্রকাশিত হয়েছিল তখন 'বাঘ' গল্প (বৈশাখ ১৩৩৮), তার ঠিক আগে 'বিচিত্রা'তে 'নতুন মানুষ' (কার্ত্তিক ১৩৩৭), তার পরে ক্লান্তিহীন মনের যাত্রা চলেইছে এগিয়ে নদীস্রোতের মতই; চার দশক পেরিয়ে পঞ্চমেও সে ক্ষিপ্রগতি। চল্লিশাধিক বছরের জীবন; —ব্যক্তির, জাতির, স্রষ্টার এবং সৃষ্টির। —তারই এখানে-ওখানে উল্টেপাল্টে দেখে রবীন্দ্রনাথের কথাই মনে আসছিল, —"নদী যেমন জলস্রোতের ধারা, মানুষ তেমনি গল্পের প্রবাহ।"

জীবনের উপান্ত বেলায় পৌঁছে পিছু ফিরে একবার সেই প্রবাহকে শিল্পী দেখতে চাইলেন, —বিলোল তরঙ্গভঙ্গে আদি-অন্ত কম্পিত কালের হাতের সর্বায়তন রূপটি। ফসল তোলার সঠিক সময় এখনো আসে নি; স্রষ্টার-লেখনী এখনো তাঁর হাতে ধরা। তাহলেও স্রষ্টাই তো আসলে শ্রেষ্ঠ উপভোক্তাও। উপনিষদের সেই রূপচিত্রটি মনে আসে,[২]—একই গাছের

১। দ্র. দীপকচন্দ্র—মনোজ বসু: জীবন ও সাহিত্য পৃ. ১২।

২। দ্র. শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪।৬।

একটি মাত্র শাখায় দুই পাখি, আর শাখাগ্রে তার পিপ্পল ফল ; এক পাখি খায় আর একটি চেয়ে চেয়ে দেখে।—মাঝে মাঝে মনে হয়, —তত্ত্বকথার সঙ্গে মিলবেনা জেনেও মনে হয়, —জীবনরসে আকণ্ঠ ডুবে স্রষ্টা যা রচনা করেন, সৃষ্টির মর্মলগ্ন হয়ে ঐ নিভৃত সাক্ষি-চৈতন্যই তার আস্বাদ প্রথম গ্রহণ করে। এই অর্থে সকল সার্থক সৃষ্টি কেবল স্রষ্টার আত্মরচনা নয়, আত্মসম্ভোগও। এখানেও মনোজ বসুর সেই আত্মরস আস্বাদনেরই প্রয়াস দীর্ঘসঞ্চিত সম্ভারের সঙ্গে নিজেকেও মহাকালের হাতে সমর্পণ করে'।

কিন্তু কোনো আস্বাদনই স্বতোসম্পূর্ণ নয়। উপনিষদের কথাই আবার মনে আসে[৩], —'একাকী আনন্দিত হওয়া যায় না' আনন্দের জন্য 'দ্বিতীয়'-কে 'ইচ্ছা' করতে হয়। রসের কারবারে শিল্পীর সেই চির আকাঙ্ক্ষিত দোসর 'সহৃদয় হৃদয়', —নিত্যকালের রসিক পাঠক-মন। কিন্তু তারও উদ্ভাস শিল্পীর অন্তর্লীন সাক্ষি-চৈতন্যের মতই স্বত-প্রচ্ছন্ন। লেখকই যেখানে রসিক, পাঠকের আস্বাদনকে সেখানে ইন্দ্রিয়গোচর মনের মুঠো ভরে পেতে তাঁর ইচ্ছে করে ; সকল পাঠকের সাক্ষ্য সংগ্রহ করতে মন চায় নির্দিষ্ট পাঠকের অনুভবের বৃন্তে ধরে। মনোজ বসুও তাই করতে চেয়েছেন। একজন পাঠকের চেতনাকে উপলক্ষ করে স্পর্শ করতে চাইছেন সার্বিক পাঠক-মনকে।

সবার মাঝে নিজেকে দান করে শিল্পীর এই অপরূপ আত্ম-আস্বাদনের মাধ্যম হবার আহ্বান এসেছে এই দীন পাঠকের কাছে। আনন্দের ভোজে দিন-মজুরির কাজ ;—মুঠোর পরে মুঠো ভরে গল্পের গুচ্ছ বেঁধে গুছিয়ে পসরা সাজিয়ে তোলা। প্রত্যেক পাঠকের, তথা সকল দেশকালের রসিক মনের কাছে স্বতোমূল্যময় এই গল্পশিল্প ; এই নূতন গ্রন্থন সূত্রে তারই গভীরে নিবেদিত হয়ে রইল এক ভাগ্যবান পাঠকের উপলব্ধি-দীপিত মানস-চারণা, শিল্পী যার মনোলোকে আপনাকে প্রতিবিম্বিত করে দেখার বরদান করেছেন।

গল্পগুলি সবই রসসম্পূর্ণ, রসিক মনের সেখানে অবারিত প্রবেশাধিকার। কিন্তু গল্প-উপভোগও বিশেষার্থে তো জীবনেরই উপভোগ ; যে-অর্থে, রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'মানুষের জীবন হল গল্প'। মনোজ বসুর গল্প-লোকে জীবন-খুঁজে-বেড়ানো আর-এক-পাঠকের অন্তরের ছায়া এই সঙ্গে যুক্ত হয়ে রইল।—এ কোনো 'সমালোচনা' নয় ; স্রষ্টার আনন্দ আর পাঠকের উপভোগ একত্র করে শিল্পি মনের ঈপ্সিত উপহার। সম্পাদকীয় মুখবন্ধে'র মূল্যও তার চেয়ে বিন্দুমাত্র বেশি নয়।

৩। দ্র. 'বৃহদারণ্যক'—১।৪।৩।

গল্পের রসও জীবনরস—সকল শিল্পেরই তাই। আর তার গোমুখী উৎস শিল্পীর—গল্প-বলিয়ের নিভৃত সংবিৎ। যে অপরিমেয় 'বেদনা, ঘটনা,' 'সুখদুঃখ' 'রাগবিরাগ' 'ভালোমন্দের' 'ঘাতপ্রতিঘাত' জড়িয়ে জীবনের সমগ্র সত্তা, সৃষ্টির পটে তার রেখামূর্তি তো শিল্পীর ব্যক্তিগত অনুভব-অভিজ্ঞতার রসে-রঙে ডুবিয়েই আঁকা! শিল্পের রসসন্ধান তাই বিশেষার্থে শিল্পীর নিভৃত আত্মসত্তারই আবিষ্কার। মনোজ বসুর বেলায় এ-কথা সমান সত্য; হয়ত কিছু অতিরিক্ত পরিমাণেও। প্রথম জীবনের গল্পলেখার স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন[৪], "আমার জীবনের অনেক স্বপ্ন অনেক আনন্দ ভরে আছে এই গল্পগুলির ভেতর।" সব বয়সের গল্পেই তাই, কোথাও হয়ত স্বপ্নের সঙ্গে মিশেছে হতাশা, কোথাও বা আনন্দের জায়গা জুড়েছে বেদনা! তবু গল্পের জীবনে আপন জীবনাবেগ যোজনা করেই গল্প লিখেছেন মনোজ বসু। অতএব গোমুখী থেকেই যাত্রা শুরু করা যাক:—

ব্যক্তিপরিচয় সর্বদাই শিল্পী সংক্ষেপে সারতে চেয়েছেন। তরুণ সন্ধানী একজন তারই সঠিক বিবৃতি দিয়েছেন[৫]—"যশোর জেলার ডোঙাঘাটা গ্রামের বিখ্যাত বসু পরিবারে মনোজ বসু জন্মগ্রহণ করেন। নিম্নবিত্ত একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারের সন্তান তিনি। সম্পদ সম্পত্তি বলতে যা বোঝায় তা কখনো ছিল না তাঁদের। কিন্তু খাতির-সম্মান ছিল প্রচুর।"

পিতা রামলাল বসু ভালো কবিতা লিখতেন, অন্যান্যের মধ্যে বঙ্কিমের সাহিত্যপাঠও তাঁর প্রিয় ছিল। ঐ সূত্রেই বাল্য বয়সেই কবিতা লেখায় মনোজ বসুর শিল্পি-প্রাণের প্রথম হাতেখড়ি হয়। স্কুলে থাকতেই গল্প একটা ছাপা হয়েছিল কোনো কাগজে। শিশুর নামে "বাজে লেখা কাগজ" এসেছে দেখে পোস্টমাস্টার মশাই তার সদ্গতি করেছিলেন নিজের মুদিখানার দোকানে ঠোঙা বেঁধে। সেই রাগে অনেক দিন শিল্পী আর কোনো লেখা ছাপতে পাঠাননি।[৬]

রাগ করেছিলেন ভাগ্যের বিধাতাও। আট বছর বয়সে বাবা লোকান্তরিত হলেন, তারপর গেলেন পরিবারের কর্তা জ্যাঠা-মশায়ও। জ্যাঠতুতো দাদারা সংসারের কর্ণধার; নিম্নবিত্ত জীবন বিত্তহীনতার সীমান্তস্পর্শী হয়েছে তখন। তেরো-চৌদ্দ বছর বয়সে কলকাতা এসে ভর্তি

৪। দ্র. ভবানী মুখোপাধ্যায়—'কাছে বসে শোনা'—'অমৃত' ২৯শে কার্ত্তিক' ১৩৭২, পৃ. ৫২।

৫। দীপক চন্দ্র—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ, ১৯।

৬। দ্র. মনোজ বসু—'গল্প লেখার গল্প'—জ্যোতিপ্রসাদ বসু সম্পাদিত পৃ. ৬৯।

হলেন রিপন কলেজিয়েট স্কুলে। ১৯১৯-এ ম্যাট্রিক পাশ করেন প্রথম বিভাগে একাধিক 'লেটার' নিয়ে। তারপরে আবার মফঃস্বলে পাড়ি জমালেন।—দরিদ্রের পক্ষে অর্থ চিন্তাই 'চমৎকার'; সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বাগেরহাট কলেজে আই. এ. পড়তে গেলেন আর্থিক সুবিধা পেয়ে। এক বছর সেখানে পুরো নষ্ট হয়ে যায় অসহযোগ আন্দোলনের ঝাপটায়। ১৯২২-এ আই. এ. পাশ করে আবার কলকাতা এলেন। এখনকার আশুতোষ কলেজের নাম তখন 'সাউথ সুবার্বন'; বি. এ. পাশ করলেন সেখান থেকে ১৯২৪-এ ডিস্টিংশন নিয়ে। তারপর শিক্ষক হলেন সাউথ সুবার্বন স্কুলে; "কুড়ি কুড়িটা বছর কাটল সেখানে,"—আক্ষেপ করে বলেছেন লেখক।[৭] তারপরে একদিন বেরিয়ে পড়েছিলেন লেখনী হাতে করে; গল্প-লেখার নেশা অন্যতম পেশায় রূপান্তরিত হল এবার।

কিন্তু মনোজ বসুর নিজের দেওয়া এই আটপৌরে হিসেব অঙ্কে নির্ভুল যদি হয়, তাহলে এ-সব কথা ১৯৪৪ বা তার কাছাকাছি সময়ের ঘটনা। আর গল্প-শিল্পীর রাজটীকা তিনি অর্জন করেছিলেন, দেখেছি, ১৯৩১-এই; একটানা গল্পলেখার এবং গল্প ছাপানোর প্রয়াসও চলেছে তখন থেকেই। ১৯৩২-এ প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল তাঁর প্রথম গল্পসংকলন 'বনমর্মর'; আর তারপরে 'নরবাঁধ' (১৯৩৩), 'দেবী কিশোরী' (১৯৩৪), 'পৃথিবী কাদের' (১৯৪০) এবং 'একদা নিশীথকালে' (১৯৪২) পুরো পাঁচখানা গল্প-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল লেখকের শিক্ষক জীবনের সীমায়।

কিন্তু এ-সবই তো ব্যক্তির কথা,—রামলাল বসুর পুত্র মনোজ বসুর জীবন-পঞ্জী। শিল্পী মনোজ বসুর খবর করতে হয় আরো গভীরে প্রবেশ করে। রানী চন্দকে অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন একদিন[৮] "কালি কলম মন, লেখে তিনজন।" সেই মনের ইতিহাসটি শতদল-মূর্তি; ভাঁজে ভাঁজে খুলে দেখতে হয় দলের পরে দল। জন্ম আর পারিবারিক সূত্রজাত উত্তরাধিকার-অভিজ্ঞতা তার একটি পরত, সবচেয়ে বিবর্ণ বাইরের ক্ষীণাঙ্গ পদ্মপাঁপড়ি কয়টি যেন। একেবারে কেন্দ্রে আছে মনের মধুকোষ দেশকালপাত্রানুভবের সযত্ন পত্রপুটে জড়ানো। শিল্পীও স্বয়ম্ভূ নন, সকল মানুষের মতই সামাজিক সত্তা তিনি। সেই বৃহৎ জীবনের আঙ্গিনায় "ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার, একের সঙ্গে দশের, সাধনার সঙ্গে স্বভাবের, কামনার সঙ্গে ঘটনার সংঘাতে" ক্ষণে ক্ষণে জেগে ওঠে তাঁর সৃজনবাসনাজর্জর মন; জীবন নিত্যনূতন জন্ম নেয়

৭। মনোজ বসু—'লেখকের জন্ম'—উল্টোরথ, পৌষ ১৮৮৫ শক। পৃ. ২২৩।

৮। অবনীন্দ্রনাথ ও রানী চন্দ 'জোড়াসাঁকোর ধারে' পৃ. ৭১।

সৃষ্টির পটে। এই সংঘাত, এই আবর্তনের উৎসে রয়েছে সমাজ—তার পরিপার্শ্ব, সময় এবং মানবিক উপকরণের অজস্র প্রভাব-সম্ভার নিয়ে। মনকে তারা জাগায়, জাগিয়ে লেখায়। কিন্তু মন নিজেই তো সবচেয়ে সজীব—তাই গ্রহণ-বর্জনের জীবন্ত লীলাবলেই সৃষ্টির আদল বদলায়; কেবল বাইরের রূপ নয়,—স্বাদুতার আন্তর চরিত্রও।

মনোজ বসুর 'মন' প্রথমেই যাকে মুঠো করে ধরলে,—সে তাঁর 'দেশ'—আপন জাগরণ-উন্মুখ চেতনার ধাত্রী এক বিশেষ প্রতিবেশ। নিজে বলেছেন[১],—"পাড়াগাঁয়ের ছেলে, বাড়ির সামনে বিল। ছেলে বয়স থেকে ঋতুতে ঋতুতে বিলের রূপ বদলানো দেখেছি। চৈত্র-বৈশাখে ক্রোশের পর ক্রোশ ধূ-ধূ করে। রাত্রিবেলা বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখতাম, দূরে আগুন জ্বলে জ্বলে উঠছে। আলেয়া নাকি ঐগুলো।...এই ভয়ঙ্কর বিল বর্ষায় সবুজ সজল—স্নিগ্ধ। দিগন্তব্যাপ্ত ধানক্ষেত আলের প্রান্ত শাপলা আর কলমিফুলে আলো হয়ে যায়। আল পেরিয়ে জলস্রোত বয়ে চলে, নৌকা-ডোঙা অবিরাম ছুটোছুটি করে। ধানবনের ভিতর থেকে হঠাৎ চাষীর গলার গান ভেসে আসে— সখীসোনার প্রেমকাহিনী।

"আবার প্রথম শীতে পাকা ধানে বিলের গেরুয়া রং বাঁক-বোঝাই ভারে ভারে ধান নিয়ে আসছে। ঘরে ঘরে পাল পার্বণ ভাসান-কবি-যাত্রাগান। ঢোল বাজছে এপাড়া-ওপাড়ায়, ধান খেয়ে খেয়ে ইঁদুরগুলো অবধি মুটিয়ে সারা উঠান ছোটাছুটি করছে।

"এই বিল ও বিলের প্রান্তবর্তী মানুষগুলো তাদের দুঃখ-সুখ আশা-উল্লাস নিয়ে আমার মন জুড়ে রয়েছে। বিশাল বাংলাদেশকে আমি চিনেছি এদের মধ্য দিয়ে।..."

মনের ইতিহাসের অভিনবতা ঐখানে, ঘটনার হিসেবে তার অঙ্ক মেলে না; অথচ নিজের সঠিক হিসেবটাও প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে নির্ভুল। মনোজ বসু দক্ষিণ বাংলার নিম্নভূমি অঞ্চলের,—সুন্দরবনের দিগন্তবর্তী জলজঙ্গলাকীর্ণ পল্লীভূমির সন্তান। কিন্তু কালের মাপে সে মাটির সঙ্গে একটানা যোগ তাঁর কতটুকু? কৈশোরের সূচনা-বিন্দু পর্যন্ত। তের-চোদ্দ বছর বয়স থেকেই তাঁর শারীর নিবাস তো সেই ভৌগোলিক সীমার বাইরে;—কলকাতা, বাগেরহাট শহর, কলকাতা। তারপরে ১৯৪৭-এর বিভাগের পর থেকে ধীরে ধীরে হতে হল ছিন্নমূল। তবু মনের টানের মূল ছিঁড়ল কই। বাংলাদেশে লড়াই-এর বারুদ যখন অগ্নিস্পর্শের প্রতীক্ষায়

১। দ্র. জ্যোতিপ্রসাদ বসু (সঃ) পূর্বোক্ত গ্রন্থ—পৃঃ ৬৯-৭০।

উদ্‌গ্রীব, তখনই গল্প লিখেছিলেন একটা 'বাড়ি যাচ্ছি : আজ হলো না তো কাল।'—কিন্তু এ তো শারীরিক সত্তার কথা—মনে মনে মনোজ বসু বাড়ি গিয়ে বসে আছেন চিরকাল,—সেই বাদাবন আর খাল বিল নদী-ঘেরা স্বপ্নলোকে তাঁর শিল্পি-মনের একমাত্র নিবাস,—সেইখানে তাঁর মর্মের মধুকোষ।

আর সে-মন, আগেই দেখেছি, উন্মুখ বয়ঃসন্ধির আলোড়নে কম্পিত কিশোর মন। রাধাকে স্মরণ করে চিরকালের কৈশোর-চরিত্র চিহ্নিত করে গেছেন বিদ্যাপতি :—"সৈসব যৌবন দুহুঁ মিলি গেল। হেরইতে দুহুঁ পথ দুহুঁ চলি গেল॥"—শৈশবের ধর্ম অন্তহীন মুগ্ধতা, আর প্রথম যৌবন নিজের সম্পর্কে অমেয় বিস্ময়ে আবিষ্ট। দুয়ের মাঝখানে কৈশোর এক অপরূপ সন্ধিলগ্ন, যেখানে শৈশবে-যৌবনে এমন মেশামেশি হয়ে আছে যাতে একে ধরতে গেলে ও হাত ফস্‌কে যায়, মুঠো করে পাওয়া যায় না কিছুই। শৈশবের মোহ আর যৌবনের বিস্ময়াবেশ জড়িয়ে জন্ম নেয় কৈশোরের প্রবণতা,— অনির্বচনীয়তাঘন এক রহস্য-চেতনা। মনোজ বসুর শিল্পি-মনের স্থায়ী নিবাস তাঁর কৈশোর চেতনাস্নাত পল্লীগ্রামের প্রকৃতিলোকে। সেই মূল অধিষ্ঠানভূমি হতে উৎসারিত হয়েছে অনন্য শৈল্পিক মন-প্রবণতা, মনোজ বসুর শিল্পদৃষ্টি যার বশে স্বভাব-রোমান্টিক।

অন্তরঙ্গ বন্ধু একজন বলেছিলেন,[১০]—"রোমান্সপ্রিয় লেখক তিনি, কিন্তু তাঁর রোমান্সে মিশিয়ে আছে গ্রাম-বাংলার একেবারে মাটিমাখানো আকৃতি, বিদেশী ফেস্‌-পাউডারের গন্ধ জড়ানো অন্য জগতের রোমান্স।" প্রতীচ্য সাহিত্য-রুচির স্পর্শে রোমান্স-রসের সঙ্গে প্রথম পরিচয় যখন হল, তারপরে এক সময়ে তার বাংলা অভিধা-পরিচয় নির্দেশ করা হয়েছিল 'অবাস্তব-মনোহর'। কিন্তু মনোজ বসুর গল্পের পরিবেশ ভূগোলের মত বাস্তব, যথা-যথ,—তবু বস্তুসর্বস্ব নয়।—শিল্পীর কৈশোর-বাসনার মোহ-বিস্ময়ঘেরা রহস্য-দৃষ্টি দিয়ে ছাঁকা বস্তুসারটুকু ঝক্‌ ঝক্‌ করছে তার আষ্টে-পৃষ্ঠে 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'র মত। মনোজ বসুর গল্পের পল্লীপ্রকৃতি, তার খাল বিল বাদাবন-ক্ষেতখামার—সব কিছুই ঠিকঠাক আছে, তার সঙ্গে অতিরিক্ত রসের রসদও জমেছে ; সেটুকু তাঁর কৈশোর-চেতনার রহস্যাকুল উৎকণ্ঠা আর আক্ষেপের রঙ্।

গ্রীষ্মরজনীতে বিলের গর্ভে আলেয়ার আলো দেখতে পাওয়ার নিখুঁত নিভু'ল কৈশোর-স্মৃতিটি শিল্পীর জবানিতে উদ্ধার করেছি আগে ; সেই সূত্রেই

১০। ভবানী মুখোপাধ্যায়—পূর্বোক্ত রচনা ও গ্রন্থ পৃ. ৫২।

তিনি বলেছেন,[১১]—"কল্পনা করতাম, কালো কালো ভয়াল অতিকায় জীবন বিলের অন্ধকারে গড়িয়ে বেড়াচ্ছে শিকার ধরার আশায়। হাঁ করছে, আর আগুন বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে। মুখ বন্ধ করলে আগুন নেই। পথিক গ্রামের আগুন ভেবে ছোটে সেদিকে, দপ করে আবার আর একদিকে জ্বলে ওঠে। পাগল হয়ে পথিক ছোটাছুটি করে, আতঙ্কে চেতনা বিলুপ্ত হয়। আলেয়ার দল তখন চারিদিক থেকে ঘিরে এসে ধরে।"—আলেয়ার বস্তুরূপটি কেমন ছাঁকা হয়ে গেছে কিশোর-কল্পনার ভয়-বিস্ময়-মোহাবেশ ঘেরা রহস্য-পুলকে। আর ঐ ছেঁকে-তোলা রহস্য-রসের মদাবেশ জমিয়েই গড়ে উঠেছে মনোজ বসুর 'আলেয়া' গল্প। গল্প আর গাল্পিকের জীবনভাবনা কত একান্তলগ্ন মনোজ বসুর গল্পে—এই শিল্পি-কথার সঙ্গে 'আলেয়া' গল্প মিলিয়ে পড়লে তা স্পষ্ট হবে।

মনোজ বসুর শিল্পি-চেতনায় অমর কৈশোরের রঙ-রূপ মর্মলীন হয়ে আছে,—তাঁর সার্থক গল্পে প্রায় সর্বত্র তাই বস্তুজমাট কাঠামোর মাঝেও রোমান্স-রস বিচ্ছুরিত; ঘন কালো মেঘের সীমান্ত ঘিরে যেন সূর্যরশ্মির সোনালি পাড়।

কথা হয়ত একটু বেশি বলা হল, কিন্তু তাতে স্পষ্ট হতে পারল শিল্পীর মনের ভূগোল; গোটা পরিণত জীবন শহর-নগরের বাসিন্দা হয়েও কেন তিনি চিরকাল পল্লীপ্রেমী স্বভাব-গাল্পিক!

মনোজ বসুর 'মন'-এর কথা হচ্ছিল, কালির মধ্যে কলম ডুবিয়ে যে-মন একটানা গল্প লিখে লিখে প্রায় অর্ধশতাব্দীর সীমান্ত বেলায় পৌঁছাতে চাইছে। কিশোর বয়সের ভালোবাসা বাধা পেয়েছিল মনোজ বসুর জীবনে; রহস্য-কল্পনার পরমাশ্রয় বাবা গিয়েছিলেন আট বছর বয়সে; পরবর্তী পারিবারিক জীবনযাত্রায় মনের রঙ ব্যথা-মলিন হতেই পারত,—কেবল হার্দিক অভাববোধে নয়, দারিদ্র্যের অনটনেও। আর তেরো চৌদ্দ-বছরে তো ছাড়াছাড়ি হল ঐ ভালোবাসার জগতের সঙ্গে। ভালোবাসা মরে নি কোনোদিন; কিন্তু সেই প্রাথমিক আক্ষেপের প্রচ্ছন্ন অনুভবও তার মর্মলীন হয়ে আছে। 'বাঘ', 'রাত্রির রোমান্স' কিংবা 'রায় রায়ানের দেউল', 'মাথুর' প্রভৃতি গল্পে তার আশ্লেষ কারুণ্যমেদুর; যেন রোমান্সের অকারণ-বিষাদের তারে মৃদু অনুভবের মূর্ছনা।

কিশোরের মন স্বভাবে রহস্যাকুল,—চারপাশের রঙ-রূপ তাকে দশহাতে

১১। জ্যোতিপ্রসাদ বসু (সঃ) পূর্বোক্ত গ্রন্থ—পৃ. ৬৯-৭০।

হাতছানি দিয়ে ডাকে। কিন্তু মানুষের রহস্য আরো দুরবগাহ, আরো অতলান্ত। ভরাযৌবনের বিস্ময়-আলোড়ন নিয়েও তার গভীরে পৌঁছানো সহজ নয়। মনোজ বসুর গল্প-কল্পনায় মানুষের অবস্থান তাই প্রকৃতির পরে। শৈশবের মুগ্ধ কল্পনা নিয়ে জন্মভূমির প্রকৃতি-পরিবেশ চেতনার আকণ্ঠ তিনি পান করেছেন,—ধীরে ধীরে সেই মুগ্ধতার দিগ্বলয় ঘিরে জমাট বেঁধেছে রহস্যানুভবের রোমান্স। অন্যপক্ষে মনোজ বসুকে মানুষ-দেখা চোখ দিয়েছে তাঁর বয়ঃসন্ধির অঙ্গলগ্ন যৌবন চেতনার সহজ বিস্ময়-বোধ। মানুষ কত বিচিত্র, অপরূপ, কত জটিল দুর্বোধ্য, তবু কত মন-অভিরাম। মানুষের কথা ভাবতে গিয়ে খেই হারিয়ে যায়, তবু মানুষ খুঁজে বেড়াতে কি অপরূপ ভালোই না লাগে।—মনোজ বসুর গল্পে মানুষ খোঁজার বিস্ময়-মন্থিত রহস্যাবেশই মুখ্য মানবিক রস। ধানবনের ভেতর থেকে হঠাৎ যে না-দেখা মানুষের গলায় ভেসে আসে সখী সোনার প্রেমকাহিনীর গান, কিংবা পাকা ধানে ধানে গেরুয়া-রঞ্জিন বিলের বুক বেয়ে বাঁক বোঝাই করে ধান ঘরে নিয়ে আসে যে মানুষ— দূর হতে যার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ-ফেরানো যায় না; খুব-চেনা মানুষকে গোধূলি আলোয় অনেক দূর থেকে দেখলে তার চারপাশে যে রহস্যমেদুরতা ঝরতে থাকে,—মনোজ বসুর গল্পে মানুষের সেই কৈশোর-পুলকাঞ্চিত অপরূপ রূপ—ঠিক অবাস্তব মনোহর নয়, বস্তুসার-সুরভিত এক অভিরাম আবেশ।

'দেশ' আর 'পাত্রে'র কথা হল,—শিল্পি মনের আলম্বন যে পরিবেশ, আর যত মানুষ—তাদের কথা। সব শেষে আসে কালের প্রসঙ্গ—যা সবচেয়ে জরুরি। কাল আসলে শিল্পীর জীবন-কল্পনার মনোরথ, নিরন্তর গতিচঞ্চল তার চক্রাবর্ত। কালে কালে মানুষ পাল্টায়, প্রাকৃতিক পরিবেশ আর সমাজেরও বদল হয়; সকল পরিবর্তনের ধারক আর নিয়ামক শক্তি মহাকাল। 'রিপ ভান উইন্‌কল্‌'-এর বিদেশী গল্পের কথা মনে পড়ে,—মহাকালের বাস্তব চরিত্র আঁকা হয়েছে সেখানে স্বপ্নলোকের গল্প দিয়ে।—

আল্‌পস্‌ পর্বতের শিখরে শিকার করতে গিয়ে রহস্যাতুর রাতের পান-ভোজন শেষে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিল রিপ ভান। জেগে উঠে ভোর বেলা দেখে মরচে-ধরা পুরোনো এক বন্দুক পড়ে রয়েছে তার নতুন বন্দুকের জায়গায়, শিকারি কুকুরটি পলাতক—আর আশে পাশের পায়ে-চলা পথও আগাছা জঙ্গলে ছেয়ে গেছে। অনেক কষ্টে উপত্যকায় নেমে রিপ দেখতে পায় রাস্তাঘাট, বাড়ি ঘরদোর সব পালটে গেছে; লোকগুলোও সব তার অচেনা। অথচ এ যে তার নিজেরই গ্রাম তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নিজের

বাড়ির ভাঙা ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসে বুড়ো এক অচেনা কুকুর। রিপ নিজেও কি তার চেনা! আয়নার সামনে দাঁড়ালে সে দেখতে পেত, নড়বড়ে দেহের ওপরে ঝুলছে মাথাভরা পাকা চুল,—মুখ জোড়া পাকা লম্বা দাড়ি।—চারপাশে এই অনপনেয় রহস্যের যবনিকার চাপে রিপ যখন পাগল হবার জোগাড়, তখনই দেখা হয়ে গেল তার নিজের মেয়ের সঙ্গে—মেয়ের পাশে মেয়ের ছেলে। সবিস্ময়ে রিপ ভান শোনে, তার শিকার করতে যাওয়া আর ফিরে আসার মধ্যে কেটে গেছে পুরো কুড়ি বছর। তারই মধ্যে তার স্ত্রী মরেছে, মেয়ের বিয়ে হয়েছে তার আগে; আজ স্বামিপুত্রে ভরা তার সংসার।

রিপ ভান কী ঐ কুড়ি বছর ধরেই ঘুমিয়েছিল?—সে কোন্ যাদুমন্ত্রে? —সে কথা গল্পে বলা নেই, আসল যাদু তো কালের হাতের নিপুণ রচনা। প্রতিক্ষণে সে পালটে দিচ্ছে মানুষকে তিলে তিলে, পাল্টাচ্ছে মানুষের পরিবেশকেও; আমাদের অসাড় চেতনা তার খোঁজ রাখে না। চোখের ওপরে শিশু কিশোর হয়, কিশোর যুবা; কিংবা প্রাবীণ্য, প্রৌঢ়তা, বার্ধক্য একের পর এক আসে দেহমন ছেয়ে—অন্যমনস্কতায় তাকে প্রায়ই এড়িয়ে যাই। দেহের পরিবর্তন তবু আচমকা চোখে পড়ে যায় থেকে থেকে,—রিপ ভান-এর চুল দাড়ির মত, কিংবা তার চারপাশের পাল্টে যাওয়া ঘর বাড়ি রাস্তার মত। কিন্তু আসল পরিবর্তন তো মনের, অন্তর-চরিত্রের; কালের হাতের গোপন সে কারিগরি রহস্যাচ্ছন্ন হয়ে থাকে,—এক ঘুমে রিপ ভানের মত জীবনটাকে সাবাড় করে দেয়। চেতন মনের ওপরতলায় সেই নিরন্তর পরিবর্তমানতার ছাপটি ধরা পড়ে ক্বচিৎ। তবু সবার অগোচরে জীবনকে সে বিচিত্র করে তোলে ঐ নিয়ত পরিবর্তনের রঙেরসে ভরে দিয়ে।

যশোরের গ্রাম আর গ্রাম্য জীবনকে মনোজ বসু ভালোবেসেছিলেন কিশোর বয়সের মন্ময় অভিলাষের বাঁধনে; সে ১৯১৪-১৫ সালের কথা। 'বাঘ' গল্প প্রকাশের সময়ে তাঁর বয়স ত্রিশ বছর; তারপরে এ পর্যন্ত কেটেছে আরো বছর বিয়াল্লিশ। এই দীর্ঘ সময়ে ব্যক্তির রূপ পালটেছে দেহের প্রতি অবয়বে; কিন্তু মনের খবর কে রাখবে? সেদিনের কৈশোর আজ বার্ধক্যের সীমান্তলগ্ন। কিন্তু তারও চেয়ে বড় কথা—যে সমাজ, যে মানুষ, সর্বোপরি যে প্রকৃতি মনোজ বসুর মনকে সেদিন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছিল মদির ভালোবাসায়—যে ভালোবাসা আজও তাঁর মজ্জাগত,—সেই মানুষ, সেই সমাজ, সে প্রকৃতি আজ কোথায়? এই নিরন্তর পরিবর্তনের স্রোতে শিল্পীর চিরন্তন জীবনানুরাগের চরিত্র এবং প্রকাশের ভাষাও কি পালটে যায় নি থেকে থেকে?

সৃষ্টির রঙরসের সকল বৈচিত্র্য—সকল নিত্যনবীনতার প্রাণ-উৎস তো ঐখানে ; ঐখানে নিহিত তার দ্বৈতাদ্বৈত স্বভাবও। শিল্পীর যৌবন-চেতনার সীমান্ত পর্যন্ত জীবনানুভব ও অভিজ্ঞতার চাপে তৈরি হয় তাঁর আন্তরিক প্রবণতার অপরতন্ত্র বনিয়াদ ; মনোজ বসু যার প্রভাবে আযৌবন নগরবাসী হয়েও স্বপ্নাবিষ্ট পল্লীজীবনের গাথাকার। বলেছেন,—একেবারে প্রথম যুগে, গ্রামীণ মানুষের "বিরহে বিষাক্ত হয়ে উঠত শহরের কলেজ-জীবন। হঠাৎ মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ হয়ে এদের মাঝে অজ্ঞাতবাসে যেতাম। যেন ইট পাথরের শুকনো ডাঙা থেকে ডুব সাঁতার দিতে যেতাম জীবনের রসপ্রাচুর্যের ভিতর।" সেই ডুব সাঁতার কাটা বন্ধ হয়নি কোনো দিন মনোজ বসুর গাল্পিক মনের ; ঐটুকু তাঁর শিল্পি-চরিত্রের অক্ষয় ভিত।

কিন্তু তাতেই শেষ নয় ; মহাকাল অনুপ্রবেশ করেছেন সেই মৌল জীবন-চেতনার গভীরে—মনের পটে স্রোতের পর স্রোতের টানে এসেছে নূতন পরিবেশ, নতুন অভিজ্ঞতা, নিত্য নবীন নরনারীর দল,—প্রতি বারে তারা নতুন দোলা জাগিয়েছে সৃজন-প্রেরণার গভীরে, সৃষ্টির পাত্রে মন আপনাকে ছড়িয়ে দিয়েছে নব নব প্রতিক্রিয়ার বিচ্ছুরণে। আর সে মনও স্থাণু নয়, কালের যাদুকরী কলাগুণে চলতে চলতে জীবনকে সে কুড়িয়ে নিয়ে জমিয়ে গেছে গল্পের পর গল্পের পত্রপুটে। তাতে কেবল রসের তারতম্যই ঘটেনি,—পার্থক্য ঘটেছে বাণী, বাক্‌রীতি এবং বিন্যাসের আকার-প্রকারেও।

ঐক্যের মধ্যে এই বৈচিত্র্যের উদ্ভাস নিয়েই মনোজ বসুর গল্প-শিল্পের পরিপূর্ণতা।—প্রকৃতিমুগ্ধ কিশোর-প্রেমিক চেতনার অবিচল আবেশ-দৃষ্টি তার সাধারণ ভাব ভিতটি রচনা করেছে, আর কালের গতির তালে-তালে দুলকি-চালে-চলা জোনাকি মনের বিচিত্র চাঞ্চল্য একঘেয়েমির অসাড়তা কাটিয়ে গল্পরসের স্বাদেগন্ধে জমিয়ে তুলেছে ক্রমবিকাশমান সম্ভাবনার প্রত্যাশাপূর্ণ উৎকণ্ঠা।

মনোজ বসুর গল্পে জীবনরসের আস্বাদনও তাই সম্পূর্ণ হতে পারে সেই চলমানতার তালে এগিয়ে গেলে তবেই ;— সকল সার্থক শিল্পাস্বাদনের পক্ষেই একথা সমান সত্য। অন্যপক্ষে সৃষ্টির জগতে কালের চলার হিসেব রচনার সন-তারিখের ঠিকুজি মিলিয়ে চলে না। শিল্পীর মনের বয়স—কাল-প্রেরণার বশে স্ফুরিত তাঁর নবতর মনোভাবনার বিকাশের পরিচয় নিয়েই কালের যাত্রার অম্লান স্বাক্ষর। শিশু যেদিন কিশোর হয়, কিংবা কিশোর এসে পৌঁছায় যৌবনের তোরণ-দ্বারে,—সেদিনকার অভিব্যক্তি তো স্বতোভাস্বর ! যেন জীবন-স্রোতের এক একটি বাঁক ; নদীর ধারাকেও তো চিনি তার বাঁক ফেরার মোড়ে মোড়ে ঘুরেই। কালের মোড় ফেরার স্বাক্ষরও শিল্পীর চেতনা-বাহিত হয়ে

যখন গল্পের শরীর-মনে সুরেখ হয়ে ওঠে, তখনই তার রূপ-রসের আস্বাদনে আসে যুগান্তর!

মনোজ বসুর গল্প-শিল্পের অঞ্জলি ভরে শিল্পীর আন্তর রহস্যকেই পান করা যাবে,—তাঁর নব নব রূপান্তরকে আবিষ্কার করা সম্ভব হবে কালচেতনা-প্রবাহের বাঁকে বাঁকে মোড় ফিরে,—পাঠক-চৈতন্যের এই রস-বাসনা বশেই এবার সজ্জিত হবে তাঁর ক্রমবিসারী সৃষ্টির পসরা। প্রথম খণ্ডে সংগৃহীত হচ্ছে সর্বমোট ত্রিশটি গল্প; 'বনমর্মর', 'নরবাঁধ', 'দেবী কিশোরী', 'পৃথিবী কাদের', 'একদা নিশীথকালে', —এই পাঁচটি সংকলনে ধৃত গল্পের মালা।

এই বিন্যাসের রস-উৎস সন্ধান করলে শিল্পীর চেতনায় কালের হাতের স্বাক্ষরটি আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে: মোটামুটি এই গল্পমালার গহনে দোলায়িত হয়েছে যে-জীবন, উনিশ শো ত্রিশের দশক হতে বিয়াল্লিশ পর্যন্ত কালস্রোতের বিচিত্র আলোড়নে তার বক্ষমূল স্পন্দিত। দ্বিতীয় যুদ্ধের মধ্যাহ্নতাপ সবে অনুভূত হতে আরম্ভ করেছে। ১৯৪২ ভারতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে চরম উজ্জীবনের উপান্তভূমি; আলোচ্য গল্প প্রবাহের রচনাকাল-সীমায় সেই তরঙ্গ-অভিঘাত এসে পৌঁছায়নি জাতীয় জীবনের বেলাভূমিতে। তাছাড়া মনোজ বসু ঐতিহাসিক নন; এমন কি ইতিহাসের সচেতন অবধারকও নয় তাঁর শিল্পি-চেতনা। বাংলাদেশের আপন-ভোলা সেই চিরকেলে গল্প বলিয়ে একজন,—বাউল-দরবেশের মত মনে মনে হেঁটেছেন জীবনের পথে-প্রান্তে, কখনো স্নিগ্ধ ছায়াবেশে আবিষ্ট—কখনো বা অনাবৃত উত্তাপে প্রখর পদক্ষেপে।—কিন্তু সর্বদাই তাঁর এই পায়ে-চলা পথ ছুটেছে জীবনের পিছু পিছু,—যে জীবনের নিভৃত মর্মতলে আপন ধ্যানাসন বিছিয়ে কালের অধিদেবতা ইতিহাসের পটে আত্মরচনা করেন গোপনে গোপনে,—যার রহস্য-দীপ্তি চিরকাল প্রথম উদ্ভাসিত হয়েছে এ দেশের সহজ মরমিয়া কবির অতন্দ্র-রসিক চেতনায়; আপন বুকের মাঝে চমকে উঠে যিনি বার বার একতারায় সুর ভরে গেয়েছেন 'মনের মাঝে অচিন পাখি কমনে আসে যায়।'—

—রসিক মনোজ বসু জীবনের সেই অচিন পাখির আসাযাওয়ার রহস্য-মেদুর ছন্দটি ধরতে ছুটেছেন তাঁর সহজে-আবেগ-প্রবণ মনের ফাঁদ পেতে। রামধনুরঙা সেই পাখির মর্মতলে ইতিহাসের হাতের ছাপটিও স্পষ্ট আঁকা, নানা রঙের পালকের ফাঁকে ফোকরে উঁকি ঝুঁকি দিতে চায়—স্পষ্ট ধরা দেয় না। মনোজ বসুর শিল্পি-চেতনার গহনবাসী অমর কিশোরটি জীবনের পালকে পালকে শিহরিত সেই রঙের খেলাটিই দেখেছে আপন-ভোলা তন্ময় ভাবালুতা ভরে; তার গহনলীন ইতিহাসের সঙ্গে কেবল

এক আশ্চর্য লুকোচুরি খেলা; তাঁর গল্পে ইতিহাসের ছবিও এই খেলা-রসে কম্পিত।

অন্তত শুরু হয়েছে তেমন করেই। 'বাঘ' গল্পটির কথাই ধরা যাক। গল্পের নাম শুনেই 'প্রবাসী'র দপ্তরে 'ছোটবাবু' শঙ্কিত হয়েছিলেন; লেখক আশ্বাস দিয়েছিলেন, 'নামটাই শুধু। গল্পের ভিতরে বাঘের গন্ধটুকুও নেই।' যা আছে, আসলে তা কালের হৃদয়লীন বেদনার মর্মরিত দীর্ঘশ্বাস,—কিন্তু প্রচ্ছন্ন গোপন এক ফোঁটা চোখের জল যেন হাসি-কৌতুকের মোড়কে লুকোনো।

তারাশঙ্করের গল্প-লোকের কথা মনে পড়ে। গ্রামীণ ভঙ্গুরতার সীমান্ত-ভূমিতে উদীয়মান যন্ত্রদানবের পীড়ন ও ঝংকার তাঁর গল্প-উপন্যাসে মহাকাব্যের কাঠিন্য যোজনা করেছে। মনোজ বসু গাথা-শিল্পের গল্পকার; তাঁর আটপৌরে লোক-ভাষার গভীরে সহজ সুরের টান, সরল কথায় দিগন্তলীন কৈশোর-স্বপ্নের আমেজ। তাই অত গাঢ় গম্ভীরতায় তাঁর মন টানে না; তবু বনকাপাসি গাঁয়ের তিনকড়ি বাঁড়ুজ্জের জীবনের দীর্ঘশ্বাস শেষ পর্যন্ত বুঝি আর অস্ফুট থাকে না,—ব্যথিত কালের বেদনায় সঞ্চারিত হয়ে গল্প-শেষের হাসির দিগন্তটিকেও আনমনা হাতের আলগোছ ছোঁওয়ায় মেদুর করে দিয়ে যায়।

তিনকড়ির জীবন নীরন্ধ্র বেদনার একটি নিপাট নকসা কাঁথা। পিতৃপুরুষের কালের চকমিলানো বাড়ি ভেঙ্গে পড়ছে—জীবন ভেঙেছে তারও আগে চৌচির হয়ে।—ছ'টি ছেলে একটি মেয়ে শেষ হয়ে গিয়ে অত বড় বাড়ির নির্জনতা ভরে আছেন কেবল তিনটি প্রাণী,—বুড়ো-বুড়ি, আর মরা মেয়ের সাড়ে সাত বছরের ছেলে মণ্টু। এই নিরবলম্ব দুঃখে টান-টান ছেঁড়া জীবনের কাঁথার 'পরে একটিই তো নক্সার রেখা ছিল—আজীবন সুরসাধনার তপস্যার ফল। কলের 'পিন' এসে তাকেও ফুটিয়ে দিয়ে গেল এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে। অশ্বিনী শীল সেতারের ঐ পিড়িং পিড়িং আর রামপ্রসাদী ছাড়তে বলেছিল বাঁড়ুজ্জেকে। কলের গানের তোড়ে সে-কথা তাঁর কানে যায় নি; কিন্তু মূক ভাষায় সে ধিক্কার মর্ম স্পর্শ করেছিল। সন্ধ্যা বেলায় নির্জন ঘরে সেতার নিয়ে বসেছিলেন বাঁড়ুজ্জে আপন মনে—মণ্টুও আজ তাঁকে ছেড়ে গেছে কলের গানের গ্রামজোড়া নেশায়। এমন সময় আবাল্য সহপাঠী বন্ধু রাম মিত্তির আসেন খড়ম ঠক ঠক করে—সবিস্ময়ে জিগ্যেস করেন, 'সুরটা পূরবী বুঝি?' পুরোনো কাল ঐ রাম মিত্তির আর তিনকড়ি বাঁড়ুজ্জের হাত ধরে নিঃশব্দে চলেছে—নতুন কাল আসর জমিয়ে বসেছে যখন গ্রামের মাঝখানে 'সাহেব কোম্পানীর বানানো' কল-এর চারপাশে ভিড় করে।

এই তো সেই যুগসন্ধি—পুরাতন গ্রামীণতার বিসর্জনের বাজনা বাজছে যখন নূতন যান্ত্রিক উদ্দীপনার পাদপীঠে। বিদায় কেবল পুরাতনের নয়—বিদায় সাধনার, বনেদিয়ানার, মানবিকতা এবং মানসিকতার। সুরের শিল্প-লোকে ব্যক্তির তপস্যার বদলে এলো ভুঁইফোঁড় যন্ত্রের কারিগরি—তপস্যার আকাঙ্ক্ষাকেই কেবল সে অপহরণ করে না,—সেই সঙ্গে নেত্য ঠাকরুণের পেতলের ঘটি, আর মানবিক মূল্যকেও।

কিন্তু অত গভীর অর্থ খুঁজতে গেলে বুঝি মনোজ বসুর গল্প-রস উবে যায়,—না হয়ত কেমন ছড়িয়ে পড়ে তরল পারদের মত, কিছুতেই তাকে মুঠোয় তুলে ধরা যায় না। যেমন হয়েছে তাঁর অবিস্মরণীয় বড় গল্প 'নরবাঁধ'-এর বেলায়। মোহিতলাল মজুমদার দ্বিধাহীন ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন,[১২]—'মাথুর' আর 'নরবাঁধ'—ঐ দু'টি গল্পের পরে আর একটি গল্পও না লিখে বাংলা সাহিত্যের গল্প-লোকে মনোজ বসু অমরতার অধিকারী হতে পারতেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ দুটি গল্পেরই, বিশেষ করে 'নরবাঁধ'-এর, অকুণ্ঠ প্রশংসা করেও তার মধ্যে 'নিগূঢ় ঐক্যের অভাব' অনুভব করেছেন।[১৩]

এই দুই অনুভবই সত্য ; আর দু'য়ে মিলে-মিশেই গল্প-শিল্পী মনোজ বসুর অপরূপ চরিত্র-পরিচয়। একটি তার কৈশোর-স্বপ্নবিহ্বল রহস্যরসাকুল ভাবালু মনের ফসল,—আর এক জীবন-প্রেমী সহজ শিল্পীর অতন্দ্র কাল-চেতনার দান। পরিণত বয়স্ক শিল্পী বন্ধু ভবানী মুখোপাধ্যায়কে বলেছিলেন,[১৪] "বরাবর আমি অবিচার দেখে বিচলিত হয়ে উঠেছি। প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছি। যদি আমি সৈনিক হতাম, তাহলে মেসিনগান নিয়ে ছুটতাম, চাষী মজুর হলে ঘরে ফিরে এসে নিষ্ফল আক্রোশে নিরীহ বউকে ধরে ঠেঙাতাম, আর অসহায় অজ্ঞান শিশু হলে হয়ত কেঁদে ভাসিয়ে দিতাম।"

—মনোজ বসু এসব কিছুই করেন নি ; কারণ তিনি কথাশিল্পী। তাহলেও তাঁর শিল্পি-সত্তার মর্মলীন কৈশোর-ভাবালুতা স্বত উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ওপরের সহজ বাচনভঙ্গিতেই। সেই শাশ্বত কৈশোর-বেদনায় মনের লেখনী ডুবিয়ে-মিশিয়ে 'অবিচারে বিচলিত' গল্প লিখেছেন মনোজ বসু। কিন্তু

১২। দ্র. মোহিতলাল মজুমদার—'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' ('বুকল্যাণ্ড' প্রকাশিত) পৃ. ১১৮।

১৩। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (চতুর্থ সং) পৃ. ৬১৭।

১৪। দ্র. ভবানী মুখোপাধ্যায়—পূর্বোক্ত রচনা ও গ্রন্থ—পৃ. ৫২।

অবিচারেরও কি শেষ আছে?—ব্যক্তির বিরুদ্ধে সমাজের, দুর্বলের বিরুদ্ধে প্রবলের, কিংবা দরিদ্রের বিরুদ্ধে ধনীর অবিচার নয় কেবল—জীবনের মূল ভিত্তিটির বিরুদ্ধে হত-চেতন মানুষ-পশুর আত্মঘাতী অবিচারের হিসেব করবে কে?

সেই মর্মান্তিক কাহিনীই এঁকে দেখিয়েছেন মনোজ বসু 'নরবাঁধ' গল্পের পরিণামে—ছবির মত তা প্রত্যক্ষ, ছবির মতই ব্যঞ্জনাগর্ভ। দুটি আখ্যান জুড়ে একটি গল্প। প্রথমটি জীবন-প্রেমী স্বভাব-কিশোরের স্বপ্ন দিয়ে গড়া রোমান্স আর রোমাঞ্চে জমাট। সেই কোন্ প্রাচীন কালে জমিদার বল্লভ রায় দেবী চণ্ডিকার স্বপ্নাদেশ পেয়ে নরবলি দিয়ে বেঁধেছিলেন দুরায়ত্ত খালের ওপরে 'নরবাঁধ'—তাঁর দুর্দান্ত পাইক মৃত্যুঞ্জয়ের মাতৃহারা একমাত্র গচ্ছিত পুত্র কিশোর কুড়োনের বিশ্বাসী রক্তের স্রোতের ওপর।—কিংবদন্তী-ভিত্তিক রোমাঞ্চ কম্পিত দুর্ধর্ষ একটি রক্ত-টগবগে জীবন্ত গল্প। শুধু তাই নয়, নিটোল নিপাট একটি ছোট গল্প-ও সর্বাবয়বে পূর্ণতা পেয়ে সাঙ্গ হয়েছিল, যেখানে বল্লভ রায়ের গল্প শেষ করতে দ্বারিক মিত্র বলেছিলেন,—"জলের টানে ঘুমন্ত অবোধ বালকের চাপা কান্নার মতো শোনা যাইতে লাগিল। মাথার উপর মেঘ-নির্মুক্ত পূর্ণিমার চাঁদ। মাঝখানে আসিয়া দু'জনে [বল্লভ রায় এবং মৃত্যুঞ্জয়] প্রবল আকর্ষণে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল। তারপর জোয়ারের বেগে কে কোথায় ভাসিয়া গেল, তাহা কেহ জানে না।......"

ছোটগল্পের এমন নিখুঁত শারীর সম্পূর্ণতা মনোজ বসুর গল্পে বেশি নেই। শিল্পী তবু এখানেই গল্প শেষ করতে পারলেন না,—আসলে এ হল তাঁর আসল গল্পের মুখবন্ধ মাত্র। বৃদ্ধ দ্বারিক মিত্র শিল্পীর নয় দশ বছর বয়সে বলেছিলেন—'একটা নরবলি দিয়ে এইটুকু চড়া পড়েছে, সহস্র নরবলি হলে তবে যদি মা-কালী খুশি হয়ে খাল ভরাট করে দেন।'

তারপরে পনেরো বছর কেটেছে—পঁচিশ বছরের তরুণ লেখক দীর্ঘদিন পরে বাড়ি ফিরছেন বৈষয়িক প্রয়োজনে। পথে স্টেশনে এসে দেখেন বাস চলছে,—পোল গড়েছে বাঁধ-এর ওপর।—আবার সেই 'সাহেব কোম্পানীর কল'-এর কথাই মনে পড়ে; যন্ত্রের শক্তিতে পোল গড়া হয়েছে নতুন কালে। কিন্তু পুঁটিমারির বিল তাতে মজেছে; নোনা জল খাল ছেড়ে বিলের মধ্যে হু হু করে ঢুকে পড়ে ভাসিয়ে দিয়েছে—স্বর্ণপ্রসূ ধরিত্রীর কোল। ধেনোজমির বিল আজ ফালি ফালি মাছের ভেড়িতে রূপান্তরিত। কেবল পাকা ধানের রঙই তো সোনালি ছিল না—সোনা ছড়াত চারপাশের কৃষকপল্লী। লক্ষ্মীশ্রী স্নিগ্ধ-সুস্থ সমাজ-বন্ধনে আয়ত আকার পেয়েছিল। ছেলেরা পাঠশালে লেখা পড়া শিখত,—পণ্ডিতের প্রণামী ছিল,—উদয়াস্ত পরিশ্রমের পরে ছিল

পারিবারিক মমতা-বন্ধনের অপার তৃপ্তি। আজ তারা চোর ছ্যাঁচড় হয়েছে, —দিনে পড়ে পড়ে ঘুমোয়—নেশাভাঙ করে, রাত্রে পরের ভেড়িতে মাছ চুরি করে তাই বেচে খায়। তাদের ছেলেগুলেরা আদুল গায়ে গঞ্জে-বাজারে ভিক্ষা মেগে ফেরে।

প্রথম অংশের চেয়ে অনেক দীর্ঘায়ত দ্বিতীয়াংশের আখ্যান ভাগ। তার বাস্তব জীবন্ত বুনটের দিকে সপ্রশংস চোখে তাকিয়েও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আক্ষেপ করেছেন,[15] প্রথমাংশের 'রোমাঞ্চকর গুঞ্জন বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে।' —যাবারই তো কথা—প্রথমটিতে অতীতের কিংবদন্তী কিশোরের স্বপ্নমাখা,—দ্বিতীয়টিতে বর্তমানের যন্ত্রণা প্রত্যক্ষদর্শীর দীর্ঘশ্বাসে স্পন্দিত।—অর্থগৃধ্নু এই বৈজ্ঞানিক যুগেও বৃদ্ধ দ্বারিকের ভবিষ্যৎ বাণী ব্যর্থ হয় নি—'সহস্র' নয়, 'সহস্র সহস্র' নরবলি দিয়ে—আগ্রীব মনুষ্যত্বকে সমূলে হত্যা করে তবেই গড়ে উঠেছে যন্ত্রের বিস্ফারিত শক্তি।—বিজ্ঞান তো সভ্যতার বাহন, বল্লভ রায়ের মত সে হাতে মারে না, মারে ভাতে! আবছা অন্ধকারে নরবাঁধ-এর অশ্বত্থতলায় নিরন্ন ভিখারি দলের কুৎসিত বুভুক্ষাদীর্ণ মিছিল জীবনের রিক্ততাকে নিরুদ্ধ বাষ্প-প্রবাহের মত যেন কাঁপিয়ে দিয়ে চলে যায়। মনোজ বসুর সহজ-স্বপ্নাকুল গাল্পিক মনে এইখানেই কালের হাতের নিজস্ব স্বাক্ষর।

কিন্তু কালের ছবিটিকেও এবারে স্পষ্ট করে নিতে হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে—কুড়ি-ত্রিশের দশকেই বাংলাদেশে যান্ত্রিক জীবনের প্রথম প্রসার গ্রামের নাড়িতেও স্পন্দিত হতে শুরু করে। ভূমিনির্ভর বনিয়াদি জীবন কাঞ্চনলুব্ধ ব্যক্তিস্বার্থচিন্তায় আঁধার হয়ে যায়। যুদ্ধের সময়েই ভাগীরথীর দুই তীরে নতুন বৃহৎ শিল্পোদ্যম দেখা দেয়। কয়লা খনির কালো গহ্বরে সবে তখন রুপালি টাকার ঝিকিমিকি। গ্রাম ভাঙে,—চাষী ছুটে যায় কলে কিংবা কয়লা খনির কুলি ধাওড়ায়। এ-সব ছবি এঁকেছেন দৃঢ় হাতে তারাশঙ্কর, শৈলজানন্দ এঁরা মিলে। মনোজ বসু গ্রামীণ জীবন-মুগ্ধ শিল্পী; চোখে-দেখা অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্বপ্নের আবেশ মিলিয়ে জীবনকে তিনি এদিক ওদিক চারদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছেন। কোথাও দ্রষ্টার বক্তব্য প্রখর হয়ে ওঠেনি—অত তীব্রতা নেই তাঁর কিশোরধর্মী ব্যক্তিত্বেরও কোথাও—কিন্তু অপ্রখর নিশ্চিত অনুভবের হৃদয়-কম্পনটুকু নিঃশেষে সমর্পণ করে গেছেন চোখে-দেখা জীবন-স্বপ্নের গহনে। সেই গভীর মর্মতল হতে মনোজ বসুর গল্পে কালের হাতের সহজ নিক্ষিপ্ত স্বাক্ষর কুড়িয়ে এনে ভোগ করতে হয়।

১৫। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—পূর্বোক্ত গ্রন্থ—পৃ. ৬১৭।

আগে বলেছি ত্রিশের দশকে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি জীবনে ট্রাজেডির এক শ্রেষ্ঠ উৎস ছিল পৃথিবীব্যাপী আর্থিক মান্দ্যের পীড়ন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শুধু কেরাণী', অচিন্ত্য সেনগুপ্তর 'দুইবার রাজা', সরোজ রায়চৌধুরীর 'ক্ষণ বসন্ত' ইত্যাদি গল্পে সেই যন্ত্রণার মর্মন্তুদ ছাপ কখনো গাঢ় গভীর, কখনো আবেগ কম্পিত রেখায় আঁকা হয়েছে।[১৬] মনোজ বসুর 'রাজা' গল্পে অত আয়োজন নেই—কেমন একটি মজা-মজা—মজার গল্প মনে হয়। একটি দিনের গ্রামজীবনের যেন নিখুঁত এক দিনলিপি—চোখের ওপর দিয়ে ছায়াচিত্রের মত নিরন্তর দ্রুততায় ভেসে গেল ; গল্প আর গাল্পিকের মেজাজ কত আয়েশী—লঘু। তবু শেষ করে খুশির তলায় মনের-চোখের জল লুকোতে লুকোতে রবীন্দ্রনাথের কথাই মনে আসে[১৭] :—"সবারে চাহে বেদনা দিতে বেদনাভরা প্রাণ। / তাই ত চাহি হাসির ছলে করিতে লাজ দান।"—'লজ্জা' নয় হাসির ছলে কান্নের মর্মলীন যন্ত্রণার এমন অপরূপ চাপা কিন্তু নিশ্চিত বিচ্ছুরণ মনোজ বসুর গল্প-কলারই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য।

এই উপলক্ষে শিল্পীর বাক্‌রীতির পরিচয়টিও খতিয়ে দেখতে হয়। 'বাঘ' গল্পের আকার নক্‌শার সদৃশ বলেছিলেন রথীন্দ্রনাথ রায়।[১৮] 'রাজা', কিংবা এমন কি 'নরবাঁধ-এর দ্বিতীয় আখ্যান সম্পর্কেও একই কথা। যেন চোখ চেয়ে চেয়ে লিখছেন মনোজ বসু। দেখছেন আর লিখছেন—চোখ কখনো গল্প লেখার কাগজে বাঁধা পড়েনি—সব সময়ে রয়েছে অদূরে তাকিয়ে, চলমান জীবনের গভীরে। তাহলেও মনোজ বসুর গল্পাঙ্গিক আসলে মজলিশি গল্প-বলিয়ের। গাঁয়ে-ঘরে বারোয়ারি তলায় আসর জমিয়ে বসে গ্রামবৃদ্ধ মাতব্বরেরা পরতর প্রজন্মের কাছে আপন কালের—হারিয়ে যাওয়া কালের গল্প বলেন, কিংবা যেমন বলেন যৌথপরিবারের প্রধান জ্যেঠা-বাবা-কাকারা। অতীতের প্রতি মমতায়, গর্বে এবং গৌরববোধে মন ভরো-ভরো, আর এই সব কিছু মিলে মনের আত্মপ্রত্যয় এমন অবিচল, স্মৃতি অত নিভাঁজ অটুট—মনে হয় সেকাল যেন নূতন প্রাণ পেয়ে হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছে একালের প্রত্যক্ষ প্রেক্ষাপটে.—বলিয়ের দু চোখের ওপর। প্রবীণ গল্প-বলিয়ের প্রত্যয়-দৃঢ় অকৃত্রিম মৌখিক বাক্‌রীতি,—আঞ্চলিক শব্দ ব্যাহত ভাষা আর সজীব চলমান কথ্য ভঙ্গী এই

১৬। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র. ভূদেব চৌধুরী—'বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প ও গল্পকার'—(২য় সং) পৃ ৬১৯-২২, ৫৪৪ ৮৬

১৭। রবীন্দ্রনাথ—'দেশের উন্নতি'.—'মানসী' কাব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২য়, পৃ ২০২।

১৮। রথীন্দ্রনাথ রায় (স) 'মনোজ বসুর গল্প-সংগ্রহ'—ভূমিকা পৃ. ৮/০

সব কিছু মিলিয়েই মনোজ বসুর অপরতন্ত্র শৈলী—গল্পের বাক্‌শিল্পী তিনি, গল্প-লেখকের কারু ও চারুকর্মে তাঁর অবধান স্বতস্ফূর্ত নয়।

তার প্রভাব পড়েছে গল্পের গঠন রীতিতেও। অধিকাংশ গল্পই শুরু হয়েছে নাটকীয় আকস্মিকতার চমক দিয়ে। যেমন—"মৌজাটি নিতান্ত ছোট নয়। অগ্রহায়ণ হইতে জরিপ চলিতেছে, খানাপুরি শেষ হইল এতদিনে। হিঞ্চে-কলমির দামে আঁটা নদীর কূলে বটতলার কাছাকাছি সারি সারি তিনটি তাঁবু পড়িয়াছে। চারিদিকে বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ।"—'বনমর্মর' গল্পের প্রারম্ভিক কয়টি ছত্র, হিঞ্চে-দামে আঁটা নদীতীরের বটগাছ, চারদিকের ফাঁকা মাঠ, কিংবা 'খানাপুরি' যে মৌজার অন্তর্ভুক্ত তার চৌহদ্দি যেন লেখকের চোখের ওপরে ভাসছে। শুধু তাই নয়, তাঁর গল্পের শ্রোতারাও যে সেই পরিবেশ ও পটভূমি সম্পর্কে সমান অন্তরঙ্গ, শিল্পীর বিন্দুমাত্র সংশয় নেই তাতে। মনোজ বসুর গল্পের পাঠকেরাও আসলে গল্প শোনার ভূমিকায় বসেই তার পূর্ণ রসাস্বাদ গ্রহণ করতে পারেন। অন্যপক্ষে সার্থক ছোটগল্পের এক প্রধান দায়িত্ব পাঠকের মনের কাছে গল্পকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা—সেদিক থেকে পটভূমির ভৌগোলিক অবস্থান, সমাজের তাত্ত্বিক গঠন, মানুষের বাস্তব চরিত্র ইত্যাদি সম্পর্কে যথোচিত বর্ণনাও গল্প-লেখনকর্মের এক প্রয়োজনীয় কর্তব্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

কিন্তু মনোজ বসু তো গল্প-লেখক নন। দূরের অচেনা মানুষকে বোঝাবার ভোলাবার জন্যে তাঁর গল্প নয়,—আপনজনদের কাছে চোখে-দেখা আপন জীবনের কাহিনী বলেন তিনি; যেমন গল্প-বলিয়ে তেমনি তাঁর গল্প-রসিকেরাও গল্পের অঙ্গীভূত অন্যান্য পাত্রপাত্রীদের মত। যেমন 'উপসংহার' গল্পে আছে—"কি করিয়া যে তরুণ কবি এবং প্রবীণ লোহার ব্যাপারির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়াছিল তাহা জানি না। তোমরা ভাবিবে ইহার মূলীভূত হেতু কাতু অর্থাৎ কাত্যায়নী…।" কিংবা পরে বলেছেন,—"সেই পাঁচ বছর আগেকার চঞ্চল দুরন্ত কাতু আজ আনতনয়না শান্ত কিশোরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি গত বুধবারের বৃত্তান্তটা শোন—"

বারোয়ারিতলার আসর-জমানো গল্প বলার আঙ্গিকটি এখানে স্বচ্ছ। কিন্তু যেখানে গল্পের বুনোটের মাঝখানে শ্রোতার ডাক পড়ে নি,—সেখানেও ঐ মুখে-বলার ভঙ্গিটি অবিচল —

"বধূ ডাকিল—ঘুমচ্ছ?

মনোময় পাশ ফিরিয়া শুইল এবং বলিল-উঁহু—

বধূ বলিল—বালিশ কোথায়? অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না তো। হ্যাগো, আমার বালিশ কোথায় লুকিয়ে রাখলে? না—এই যে পেয়েছি।

বলিয়া আন্দাজি বালিশ খুঁজিয়া লইয়া তাহার উপর শুইয়া পড়িল।

মনোময় বলিয়া উঠিল, আঃ ঘাড়ের উপর শুলে কেন? সরে গিয়ে জায়গায় শোও?"—

'রাত্রির রোমান্স' গল্পের আরম্ভ এইটুকু—কিন্তু একি গল্প, না সংলাপ-জীবন্ত অখণ্ড এক নাট্যাংশ! কেবল সাংলাপিক বিকাশে নয়, নিছক বিবৃতি-মূলক গল্প-সূচনাতেও আছে একই নাটকীয়তার অভিন্ন চমক:—"গুরুপুত্র অশ্বত্থামার গোরু-চুরি মোকদ্দমায় এক বৎসরের জেল হইয়া গেল।"—

—'অশ্বত্থামার দিদি' গল্প আরম্ভ হয়েছে এক-বাক্যের এই প্রথম অনুচ্ছেদ নিয়ে।

গল্প আসলে বর্ণনামূলক শিল্প—'ন্যারেটিভ আর্ট'; ছোটগল্পে নাটকীয়তাও অন্যতম উপাদান হতে বাধা নেই; কিন্তু মনোজ বসুর গল্পে বর্ণনা আর নাটকীয়তায় যেন পরস্পর জায়গা বদল হয়ে গেছে। তারই ফলে গল্পাঙ্গিকে এসেছে অভিনবতা, যে চারিত্র বিশুদ্ধ ছোটগল্পের নয়! এক কথায় ছোটগল্পের সম্পূর্ণ পরিচয় উদ্ধার করা দুঃসাধ্য। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তবু চেষ্টা করেছিলেন[১৯]—"ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতি (impression)-জাত একটি সংক্ষিপ্ত কাহিনী যার একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।" আসলে ছোটগল্প আখ্যানভিত্তিক রচনা—জীবনের গল্প বলতে পারাতেই তার রস-সম্পূর্ণতা। আর জীবন তো সমুদ্রের মত,—তার বিস্তার, বৈচিত্র্য, তরঙ্গভঙ্গের জটিলতা অন্তহীন কিন্তু ছোটগল্প আকারে যত না হোক, বক্তব্যে সত্যিই ছোট। জীবনের কোনো একটি অনুভব, অভিজ্ঞতা ঘটনা বা পারিপার্শ্বিকতার ক্ষণস্থায়ী কেন্দ্র গভীরে গোটা জীবনের স্বাদটুকু আভাসে দিতে চায় ছোটগল্প;—রসিকেরা বলেন বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর আস্বাদন। তাই গল্প সামলানোর দিকেই জাত ছোটগাল্পিকের প্রধান ঝোঁক। গল্পকে প্রথম থেকেই কেন্দ্র-সংহত করে তোলার চেষ্টা।—স্ফুটন্ত চিনির পাত্রে মিশ্রির সুতোটির মত জীবনের টগবগে পাত্রে ডুবই আছে গল্প-শিল্পীর ঐক-চেতনার নিভৃত আকাঙ্ক্ষাটি,—সেই অচেতন প্রবণতার সঙ্গে আগ্রহ আবার,—গোটাজীবনের স্বাদ যেন হারিয়ে না যায়—অন্তত আভাসেও যেন মিলিয়ে থাকে তার অন্তহীনতার সংকেত—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,[২০]

১৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—'সাহিত্যে ছোটগল্প' ১৩৮৫ পৃ. ২২৬।

২০। রবীন্দ্রনাথ—'বর্ষাযাপন'—'সোনার তরী' কাব্য—রবীন্দ্র রচনাবলী পৃ. ৩০।

গল্পশেষে পৌঁছেও জীবনলুব্ধ মন যেন বলে,—"শেষ হয়ে হইল না শেষ।"

কিন্তু মনোজ বসুর পক্ষে সেই অবধান আবশ্যিক নয়; নিভৃত চেতনায় ছোটগল্প রসের পিয়াসী তিনি নন। নাটকের মত প্রত্যক্ষ সজীবতা আর চমকপ্রদ সংক্ষিপ্তবহুল বাচনে শুরু হয় গল্প। তারপরে দেখতে দেখতে শিল্পী তলিয়ে যান আপন গল্পরসের গভীরে। গল্পের দর্পণে আত্মদর্শনের গভীরতম অনুভূতি-লোক হতে উঠতে থাকে কথার ঝংকার। ততক্ষণে বক্তার মন মজেছে, শ্রোতাকেও তিনি মজিয়েছেন, তখন কথায় কথা বাধা মানে না—ছবির পর আসে ছবি—বর্ণনা যেন জীবন্ত চরিত্রের মত ঘোরাফেরা করে, নাটকীয় ঘটনাচিত্রের পিছু পিছু একটানে ছুটে আসে নিটোল বিবৃতি। গল্প নাটকে, তাই বাক্‌ভঙ্গিমায়, জায়গা বদল করে এগোয় মনোজ বসুর গল্প। নিছক বিবৃতিগুলিও মর্মস্পর্শী কবিতাস্বাদী;—কিন্তু কবিতার পরিশীলিত ভাষা নেই তার, স্বভাব-কবির মনের অন্তরঙ্গ সুরটিই তার প্রাণ। মনোজ বসুকে অতিপ্রাকৃত রহস্য-রোমাঞ্চ রসের শিল্পী বলে একদা ঘোষণা করা হয়েছিল; আর আগে বলেছি, প্রকৃতি-মুগ্ধতা তাঁর শিল্পি-চেতনার প্রথম প্রেম। কিন্তু অতিপ্রাকৃত, প্রকৃতি, এবং মানুষ নির্বিশেষে সর্বত্রই তাঁর বিবৃতি নাটকের মত গতি-চঞ্চল। তিনটি উদাহরণ সংগ্রহ করা যাক তিন রকমের:—বক্তব্য তা হলেই স্পষ্ট হবে:—

১। "ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের কেমন ভয় করিতে লাগিল। গভীর নির্জনতার একটি ভাষা আছে, এমন জায়গায় এমনি সময় আসিয়া দাঁড়াইলে তবে তাহা স্পষ্ট অনুভব হয়। চারিপাশের বনজঙ্গল অবধি ঝিম ঝিম করিয়া যেন এক অপূর্ব ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভয় হইল, আরো কিছুক্ষণ সে যদি এখানে এমনি ভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, জমিয়া নিশ্চয় গাছের গুঁড়ির মতো হইয়া এই বনরাজ্যের একজন হইয়া যাইবে; আর নড়িবার ক্ষমতা থাকিবে না।" ['বনমর্মর']

২। "বাড়িটার পশ্চিমে আম কাঁঠালের পুরানো বাগিচা। সেটা ছাড়াইয়া ঠিক উপরে ঘন বেত ও আগাছার ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া বহুকালের একটি অশ্বত্থ গাছ—গাছ সেটাকে বলা উচিত নয়—এবং কেবল শুধু অশ্বত্থটি নয়, উহার চারিপাশে ছায়াচ্ছন্ন ভাট-কাল-কাসুন্দেগুলিও নাকি এই রকম যে একখানা ডাল ভাঙিলে তাহারা অবিকল কচি শিশুর মত কাতরাইয়া উঠিবে।" ['দেবীকিশোরী']

৩। "হলুদ রঙের ফুলে ভরা জনশূন্য নিস্তব্ধ ক্ষেতের উপরে আলতারাঙা পা ফেলিয়া ঘরের লক্ষ্মীরা এঘরে ওঘরে সন্ধ্যা দেখাইয়া ফিরিতে লাগিলেন। সামনের আশশ্যাওড়া ও ভাটের জঙ্গলের উপর দেখিতে দেখিতে গড়িয়া উঠিল

দক্ষিণী কারিগরের তৈরি প্রকাণ্ড আটচালা ঘর একখানি। ভিতরে জোড়া তক্তাপোষে ফরাসের উপর ঝকঝকে সাপের মাথায় হুঁকাদান, তার উপর রূপাবাঁধানো হুঁকা। কলিকায় তামাক পুড়িয়া যাইতেছে—ওপাড়ার বৈকুণ্ঠ চাটুজ্জে হাত বাড়াইয়াছেন, কিন্তু হুঁকার নাগাল পান নাই। পাশার দান পড়িতেছে, চীৎকারে ঘর কাঁপিয়া যাইতেছে, ফিরিয়া তাকাইবার ফুরসত কাহারও নাই। বৈকুণ্ঠ আসিয়াছেন, কেদারনাথ বরদাকান্ত আসিয়াছেন, আরো কে কে যেন—নজর যায় না। বাড়ির মধ্যে দমাদম ঢেঁকির পাড় পড়িতেছে, নাড়ু ভাজার গন্ধ—কানে পৈতা জড়ানো ফর্সা রং কে খড়ম খটখট করিতে করিতে দীঘির ঘাট হইতে এই দিকে আসিতেছে।"

['মাথুর']

—ছোটগল্প নাকি কথাসাহিত্য :—কথারস আর কথার রস ফুলঝুরির মত উড়ছে ওপরের বর্ণনার পর বর্ণনায়।—কিন্তু তবু সে তো বর্ণনা নয়; যেন জীবন্ত ছবির দল ছুটে চলেছে নাটকীয় দ্রুত তালে—নিরন্তর উদ্দাম গতিতে। তন্ময় হয়ে গেছেন গল্পের বলিয়ে,—হঠাৎ কখন তাঁর ডুবন্ত চেতনা ভেসে উঠবে সচেতনতার সীমারেখায়, গল্প তখনই যাবে থেমে। গল্পকে গড়ে তোলার 'করণ কৌশল' নেই কোথাও,—বলিয়ের ভেসে যাওয়া ভাবনার তোড়ে গল্প ভাসে—ভাসে রসিকের মন। তখন গল্পের সংগতি-অসংগতি স্বাভাবিকতা-সম্ভাব্যতা, পরিধি-পরিমিতির প্রশ্ন অবান্তর হয়ে পড়ে। প্রথাসিদ্ধ ছোটগল্পের ছাঁচে মিলিয়ে দেখতে গেলে হিসেবে গরমিল দেখা দেয়। কখনো মনে হয় বড় গল্প বুঝি ভা-রি বড় হয়েছে, কিংবা ছোটগল্পগুলি আকারে বা গভীরতায় বড় বেশি ছোটো।

তেমনি ঘটেছে 'মাথুর' গল্পের প্রসঙ্গে; মোহিতলালের মনে হয়েছিল[২১], "বঙ্কিমচন্দ্রের ['চন্দ্রশেখরে'র] রোমান্টিক ট্রাজেডি, এখানে বাস্তব জীবনেই, সেই বৈষ্ণব ভাবসম্মিলনের অপরূপ কমেডিতে পরিণত হইয়াছে।" আর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভেবেছিলেন[২২], "মাথুর গল্পটির রসও বহুধা বিভক্ত হওয়ার জন্য জমে নাই।...গল্পের মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক বস্তুর অবতারণা ইহার ঐক্যকে বিধ্বস্ত ও রসকে ফিকে করিয়াছে।"—আগে বলেছি, এই দুটো মূল্যায়ণই পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে। যথার্থ ছোটগল্পের প্রথাসিদ্ধ আঙ্গিক-চেতনা নিয়ে লক্ষ করলে মনোজ্ঞ বসুর গল্প গঠনে কোথাও বিস্রস্ততা কোথাও অপরিণতি অসংগতির সংশয় দেখা দেবেই। 'সাঁইবাবার গন্ধ'র যে অংশ

২১। মোহিতলাল মজুমদার—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১১৮

২২। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৬১৭

কলকাতায় অনুষ্ঠিত,—কিংবা যে অংশ সুন্দরবনের বিল-বাদা-বনে,—প্রখর বাস্তব দৃষ্টির কাছে তার যথার্থতা, অথবা তার মৌল ঘটনাবলীর সংগতি সম্পর্কে সংশয় কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। অন্যপক্ষে মনোজ বসু যদি অতিপ্রাকৃত রহস্য রসের সিদ্ধকাম শিল্পীও হন, তাহলে 'লালচুল' কিংবা 'আলেয়া' গল্পের অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস বাস্তবমনস্ক রস-চেতনার পক্ষে অনায়াস গ্রাহ্য হতে পারে না। আমাদের স্বাভাবিক প্রাকৃত বা বাস্তব বুদ্ধির বিচারে যা স্বত-ই অসম্ভব তাকেই অপ্রাকৃত বলে বর্জন করি আমরা। কিন্তু সচেতন জ্ঞান-লোকের সীমার অতীত কত রহস্য সম্ভাবনাও তো রয়েছে, যার সত্যতা, বাস্তব সম্ভাবনা অস্বীকার করতে পারি না আমরা কিছুতেই। প্রাকৃত-চেতনার সীমাবহির্ভূত সেই রহস্যলোকের যবনিকাটি ধরে বাস্তবমনস্কতার সঙ্গে আলো-আঁধারি লুকোচুরি খেলার সাফল্যেই অতিপ্রাকৃত রসের সার্থক উৎসার। এই খেলার 'করণ কৌশল' গুণেই রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' একটি সার্থক অতিপ্রাকৃত গল্প, অথচ 'মণিহারা' তা নয়।

কিন্তু মনোজ বসুর গল্পের প্রকরণে এই সব মূল্যাদর্শ সহজে অনুসৃত হয় নি। গল্পের পরিবেশ, চরিত্র বা জীবনকে প্রমাণসহ করে তোলার দায় নেই তাঁর শিল্পি-মনের। যে-কথা বলেন, যে-জীবনকে তিনি রচনা করেন, তাঁর ব্যক্তিমনের বিশ্বাস আর মমতায় তাদের স্ফূর্তি দ্বিধাহীন—অমোঘ। কেবল সেই প্রত্যয়-দৃঢ় মনের বলে গল্পের রসিককেও তিনি জোর করে টেনে নেন আপন মর্মমন্থক কথা-রসের জোয়ার স্রোতে। এ এমন এক মায়াঘেরা চুম্বকের টান, স্রোতের মুখে কুটোর মত ছুটতে থাকে কথারসিক মন। থেকে থেকেই মনে হয় সব কি ঠিক আছে?—কিন্তু কিছুতেই মিল-গরমিলের হিসেব মিলিয়ে উঠবার অবকাশ থাকে না। একেবারে সমে এসে যখন হঠাৎ কথা থেমে যায়—শিল্পী উঠে আসেন মগ্ন চেতন গহনলোক হতে সচেতনতার স্বচ্ছ প্রান্তরে,—তখনই গল্পরসিক মনও ছাড়া পেয়ে মুক্তির নিশ্বাস ফেলে। তাই মোহিতলালের কথাই ঠিক;—'মাথুর' গল্পের মোহমদিরতাই চোখে-দেখা জীবনে বৈষ্ণব ভাবসম্মিলনের অধরা মাধুরিকে জমাট করে তোলে—গল্পের পল্লবায়নের অতিমাত্রিকতা নিয়ে প্রশ্ন করতে পারার অবকাশ কোথায় তখন? 'লাল চুল', 'আলেয়া'র মত গল্পে তেমনি প্রাকৃত-অপ্রাকৃত-অতিপ্রাকৃতের জোড় মেলাতে না মেলাতে গল্প এসে পৌঁছে যায় তার রসপরিস্রুতির চরম বিন্দুতে। কিংবা 'পৃথিবী কাদের' মত ধান-মাটি ঘাস-গ্রামের নিবিড় গন্ধ-ভরা নিটোল গল্পটিতেও নটবর-সৌদামিনীর স্বপ্ন ক্রমে বেদনা থেকে যন্ত্রণা হয়ে মরে; কিন্তু সেখানেও নিষ্ঠুর সামন্ততন্ত্রের জান্তব নির্যাতনের ছবি কেমন মগ্ন চেতনার রহস্যলোকে আবছা-আলো-আঁধারে

ঘুরে বেড়ায়। তার রক্তাক্ত বাস্তবতাকে মুঠো ভরে ধরা যায় না, যেমন যেতে পারে তারাশঙ্করের গল্পে। এই অর্থেই একেবারে শুরুতে বলেছিলাম—মনোজ বসুর রহস্য-মুগ্ধ কিশোর চেতনার স্বপ্নলোকে জীবন, প্রকৃতি, মানুষ সকলেই কেমন গোধূলি আলোয় আবছা ভেসে বেড়ায় যেন। এই অস্পষ্টতা অসম্পূর্ণতার দ্যোতক নয়—বরং সেই মায়ালোকের চাবিকাঠি, যার যাদুস্পর্শে সকল লেখাতেই বাস্তবের স্বচ্ছ স্ফটিক-স্তম্ভের কেন্দ্রমূলে ঝলমল করতে থাকে রোমান্টিক মদিরতার দুর্বার চুম্বকাকর্ষণ।

চোখে-দেখা জীবন নিয়ে স্বপ্ন-সায়রে শিল্পী ডুব দিয়েছেন অরূপ রতন আশা করে—রূপের কারিকুরির প্রথাসিদ্ধ প্রবণতা সেখানে অবাধ মুক্তির আনন্দে সহজে বাঁধন-হারা।

মনোজ বসুর গল্প-রস আর গল্প-কলার সাধারণ মানচিত্রটি ঘুরে ফিরে দেখা গেল—এবারে আসে তাঁর 'গল্প-সমগ্র'র প্রথম খণ্ডে ধৃত গল্পমালার রূপ-রেখান্বিত পরিচয়-প্রসঙ্গ। আবার পুরোনো কথায় আসতে হয়; স্রষ্টার মনের ভূগোলেই সৃষ্টির সীমারেখা। আর মনোজ বসুর মনের এক কোটিতে রয়েছে আপন দেশ পরিবেশ ও দেশ-জ মানুষের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-পুষ্ট মন্ময় স্বপ্নাবেশ,—আর এক কোটিতে জাগ্রত মহাকালের আলোড়ন-অভিঘাত-প্রেরণা। কখনো মগ্নমনের সৃজন-বাসনা এ-কোটিতে ঝুঁকেছে, কখনো আর এক কোটিতে; গল্পের বিষয় এবং রসে পার্থক্য আর বৈচিত্র্য জেগেছে অনেকটা তারই ফলে।

একেবারে প্রথম লেখা গল্প-গুচ্ছের প্রসঙ্গে মনোজ বসু তাঁর গ্রামঘরের কথা—সেই 'বিল ও বিলের প্রান্তবর্তী মানুষগুলো'র কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ করেছেন; বলেছেন[২৩], "গল্প লিখতে গেলে প্রতিটি ছত্রে তারাই এসে উঁকি-ঝুঁকি মারত।" সেই তাদের কথা নিয়েই গাঁথা হয়েছে প্রধানত 'বনমর্মর', 'নরবাঁধ', 'দেবী কিশোরী', 'একদা নিশীথ কালে' এবং 'উলু' গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পমালা। আগে বলেছি, এ-সব কিছু মনোজ বসুর চোখে-দেখা জীবনের বাস্তব প্রতিরূপ নয়, তাঁর তের-চোদ্দ বছরের ব্যথাহত কৈশোরের স্বপ্ন এবং মমতার রঙে রাঙানো সেই প্রত্যাক্ষাবগত জীবন।

আর মনেরও বয়স তো পাল্টায়; রঙ বদল হয় তাতে। প্রথম কৈশোরের হৃদয়-কম্পনকে ত্রিশ বছরের পরিণত যৌবনের উপলব্ধি-অনুভবে রাঙিয়ে লেখা এই সব গল্প। শহরবাসী শিক্ষিত মানুষের চেতনায় গ্রামজীবনের অন্তর্নিহিত স্ব-বিরোধ। গ্রামের চাষীরা দরিদ্র, অধিকাংশ নিরক্ষর; কিন্তু

২৩। জ্যোতিপ্রসাদ বসু (সঃ) পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ. ৭০

অশিক্ষার দৈন্য তাদের কদাচিৎ স্পর্শ করতে পারে। প্রধানত মোগল আমল থেকে কিংবা ইংরেজ আমলেও বাংলা দেশে শহর-নগর গড়ে উঠেছে আসলে কাঁচা পয়সার লোভকে আশ্রয় করে। প্রদীপের তলায় তাই সবচেয়ে অন্ধকার। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ও সুখসম্ভোগের প্রচুর উপকরণ শহরে পুঞ্জিত ;—যার যত টাকা সে তত লুটে নেয়। যার নেই, সে-ই বুভুক্ষু অজগরের মত ফুঁসে। এর দুই প্রান্তেই সমান বীভৎসতা ; একদিকে ক্রূর লুব্ধ আত্মপরতা ; আর একদিকে হিংস্র ক্ষিপ্ত আক্রোশ। দুটিই পাশবিক বৃত্তি, আত্মন্তর উন্মাদনায় পর-বিমুখ। কিন্তু মানুষ তো সামাজিক জীব—নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারাতেই তার মানবপ্রকৃতির মুক্তি। প্রেম-বাৎসল্য, সখ্য-সহৃদয়তা সব কিছুর উৎস ঐ মানসিক প্রসারের প্রেরণা। কিন্তু আমাদের শহর জীবন স্বভাবত নিঃসমাজ ; কারখানার কুলি ধাওড়ায় শনিবার রাত্রির অন্ধকার জীবনের ক্লিন্নতার সঙ্গে সাহেব-পাড়ার প্রথম শ্রেণীর হোটেল-ক্যাবারে জীবনের আলোকোজ্জ্বল উল্লাসের অন্তর্নিহিত পার্থক্য গুণগত নয়, —কেবল আর্থিক সম্পদের পরিমাণগত। ঐখানেই জীবনের আসল দৈন্য।

দারিদ্র্য অর্থনৈতিক কারণের ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু দৈন্য মানসিক সংগতিহীনতার দ্যোতক। গ্রামের মানুষ যূথবদ্ধ, পরিবার, পরিজন, সমাজ-পঞ্চজন নিয়ে তার মানসিক প্রসার। জননী ধরিত্রী আপন বক্ষ জুড়ে সেই সহজ হৃদয়-বন্ধনের স্নিগ্ধ ছত্রাতপ বিছিয়ে রাখেন শহরে মানুষ পরিশ্রমের বিনিময়ে কাঁচা পয়সা রোজগার করে। তাই বা কেন, মনোজ বসুর 'নরবাঁধ' গল্প দেখেছি—পুটিমারির বিলে মাটির সংস্পর্শ ঘুচে জলকর যখন চালু হল, তারপর থেকে গাঁয়ের কৃষকেরা হল মাছ-চোর ; রাতের অন্ধকারে তাদের আনাগোনা—দিনের আলোয় কেঁচোর মত ঘরের খোপে কাটে তাদের পশু-জীবন। কিন্তু কৃষির পদ্ধতি এবং প্রকরণ আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে সমস্ত সমাজের গোটা চেতনাটিকে ধরে রাখে মাঠের জমির ওপরে—মনোজ বসু তার নিখুঁত ছবি এঁকেছেন 'পৃথিবী কাদের' কিংবা 'ধানবনের গান'-এ। ধান যতদিন মাঠে ততদিন পরিশ্রম, উৎকণ্ঠা, ভয়, উল্লাস—মাঠ থেকে ঘরে যেদিন এল, সেদিন থেকে উৎসব, আনন্দ, সামাজিক সম্মিলন। ধান কল্যাণপ্রসূ —জননী ধরিত্রী কল্যাণী। কৃষি-ভিত্তিক এই সহজ কল্যাণ-বুদ্ধি সমাজ-বাহিত গ্রামজীবনকে দারিদ্র্যের মধ্যেও দৈন্যের অনিবার্যতা থেকে রক্ষা করেছে।

বরং দারিদ্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে হৃদয়বৃত্তির নির্বার উদারতা গ্রাম-জীবনে এক আদিমতাধর্মী বিস্ময়-মহিমা সঞ্চার করে। সে ছবি সার্থক রেখায় এঁকেছেন শরৎচন্দ্র। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে সবচেয়ে করুণার্দ্র জীবন রমার,

সবচেয়ে দীন বেণী ঘোষাল; কিন্তু উপন্যাসের মহত্তম চরিত্র রমেশ নয়,—মূর্তিমান 'ইমান' আকবর সর্দার। মনোজ বসুর গ্রাম-দেখা মুগ্ধ কিশোরচোখ ঐ মহিমা-মাধুর্যের দ্যুতি হৃদয়ে গেঁথেছিল। কিন্তু তিনি মহাকবি নন, রোমান্টিক গাথা-শিল্পী। গ্রামজীবনে গার্হস্থ্যের মহিমা তিল তিল আহরণ করে সোনার স্বপ্ন এঁকেছেন গল্পের পর গল্পে। মোহিতলাল বিস্মিত হয়ে ভেবেছিলেন, বৈধাতীত বৈষ্ণব-প্রেমের অধরা মাধুরি গার্হস্থ্য সম্পর্কের অনাবিল পরিমণ্ডলে অনায়াসে প্রোথিত করতে পেরেছিলেন তিনি 'মাথুর' গল্পে। জীবন-প্রিয় শিল্পী মনোজ বসু গ্রামীণ গার্হস্থ্যরসাশ্রিত সমাজ জীবন-মাধুরিমার মুগ্ধ প্রেমিক।

আরো কথা ছিল। প্রথম যুদ্ধোত্তর যুগেই শিক্ষিত তরুণ বাঙালি মন সর্বপ্রথম উদ্বাস্তু হল,—চাকুরিবুভুক্ষু জীবন গ্রামের ভিটার শেষ আশ্রয়টুকুও তখন হারিয়েছে। ভূমিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতির বিপর্যয়প্রসঙ্গ এখানে দীর্ঘ আলোচনাযোগ্য নয়;[২৪] কিন্তু তারই ফলে উন্মূলিত তারুণ্যের দীর্ঘশ্বাস বস্তুতন্ত্র রূপ ধরেছিল 'শুধু কেরাণী' 'দুইবার রাজা' ইত্যাদি বিখ্যাত গল্পে। সেই প্রথম নির্বাসনের যুগে যে-কজন লেখক গ্রাম জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় নিবেদন করে সদ্য-বিচ্ছিন্নতায় ব্যথাহত জীবন-চেতনাকে আনন্দ-নিষিক্ত করেছিলেন, তারাশঙ্কর, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা 'পদ্মানদীর মাঝি'র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মনোজ বসু-ও তাঁদের অন্যতম। 'প্রবাসী'র আড্ডায় আপন সগোত্র জেনেই বিভূতিভূষণ মনোজ বসুকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

তাছাড়া মনোজ বসু নিজেও তখন জীবনের নিঃসঙ্গ ব-দ্বীপবাসী। কেবল গ্রাম-জীবনই আজ দূরগত নয়, আবাল্য-বাঞ্ছিত গার্হস্থ্য মাধুর্য ও পবিত্রতা-বোধের স্বপ্নও বিধ্বস্ত-প্রায়; 'কল্লোল'-এর কাল আট বছরেরও বেশি বয়স্ক হয়েছে ততদিনে। সব মিলে মনে হয়, শিল্পী যেন হারানো স্বপ্নকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন বহুদিন আগেকার চেনা জীবনের কল্পলোকে। চোখে তাঁর স্বপ্নের মায়াঞ্জন, মনে মনে ছুটে চলেছে ইচ্ছাপূরণের কল্পরথ। সব কিছু মিলে গল্পের দ্রুতগতি কথার স্রোতে কথাবস্তু—প্লট আর চরিত্র কেমন আবছা অস্পষ্ট হয়ে আছে—বাস্তব জীবনের ছবি ঘিরে দোলে রোমান্সের বর্ণালি রহস্য। গল্প শেষ হলে মনে হয় বস্তুময় কথার মোড়কে বিচ্ছুরিত হল বুঝি অধরা মধুরসের আতরগন্ধ। কখনো গ্রামীণ প্রকৃতি-লালিত জীবন, কখনো বা গার্হস্থ্য প্রীতি, কখনো দুই মিলেমিশে জমে উঠেছে এমনি ধারা গল্পরস,—

২৪। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র. ভূদেব চৌধুরী—'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' (২য় সং)—পৃ. ৩৭৫-৮৮।

'অশ্বত্থামার দিদি', 'রাত্রির রোমান্স', 'উপসংহার', 'দেবী কিশোরী', 'স্বপ্নের খোকা', 'যাও পাখী বোলো তারে' ইত্যাদি গল্পে।

তরুণ বয়সের এই মধুলুব্ধতার সঙ্গে কৈশোর অভিজ্ঞতার নিসর্গ রহস্য-মোহ মিলিয়ে গড়েছিলেন শিল্পী তাঁর প্রথম জীবনের অতিপ্রাকৃত-চেতনা-চঞ্চল গল্পের মালা। 'বনমর্মর' এই শ্রেণীর অত্যুৎকৃষ্ট গল্প। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন,—"অতিপ্রাকৃতের খুব সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং অতীন্দ্রিয় জগতের শিহরণ জাগাইবার অসাধারণ ক্ষমতা"-ই মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব। আগে দেখেছি,—অতিপ্রাকৃতের বিশ্বাস-সংশয়-শংকা ঘেরা রহস্য-পরিমণ্ডল সাজিয়ে তোলার কোনো অবহিত প্রয়াস তাঁর প্রবণতায় উপস্থিত নেই। প্রাকৃত অভিজ্ঞতার বিপুল সম্ভার, আর কিশোর বয়সের অ-প্রাকৃত স্বপ্ন-লোভাতুরতার সূক্ষ্মতম সীমান্ত-রেখা ভেদ করে ছুটে চলে মনোজ বসুর অফুরন্ত কথাস্রোত—রসিক মনও তার নিরন্তর টানে ছুটতে থাকে পেছনে পেছনে—বনবাদাড় খাল বিল প্রান্তরের রহস্যপাথার আন্দোলিত করে—ভয়ে উৎকণ্ঠায় রুদ্ধশ্বাস উদ্দীপনায়। এমনি করে গল্প যখন হঠাৎ থেমে যায় ততক্ষণে প্রাকৃত অপ্রাকৃত রসের মিশোল নিয়ে বোঝাপড়া করবার প্রবণতাও লুপ্ত। 'লাল চুল', 'আলেয়া' ইত্যাদি ছাড়া 'প্রেতিনী', 'রায় রায়ানের দেউল' প্রভৃতি গল্পেও রস-রচনার এই অভিন্ন প্রকরণ।

তাহলেও কেবল মধুর রোমাঞ্চকর গল্প নয়, মজার গল্পও লিখেছেন মনোজ বসু। ঠিক হাসির গল্প যাকে বলে তেমন নয়,—কিন্তু মন খুশি হয়ে উঠতে চায় স্মিত হাসির আমেজের সঙ্গে। 'একদা নিশীথকালে' সংগ্রহ গ্রন্থে অধিকাংশ গল্পের চরিত্রই তাই। এগুলো ঠিক রোমান্স-রসের গল্প নয়। রোমান্টিক প্রণয়-প্রসঙ্গের ছদ্ম আবরণে বিশুদ্ধ মজার গল্প ইংরেজিতে যাকে বলি 'ফান'। 'সর্পাঘাত' তো খুসি ছেড়ে হাসির সীমানায় গিয়ে পড়েছে প্রায়—এমনি আজগুবি তার উপাখ্যান বন্ধন। আর সব গল্পেই সাধারণ উপাদান মজা, কেবল মজা-ই।

কিন্তু কেবল স্বপ্নে-আমেজে, খুশিতে-মজায় মগ্ন হয়ে থাকবার উপায় ছিল না। কালের আঘাতে জীবনের চারপাশে তখন ব্যথার পারাবার; আর মনোজ বসু স্বভাববশেই জীবন উৎকণ্ঠ শিল্পী। 'বাঘ', 'রাজা', কিংবা 'নরবাঁধ-এর মত গ্রামীণ রস-সুন্দর গল্পে কালের ছায়া কেমন প্রচ্ছন্ন পদপাতে বিস্তারিত হয়েছে, তার পরিচয় সংগ্রহ করেছি আগে। 'ফার্স্ট বুক ও

চিত্রাঙ্গদা' কিংবা 'পিছনের হাতছানি' গল্পেও অনেকটা তাই। 'বিচিত্রা'তে এই শেষোক্ত গল্পই প্রকাশিত হয়েছিল 'নতুন মানুষ' নামে। লেখক বলেছেন,[২৫] "'নতুন মানুষ'-এর আদি নাম ছিল 'পিছনের হাতছানি'। যেহেতু নতুন মানুষ আমি সাহিত্যের দরবারে পা বাড়াচ্ছি, সুবলই [সুবল মুখোপাধ্যায়] ঐ নামকরণ করলেন।"—কিন্তু 'পিছনের হাতছানি'-ই ঠিক; শহরবাসের অব্যবহিত মানসিক বিরূপতা নিয়ে গল্পের নায়ক গিরিজার মাধ্যমে শিল্পী নিজে মানস অভিসার সেরে এলেন যেন গ্রামজীবন অভিজ্ঞতায় কৈশোর স্বপ্নলোকে। শহুরে জীবনের অর্থলুব্ধ হৃদয়হীনতা স্বার্থপর সংকীর্ণতা, লোকদেখানো কৌলিন্যের মায়ামরীচিকার মূলগত আত্মপ্রবঞ্চনা—এই সব কিছুকে মনোজ বসু সহজ অথচ তীক্ষ্ণ সংকেতবহ ভাষায় মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তি দিয়েছেন পরিবার-জীবনের নিভৃত সীমারেখায়। বিপরীত কোটিতে রয়েছে শিল্পীর ক্লান্ত মনের স্বপ্ন-পদচারণা গ্রামীণ হৃদ্যতার বন্ধুলোকে। 'চাকরির লোভে এখনকার পাটের মরসুমটা নষ্ট করো না ভাই'—বৈষয়িক উদ্দেশে গিরিজার এই উপদেশ আসলে শিল্পীর শহর-বিরূপতা ও আবেগই ভাষা —গল্পের শরীর ঠিক তিনটি অনুচ্ছেদ আগে সেই ভাষাকেই তিনি পুঁটির সঙ্গে পুনর্মিলন-প্রত্যাশী বাথিত-কল্পনার স্বপ্নচ্ছন্দে ঝংকৃত করে তুলেছেন।

আর 'ফার্স্ট বুক ও চিত্রাঙ্গদা' গল্পের সূত্রে রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি'র কথা মনে পড়ে;—বঞ্চিত স্কুল-শিক্ষকের জীবনে এক ঝড়ের রাত্রির অভিজ্ঞতা কি করে অতীত-বিলীন স্বপ্ন-লোকের চাবি খুলে দিয়েছিল। কিন্তু রসাস্বাদনে গল্প দুটি সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রথমটিতে কবি-মানসাশ্রিত ভাব আবেগ গল্পের পরিণামে গীতি কবিতার অমৃত-রস বিচ্ছুরিত করেছে—দারিদ্র্য দীনতার সকল সীমানা অতিক্রান্ত তার অনির্বচনীয় আবেদন। কিন্তু 'ফার্স্ট বুক ও চিত্রাঙ্গদা' গল্পের পণ্ডিত-মাস্টার আপন দেশ-কালের গণ্ডির বন্দী; তাঁর আর্থিক অনটন তাঁর দাম্পত্য আর পিতৃত্বকে আত্মবঞ্চনার পেষণে চূর্ণ করে; শুধু ঝড়ের রাতে জীর্ণজীবনের নড়বড়ে বন্ধ জানালা ভেঙে কৈশোর রোমাঞ্চ এসে দোলা দিয়ে যায় হাড়কাঁপানো বুক ভাঙা দীর্ঘশ্বাসের মত। কুড়ি-ত্রিশের দশকের অবদমিত কালবেদনা এমনি করেই মনোজ বসুর প্রথম পর্যায়ের গল্পে গোপনে পদপাত করেছে—হয়ত শিল্পীর সচেতন মনের অজ্ঞাতেই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনিবার্যকে আর গোপন রাখাই বা গেল কই! বিশ শতকের ত্রিশের দশক আসলে তো কেবল অবদমন আর আত্মমর্ষণেই অবসিত হতে পায়নি। জীবনের বিপরীত কোটি থেকে সঞ্চারিত হয়েছিল

২৫। মনোজ বসু—'লেখকের জন্ম'—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ. ২২৩

অবারিত যৌবনের দুর্বার জোয়ারস্রোত। ত্রিশের দশক 'নেহরু কংগ্রেসে'র অভ্যুদয় নিয়ে শুরু, তার এক প্রান্তে রুশ বিপ্লব-প্রদীপ্ত সাম্যবাদী মতাদর্শের কূলস্পর্শী আবেদন; কংগ্রেসে পর্যন্ত সমাজতন্ত্রী মতবাদের ধ্বজা ধরেছেন জবাহরলাল। রাজনৈতিক দর্শনের দ্বন্দ্ব-বিরোধও তখন থেকেই আভাসিত হতে আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি তরুণের মন দলমত নির্বিশেষে তখন তিনটি স্পষ্ট প্রেরণায় বিক্ষুব্ধ মুখর হয়ে উঠেছে;—বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে দেশের স্বাধীনতার উদ্ধার,—প্রাচুর্যস্ফীত ধন-গৃধ্নুদের বর্বর নির্যাতন হতে দরিদ্রশ্রেণীর মুক্তি বিধান, এবং এই দ্বিবিধ প্রয়োজনের প্রেরণাবশে অহিংস অথবা সহিংস জেহাদ ঘোষণা।—যেন আগুনের হল্‌কা বইছিল জীবনের চারপাশে।

রাজনৈতিক তত্ত্বচিন্তার 'কচকচি' মনোজ বসুর স্বভাব-ভাবালু মনকে স্পর্শ করতে পারে না,—কিন্তু দেশপ্রেম, মানবপ্রীতি তাঁর রক্তের ধন। স্বদেশী আন্দোলনের (১৯০৫—'১১) যুগে বাবার হাত ধরে এখানে-ওখানে যাবার স্মৃতি তাঁর মনে গাঁথা আছে; বয়স তো তখন সবে চার থেকে সাতের সীমানায়। তারপরে সারাজীবন সে নেশা মনের গভীরে ঘুরে ফিরেছে। নিজে বলেছেন,[২৬] —"ছাত্রজীবনে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসেছি। অসহযোগ আন্দোলনের সময় কলেজ ছেড়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছি। দোরে দোরে খদ্দর ফিরি করে বেড়িয়েছি কত দিন। বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে কিছু কিছু সক্রিয় কাজকর্ম করেছি…।"—এ-সব কিছুর মূলে ছিল 'অবিচার-দেখে-বিচলিত' শিল্পি-মনের 'প্রতিবাদ'-স্পৃহা;—আগে দেখেছি, মনোজ বসু বলেছেন, সে ছিল তাঁর আন্তরিক প্রবণতা। স্বাদেশিকতা আর সাম্যবাদের ভাবাদর্শ সেই সহজ প্রবণতায় স্পষ্ট ভাব-ভাবনাময় ভাষা সঞ্চার করেছিল; তাই সোচ্চার হয়ে উঠল 'পৃথিবী কাদের' গল্পমালায়। ঐ নামের ব্যথা-বিজড়িত মিষ্টি গল্পটির শেষে—পিতৃপুরুষের ভিটে ঘর জ্বালিয়ে জমিজমা হতে উচ্ছেদ হয়ে গভীর রাতে নির্জন পথে নেমেছে চাষীদম্পতি নটবর আর সৌদামিনী,—সর্বনাশের স্রোতে নিরুদ্দেশ যাত্রায়। সৌদামিনী বলে 'যমের বাড়ি'!—"বালাই ষাট! নটবর একটু রসিকতার চেষ্টা করল। তোর যে কত সাধ বউ! এই বয়সে এত সকাল সেখানে যাবি?

"সৌদামিনী বলল, হাঁ, যাব। গিয়ে সেই পোড়া বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করব, পৃথিবী যদি বাঁটোয়ারা করে দিয়েছিস—তবে আমাদের সেখানে পাঠাস কেন?"

২৬। দ্র. ভবানী মুখোপাধ্যায়—পূর্বোক্ত রচনা ও গ্রন্থ—পৃ. ৫২।

—চাষী বউ-এর কণ্ঠে এই বক্তব্যের সংগতির প্রশ্ন মনোজ বসুর গল্পে অবান্তর;—কেন, সেকথা বলেছি আগে। কিন্তু তাঁর সহজ শিল্পী মনের ভাষায় এইখানেই কালের হাতের সোচ্চার স্বাক্ষর। এ-ভাষা সাম্যবাদীর না স্বদেশীর,—সে প্রশ্ন নিরর্থক। আসলে এ বাণী নিভৃত-নিবিড় জীবন-প্রেমের মর্মোৎসারিত; তাই গল্পের ভাষাতেও যেন কবিতার অশ্রু ঝরে—'কালের কপোলতলে' 'একবিন্দু নয়নের জল—তাই নিয়েই গল্প-বলার স্বপ্নাবিষ্ট শিল্পী মনোজ বসু এখানেও মন জয় করে নিলেন—এখানেই তাঁর বিজয়ী প্রতিভার অক্ষয় প্রতিষ্ঠাভূমি।

'ইয়াসিন মিঞা' কিংবা 'বন্দেমাতরম' গল্পেও সেই একই কালের আক্ষেপ রক্তের ধারায় ঝরে। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তখন ভারতবর্ষ তথা বাংলা-দেশেরও মজ্জায় মজ্জায়। কিন্তু সাম্যবাদের নূতন পরিভাষা এ-কথা নিঃসংশয়ে বুঝিয়েছে, জাত আসলে শ্রেণী-সংঘাতের বিভেদ-নৃশংসতারই অভিব্যক্তি। পৃথিবী জুড়ে এক জাত আছে, তার নাম মানুষ। ধনলোভী বর্বরেরা সেই জাত ভাঙে। ধনীতে দরিদ্রে বিচ্ছেদ বীভৎস হয়ে ওঠে—যেন রক্তপায়ী হিংস্র শুশুকের দল পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি দরিদ্রের রক্ত শুষে নিচ্ছে লুব্ধ চোখের খর দৃষ্টি বুলিয়ে। 'ইয়াসিন মিঞা'-তে এই সদ্য আবিষ্কৃত যুগসত্যের অনাবৃত প্রকাশ,—'বন্দেমাতরম্'-এ সেই আবিষ্কারের স্বাদেশিকতা প্রবুদ্ধ সংগীত ঝংকার!

তারপরেও আরো রয়েছে; সেকথা আরো পরে।

সূচীপত্র

বনমর্ম্মর

মৌজাটি নিতান্ত ছোট নয়। অগ্রহায়ণ হইতে জরিপ চলিতেছে, থানাপুরি শেষ হইল এতদিনে। হিঞ্চে-কলমির দামে আঁটা নদীর কূলে বটতলার কাছাকাছি সারি সারি তিনটি তাঁবু পড়িয়াছে। চারিদিকে বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ।

শঙ্কর-ডেপুটি সদর ক্যাম্প হইতে আজ আসিয়া পৌছিয়াছে। উপলক্ষ একটা জটিল রকমের মকদ্দমা। ছোকরা মানুষ, ভারি চটপটে—পত্নীবিয়োগের পর হইতে চাঞ্চল্য যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। আসিয়াই আমিনের তলব পড়িল।

আমিনকে ডাকিতে পাঠাইয়া একটা চুরুট বাহির করিল। চুরুটের কৌটায় সেই সাত মাস আগেকার শুকনো বেলের পাতা ক'টি এখনও রহিয়াছে।

সাত মাস আগে একদিন বিকালবেলা তাহাদের দেশের বাড়িতে দোতলার ঘরে ঢুকিয়া শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল : সুধারানী, কালকে কি বার ?

সুধা বলিয়াছিল, পাঁজি দেখগে যাও, আমি জানি নে। তারপর হাসিয়া চোখ দুটি বিস্ফারিত করিয়া বলিয়াছিল, চলে যাবেন, তাই ভয় দেখানো হচ্ছে! ভারি কিনা ইয়ে—

শঙ্করও খুব হাসিয়াছিল। বলিয়াছিল, যদি মানা করো, তবে না হয় যাই নে।

থাক!

কোনো জবাব না দিয়া সুধারানী অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় কোঁচাইয়া পাট করিতে লাগিল। শঙ্কর তাহার হাত ধরিয়া কাছে আনিল।

শোনো সুধারানী, উত্তর দাও।

বা-রে, পরের মনের কথা আমি জানি বুঝি!

নিজের তো জান ?

তবু কথা কহে না দেখিয়া শঙ্কর বলিতে লাগিল, আমি চলে যাব বলে তোমার কষ্ট হচ্ছে কিনা সেই কথাটা বলো আমায়, না বললে শুনছি নে কিছুতে।

না।

সত্যি বলছ ?

না—না—না। বলিয়া হাত ছাড়াইয়া সুধা বাহির হইয়া যাইতেছিল। শঙ্কর পলায়নপরার সামনে গিয়া দাঁড়াইল।

মিছে কথা। দেখি, আমার দিকে চাও—কই, চাও দিকি সুধারানী।

সুধা তখন দুই চক্ষু প্রাণপণে বুজিয়া আছে। মুখ ফিরাইয়া ধরিতেই ঝরঝর করিয়া গাল বাহিয়া চোখের জল গড়াইয়া পড়িল। আঁকিয়া বাঁকিয়া পাশ কাটাইয়া বধূ পলাইল।···

শেষ রাতে বৃষ্টি নামিয়াছে। লক্ষ্মণ বাহির হইতে ডাকিল, ছোটবাবু, ঘাটে স্টিমার সিটি দিয়েছে।

সুধারানী গলায় আঁচল বেড়িয়া প্রণাম করিল। কহিল, দাঁড়াও একটু। তাড়াতাড়ি কুলুঙ্গির কোণ হইতে সন্ধ্যাকালে গোছাইয়া রাখা বিল্বপত্র আনিয়া হাতে দিল।

দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা! হপ্তায় একখানা করে চিঠি দিও, যখন যেখানে থাক, বুঝলে ?

আরও একটা দিনের কথা মনে পড়ে, এমনি এক বিকালবেলা মামুদপুর ক্যাম্পে সে জরিপের কাজ করিতেছে, এমন সময় চিঠি আসিল, সুধারানী নাই।

ইতিমধ্যে নকশা ও কাগজপত্র লইয়া ভজহরি আমিন সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

দু-শ দশ—এগারো—তার উত্তরে এই হল গে দু-শ বারো নম্বর প্লট—বলিয়া ভজহরি নকশার উপর জায়গাটা চিহ্নিত করিল। বলিতে লাগিল, অনাবাদী বন-জঙ্গল একটা, মানুষজন কেউ যায় না ওদিকে, তবু এই নিয়ে যত মামলা।

হঠাৎ একবার চোখ তুলিয়া দেখিল, সে-ই কেবল বকিয়া মরিতেছে, শঙ্কর বোধকরি একবারও কাগজপত্রের দিকে তাকায় নাই—সামনের উত্তরের মাঠের দিকে এক নজরে তাকাইয়া আপন মনে দিব্য শিস দিতে শুরু করিয়াছে, চুরুটের আগুন নিভিয়া গিয়াছে।

বলিল, হ্যাঁ, ঐ যে তালগাছ ক'টার ওধারে কালো কালো দেখা যাচ্ছে—জঙ্গলের আরম্ভ ঐখানে। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক, কিন্তু ওর মধ্যে জমি অনেক···এইবারে রেকর্ড একবার দেখবেন হুজুর, ভারি গোলমেলে ব্যাপার।

হাঁ হাঁ না—এই রকম বলিতে বলিতে একটু অপ্রস্তুত হইয়া শঙ্কর কাগজপত্রে মন দিল। পড়িয়া দেখিল, ছ-শ বারোর খতিয়ানে মালিকের নাম লেখা হইয়াছে, শ্রীধনঞ্জয় চাকলাদার।

ভজহরি বলিতে লাগিল, আগে ঐ একটা নাম শুধু লিখেছিলাম। তারপর দেখুন ওর নিচে নিচে উডপেন্সিল দিয়ে আরও সাতটা নাম লিখতে হয়েছে। রোজই এই রকম নতুন নতুন মালিকের উদয় হচ্ছে। আজ অবধি একুনে আটজন তো হলেন—যে রেটে ওঁরা আসতে লেগেছেন দু একদিনের মধ্যে কুড়ি পুরে যাবে বোধ হচ্ছে, এই পাতায় কুলোবে না।

শঙ্কর কহিল, কুড়ি পুরে যাবে, যাওয়াচ্ছি আমি—রোসো না। আজই খতম করে দেব সব। তুমি ওদের আসতে বললে কখন?

সন্ধ্যের সময়। গেরস্ত লোক সারাদিন কাজকর্মে থাকে—একটু রাত হয় হবে, জ্যোৎস্না রাত আছে—তার আর কি?

আরও খানিকটা কাজকর্ম দেখিয়া শঙ্কর সহিসকে ঘোড়া সাজাইতে হুকুম দিল।

বলিল, মাঠের দিক দিয়ে চক্কোর দিয়ে আসা যাক একটা—এ রকম হাত-পা কোলে করে তাঁবুর মধ্যে কাঁহাতক বসে থাকা যায়! এ জায়গাটা কিন্তু তোমরা বেশ সিলেক্ট করেছ, আমিন মশাই। ওগুলো ভাঁটফুল, না? কিন্তু গাঙের দশা দেখে হাসি না কাঁদি—

বলিতে বলিতে আবার কি ভাবিল। বলিল, ঘোড়া থাকগে, এক কাজ করলে হয় বরং—চলো না কেন, দু-জনে পায়ে পায়ে জঙ্গলটা ঘুরে আসি। মাইলখানেক হবে—কি বল? বিকেলে ফাঁকায় বেড়ালে শরীর ভালো থাকে। চলো—চলো—

মাঠের ফসল উঠিয়া গিয়াছে। কোনোদিকে লোক-চলাচল নাই। শঙ্কর আগে আগে যাইতেছিল, ভজহরি পিছনে। জঙ্গলের সামনেটা খাতের মতো—অনেকখানি চওড়া, খুব নাবাল। সেখানে ধান হইয়া থাকে, ধানের গোড়াগুলা রহিয়াছে। পাশ দিয়া উঁচু আল বাঁধা।

সেখানে আসিয়া শঙ্কর কহিল, গাঙের বড় খাল-টাল ছিল এখানে?

ভজহরি কহিল, না হুজুর, খাল নয়—এটা গড়খাই। সামনের জঙ্গলটা ছিল গড়।

গড়?

আজ্ঞে হাঁ, রাজারামের গড়। রাজারাম বলে নাকি কে-একজন কোনকালে এখানে গড় তৈরি করেছিলেন। এখন তার কিছু নেই, জঙ্গল হয়ে গেছে সব।

তারপর দুজনে নিঃশব্দে চলিতে লাগিল।

মাঝে একবার শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল—বাঘ-টাঘ নেই তো?

ভজহরি তাচ্ছিল্যের সহিত জবাব দিল, বাঘ! চারিদিকে ধুধু করছে ফাঁকা মাঠ, এখানে কি আর...তবে হঁ্যা, অন্যান্যবার শুনলাম কেঁদো-গোবাঘা দু-একটা আসত। এবারে আমাদের জ্বালায়—

বলিয়া হাসিল। বলিতে লাগিল, উৎপাতটা আমরা কি কম করছি হুজুর? সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই—কম্পাস নিয়ে চেন ঘাড়ে করে করে সমস্তটা দিন। ঐ পথ যা দেখছেন, জঙ্গল কেটে আমরাই বের করেছি, আগে পথঘাট কিছু ছিল না—এ অঞ্চলের কেউ এ বনে আসে না।

বনে ঢুকিয়া খানিকটা যাইতেই মনে হইল, এই মিনিট দুয়ের মধ্যেই বেলা ডুবিয়া রাত্রি হইয়া গেল।

ঘন শাখাজাল-নিবদ্ধ গাছপালা, আম আর কাঁঠাল গাছের সংখ্যাই বেশি। পুরু বাকল ফাটিয়া চৌচির হইয়া গুঁড়িগুলি পড়িয়া আছে যেন এক-একটা অতিকায় কুমির, ছাতাধরা সবুজ, ফাঁকে ফাঁকে পরগাছা···একদা মানুষেই যে ইহাদের পুঁতিয়া লালন করিয়াছিল আজ আর তাহা বিশ্বাস হয় না। কত শতাব্দীর শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা মাথার উপর দিয়া কাটিয়া গিয়াছে, তলার আঁধারে এইসব গাছপালা আদিম কালের কত সব রহস্য লুকাইয়া রাখিয়াছে কোনোদিন সূর্যকে উঁকি মারিয়া কিছু দেখিতে দেয় নাই।

এই রকম একটানা কিছুক্ষণ চলিতে চলিতে শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল।

ওখানটায় তো ফাঁকা বেশ। জল চকচক করছে—না?

আমিন বলিল, ওর নাম পঙ্কদীঘি।

খুব পাঁক বুঝি?

তা হবে। কেউ আবার বলে, পঙ্খী-দীঘির থেকে পঙ্কদীঘি হয়েছে।

বলিয়া ভজহরি গল্প আরম্ভ করিল:

সেকালে এই দীঘির কালো জলে নাকি অতি সুন্দর ময়ূরপঙ্খী ভাসিত। আকারেও সেটি প্রকাণ্ড—দুই কামরা, ছয়খানি দাঁড়। এত বড ভারী নৌকা, কিন্তু তলির ছোট্ট একখানা পাটা একটুখানি ঘুরাইয়া দিয়া পলকের মধ্যে সমস্ত ডুবাইয়া ফেলা যাইত। দেশে সে সময় শাসন ছিল না, চট্টগ্রাম অঞ্চলের মগেরা আসিয়া লুটতরাজ করিত, জমিদারদের মধ্যে রেষারেষি লাগিয়াই ছিল। প্রত্যেক বড়লোকের প্রাসাদে গুপ্তদ্বার ও গুপ্তভাণ্ডার থাকিত, মান সম্ভ্রম লইয়া পলাইয়া যাইবার—অন্ততপক্ষে মরিবার—অনেক সব উপায় সম্ভ্রান্ত লোকেরা

হাতের কাছে ঠিক করিয়া রাখিতেন। কিন্তু নৌকার বহিরঙ্গ দেখিয়া এসব কিছু ধরিবার জো ছিল না। চমৎকার ময়ূরকণ্ঠী রঙে অবিকল ময়ূরের মতো করিয়া গলুইটি কুঁদিয়া তোলা—শোনা যায়, এক-একদিন নিঝুম রাত্রে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে রাজারামের বড় ছেলে জানকীরাম তাঁর তরুণী পত্নী মালতী-মালাকে লইয়া চিত্রবিচিত্র ময়ূরের পেখমের মতো পাল তুলিয়া ধীর বাতাসে ঐ নৌকায় দীঘির উপর বেড়াইতেন। এই মালতীমালাকে লইয়া এ অঞ্চলের চাষারা অনেক ছড়া বাঁধিয়াছে, পৌষ-সংক্রান্তির আগের দিন তাহারা বাড়ি বাড়ি সেই সব ছড়া গাহিয়া নূতন চাউল ও গুড় সংগ্রহ করে, পরদিন দল বাঁধিয়া সেই গুড় চাউলে আমোদ করিয়া পিঠা খায়।

গল্প করিতে করিতে তখন তাহারা সেই দীঘির পাড়ের কাছে আসিয়াছে। ঠিক কিনার অবধি পথ নাই, কিন্তু নাছোড়বান্দা শঙ্কর ঝোপঝাড় ভাঙিয়া আগাইতে লাগিল। ভজহরি কিছুদূরে একটা নিচু ডাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নল-খাগড়ার বন দীঘির অনেক উপর হইতে আরম্ভ হইয়া জলে গিয়া শেষ হইয়াছে, তারপর কুচো-শেওলা শাপলার ঝাড়। ঝুঁকিয়া-পড়া গাছের ডাল হইতে গুলঞ্চলতা ঝুলিতেছে। একটু দূরের দিকে কিন্তু কাকচক্ষুর মতো কালো জল। সাড়া পাইয়া ক-টা ডাকপাখি নলবনে ঢুকিল। অল্প খানিকটা ডাইনে বিড়ালআঁচড়ার কাঁটাঝোপের নীচে এককালে যে বাঁধানো ঘাট ছিল, এখন বেশ বুঝিতে পারা যায়।

সেই ভাঙাঘাটের অনতিদূরে পাতলা পাতলা সেকেলে ইটের পাহাড়। কতদিন পূর্বে বিস্মৃত শতাব্দীর কত কত নিভৃত সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রে জানকীরাম হয়তো প্রিয়তমাকে লইয়া ওখান হইতে টিপিটিপি এই পথ বহিয়া এই সোপান বহিয়া দীঘির ঘাটে ময়ূরপঙ্খীতে চড়িতেন। গভীর অরণ্যছায়ে সেই আসন্ন সন্ধ্যায় ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের সমস্ত সংবিৎ হঠাৎ কেমন আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

ধ্যেত, আমার ভয় করে—কেউ যদি দেখে ফেলে!

কে দেখবে আবার? কেউ কোথাও জেগে নেই, চলো মালতীমালা—লক্ষ্মীটি, চলো যাই।

আজ থাক, না না—তোমার পায়ে পড়ি, আজকের দিনটে থাক শুধু।

ঐ যেখানে আজ পুরানো ইটের সমাধিস্তূপ, ওখানে বড় বড় কক্ষ অলিন্দ বাতায়ন ছিল, উহারই কোনোখানে হয়তো একদা তারা-খচিত রাত্রে ময়ূরপঙ্খীর উচ্ছ্বসিত বর্ণনা শুনিতে শুনিতে এক তন্বঙ্গী রূপসী রাজবধূর চোখের তারা

লোভে ও কৌতুকে নাচিয়া উঠিতেছিল, শব্দ হইবে বলিয়া স্বামী হয়তো বধূর পায়ের নূপুর খুলিয়া দিল, নিঃশব্দে খিড়কি খুলিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া দুইটি চোর স্বপ্নপুরী হইতে বাহির হইয়া ঘাটের উপর নৌকায় উঠিল, রাজবাড়ির কেউ তা জানিল না। ফিসফাস কথাবার্তা···স্বচ্ছ মেঘের আড়ালে চাঁদ মৃদু মৃদু হাসিতেছিল···শব্দ হইবার ভয়ে দাঁড়ও নামায় নাই···এমনি বাতাসে বাতাসে ময়ূরপঙ্খী মাঝদীঘি অবধি ভাসিয়া চলিল—

ভাসিতে ভাসিতে দূরে—বহুদূরে—শতাব্দীর আড়ালে কোথায় তাহারা ভাসিয়া গিয়াছে!

ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের কেমন ভয় করিতে লাগিল। গভীর নির্জনতার একটি ভাষা আছে, এমন জায়গায় এমনি সময় আসিয়া দাঁড়াইলে তবে তাহা স্পষ্ট অনুভব হয়। চারিপাশের বনজঙ্গল অবধি ঝিম ঝিম করিয়া যেন এক অপূর্ব ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভয় হইল, আরও কিছুক্ষণ সে যদি এখানে এমনিভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, জমিয়া নিশ্চয় গাছের গুঁড়ির মতো হইয়া এই বনরাজ্যের একজন হইয়া যাইবে, আর নড়িবার ক্ষমতা থাকিবে না। সহসা সচেতন হইয়া বারংবার সে নিজের স্বরূপ ভাবিতে লাগিল, সে সরকারী কর্মচারী···তার পসার-প্রতিপত্তি···ভবিষ্যতের আশা··· মনকে ঝাঁকা দিয়া দিয়া সমস্ত কথা স্মরণ করিতে লাগিল। ডাকিল: আমিন মশাই!

ভজহরি কহিল, সন্ধ্যে হয়ে গেল, হুজুর।

যাচ্ছি।

ক্যাম্পের কাছাকাছি হইয়া শঙ্কর হাসিয়া উঠিল। কহিল, ডাকাত পড়েছে নাকি আমাদের তাঁবুতে? বাপরে বাপ! এবং হাসির সহিত ক্ষণ-পূর্বের অনুভূতিটা সম্পূর্ণরূপে উড়াইয়া দিয়া বলিতে লাগিল, চুরুট টেনে টেনে তো আর চলে না—হুঁকো-কলকের ব্যবস্থা করতে পার আমিন মশাই, খাঁটি স্বদেশি মতে বসে বসে টানা যায়?

আমিনও হাসিয়া বলিল, অভাব কি? মুখের কথা না বেরুতে গাঁ থেকে বিশটা রুপোবাঁধা হুঁকো এসে হাজির হবে, দেখুন না একবার—

গ্রামের ইতর-ভদ্র অনেকে আসিয়াছিল, উহাদের দেখিয়া তটস্থ হইয়া সকলে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। মিনিট দশেক পরে শঙ্কর তাঁবুর বাহিরে আসিয়া মামলার বিচারে বসিল। বলিল, মুখের কথায় হবে না কিছু,

আপনাদের দলিলপত্তোর কার কি আছে দেখান একে একে। ধনঞ্জয় চাকলাদার আগে আসুন।

ধনঞ্জয় সামনে আসিল। কোষ্ঠীর মতো জড়ানো একখানা হলদে রঙের কাগজ, কালো ছাপ-মারা পোকায় কাটা, সেকেলে বাংলা হরফে লেখা। শঙ্কর বিশেষ কিছু পড়িতে পারিল না, ভজহরি কিন্তু হেরিকেনটা তুলিয়া ধরিয়া অবাধে আগাগোড়া পড়িয়া গেল। কে-একজন দয়ালকৃষ্ণ চক্রবর্তী নামজাদ রাজারামের গড় একশ বারো বিঘা নিষ্কর জায়গা-জমি মায় বাগিচা-পুষ্করিণী তারণচন্দ্র চাকলাদার মহাশয়ের নিকট সুস্থ শরীরে সরল মনে খোশকোবলায় বিক্রয় করিতেছে।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল: ঐ তারণচন্দ্র চাকলাদার আপনার কেউ হবেন বুঝি ধনঞ্জয়বাবু?

ধনঞ্জয় সোৎসাহে কহিতে লাগিল, ঠিক ধরেছেন হুজুর, তারণচন্দোর আমার প্রপিতামহ। পিতামহ হলেন কৈলাসচন্দোর—তাঁর বাবা। তিরাশি সন থেকে এই সব নিষ্করের সেস গুনে আসছি কালেক্টরিতে, গুডিভ সাহেবের জরিপের চিঠে রয়েছে। কবলার তারিখটে একবার লক্ষ্য করে দেখবেন, হুজুর—

আরও অনেক কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু উপস্থিত অনেকে না না—করিয়া উঠিল। তাহারাও রাজারামের গড়ের মালিক বলিয়া নাম লেখাইয়াছে, এতক্ষণ অনেক কষ্টে ধৈর্য ধরিয়া শুনিতেছিল, কিন্তু আর থাকিতে পারিল না।

ধমক খাইয়া সকলে চুপ করিল। শঙ্কর ভজহরিকে চুপিচুপি কহিল, তুমি ঠিকই লিখেছ, চাকলাদার আসল মালিক, আপত্তিগুলো ভুয়ো—ডিসমিস করে দেব।

ভজহরি কিন্তু সন্দিগ্ধভাবে এদিক-ওদিক বার দুই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আসল মালিক ধরা বড় শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে, হুজুর—

বারো-শ উনিশ সনের পুরোনো দলিল দেখাচ্ছে যে!

ভজহরি কহিতে লাগিল, এখানে আটঘরা গ্রামে একজন লোক রয়েছে, ন-সিকে কবুল করুন তার কাছে গিয়ে—উনিশ সন তো কালকের কথা, হুবহু আকব্বর বাদশার দলিল বানিয়ে দেবে। আসল নকল চেনা যাবে না।

বস্তুত ধনঞ্জয়ের পর অন্যান্য সাতজনের কাগজপত্র তলব করিয়া দেখা গেল, ভজহরি মিথ্যা বলে নাই—ঐ রকম পুরানো দলিল সকলেরই আছে। এবং বাঁধুনিও প্রত্যেকটির এমনি নিখুঁত যে যখনই যাহার কাগজ দেখে একেবারে

নিঃসন্দেহ বুঝিয়া যায়, রাজারামের গড়ের মালিক একমাত্র সেই লোকটাই। এ যেন গোলক-ধাঁধায় পড়িয়া গেল। বিস্তর ভাবিয়া-চিন্তিয়া সাব্যস্ত হইল না কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে রাখা যায়।

হাল ছাড়িয়া দিয়া অবশেষে শঙ্কর বলিল, দেখুন মশাইরা, আপনারা ভদ্রসন্তান—

হাঁ—হাঁ—করিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল।

এই একটা প্লট একসঙ্গে ঐরকম ভাবে আটজনের তো হতে পারে না?

সকলেই ঘাড় নাড়িল। অর্থাৎ, নয়ই তো—

আপনারা হলফ করে বলুন, এর সত্যি মালিক কে।

ভদ্রসন্তানেরা তাহাতে পিছপাও নহেন। একে একে সামনে আসিয়া ঈশ্বরের দিব্য করিয়া বলিল, দু-শ বারোর প্লট একমাত্র তাহারই, অপর সকলে চক্রান্ত করিয়া মিথ্যা কথা কহিতেছে।

লোকজন বিদায় হইয়া গেলে শঙ্কর বলিল, না, এরা পাটোয়ারি বটে! দেখে-শুনে সম্ভ্রম হচ্ছে।

ভজহরি মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, এ রকম সে অনেক দেখিয়াছে।

শঙ্কর বলিতে লাগিল, তোমার কথাই মেনে নিলাম যে কাঁচা দলিলগুলো জাল। কিন্তু যেগুলো রেজেষ্ট্রি? দেখ, এদের দূরদৃষ্টি কত দেখ একবার—কবে কি হবে, দু পুরুষ আগে থেকে তাই তৈরি হয়ে আসছে। চুলোয় যাকগে দলিলপত্তোর—তুমি গাঁয়ে খোঁজখবর করে কি পেলে বল? যা হোক একরকম রেকর্ড করে যাই—পরে যেমন হয় হবে।

ভজহরি বলিল, কত লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি আসবার আগে কত সাক্ষিসাবুদ তলব করেছি, সে আরও মজা—এক একজনে এক-এক রকম বলে। বলিয়া সহসা প্রচুর হাসিতে হাসিতে বলিল, নরলোকে আশকারা হল না, এখন একবার কুমার বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করতে পারলে হয়।

শঙ্কর কথাটা বুঝিতে পারিল না।

ভজহরি বলিতে লাগিল, কুমার বাহাদুর মানে জানকীরাম। সেই যে তখন ময়ূরপঙ্খীর কথা বলছিলাম, গাঁয়ের লোকেরা বলে—আশপাশের গ্রাম নিশুতি হয়ে গেলে জানকীরাম নাকি আসেন—উত্তর মাঠের ঐ নাক-কাটির খাল পেরিয়ে তেঘরা বকচরের দিক থেকে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে রোজ রাত্তিরে

মালতীমালার সঙ্গে দেখা করে যান—সে ভারি অদ্ভুত গল্প—কাজকর্ম নেই তো এখন ?

* * *

তারপর রাত্রি অনেক হইল। তিনটি তাঁবুরই আলো নিভিয়াছে, কোনো দিকে সাড়াশব্দ নাই। শঙ্করের ঘুম আসিতেছিল না। একটা চুরুট ধরাইয়া বাহিরে আসিল, আসিয়া মাঠে খানিক পায়চারি করিতে লাগিল।

ভজহরি বলিয়াছিল, কেবল জঙ্গল নয় হুজুর, এই মাঠেও সন্ধ্যের পর একলা কেউ আসে না। এই মাঠ সেই যুদ্ধক্ষেত্র, নদীপথে শত্রুরা এসেছিল। বেলা না ডুবতে রাজারামের পাঁচ-শ ঢালী ঘায়েল হয়ে গেল, সেই পাঁচ-শ মড়ার পা ধরে টেনে টেনে পরদিন ঐ নদীতে ফেলে দিয়েছিল···

উলুঘাসের উপর পা ছড়াইয়া চুপটি করিয়া বসিয়া শঙ্কর আনমনে ক্রমাগত চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।

চার-শ বৎসর আগে আর একদিন সন্ধ্যায় গ্রামনদীকূলবর্তী এই মাঠের উপর এমনি চাঁদ উঠিয়াছিল। তখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়া সমস্ত মাঠে ভয়াবহ শান্তি থমথম করিতেছে। চাঁদের আলোয় স্তব্ধ রণভূমির প্রান্তে জানকীরামের জ্ঞান ফিরিল। দূরে গড়ের প্রাকারে সহস্র সহস্র মশালের আলো—আকাশ চিরিয়া শত্রুর অশ্রান্ত জয়োল্লাস·· দুই হাতে ভর দিয়া অনেক কষ্টে জানকীরাম উঠিয়া বসিয়া তাঁহারই অনেক আশা ও ভালোবাসার নীড় ঐ গড়ের দিকে চাহিতে চাহিতে অকস্মাৎ দুই চোখ ভরিয়া জল আসিল। ললাটের রক্তধারা ডান হাতে মুছিয়া ফেলিয়া পিছনে তাকাইয়া দেখিলেন, কেবল কয়েকটা শিয়াল নিঃশব্দে শিকার খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—কোনো দিকে কেহ নাই···

সেই সময়ে ওদিকে অন্দরের বাতায়নপথে তাকাইয়া মালতীমালাও চমকিয়া উঠিলেন, তবে কি একেবারেই—? অবমানিত রাজপুরীর উপরেও গাঢ় নিঃশব্দতা নামিয়া আসিয়াছে। দাসী বিবর্ণমুখে পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। মালতীমালা আয়ত কালো চোখে তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন: শেষ ?

খবর আসিল, গুপ্তদ্বার খোলা হইয়াছে, পরিজনেরা সকলে বাহির হইয়া যাইতেছে।

দাসী বলিল, বউমা, উঠুন—

বধূ বলিলেন, নৌকা সাজানো হোক।

কেহ সে কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। নদীর ঘাটে শত্রুর বহর

ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সে সন্ধানী-দৃষ্টি ভেদ করিয়া জলপথে পলাইবার সাধ্য কি!

মালতীমালা বলিলেন, নদীর ঘাটে নয় রে, দীঘির ময়ূরপঙ্খী সাজাতে হুকুম দিয়েছি। খবর নিয়ে আয়, হল কি না।

সেদিন সন্ধ্যায় রাজোদ্যানে কনকচাঁপা গাছে যে ক-টি ফুল ফুটিয়াছিল তাড়াতাড়ি সেগুলি তুলিয়া আনা হইল, মালতীমালা লোটন-খোঁপা ঘিরিয়া তার কতকগুলি বসাইলেন, বাকিগুলি আঁচল ভরিয়া লইলেন। সাধের মুক্তাফল দুটি কানে পরিলেন, পায়ে আলতা দিলেন, মাথায় উজ্জ্বল সিঁদুর পরিয়া কত মনোরম রাত্রির ভালোবাসার স্মৃতি-মণ্ডিত ময়ূরপঙ্খীর কামরার মধ্যে গিয়া বসিলেন।

নৌকা ভাসিতে ভাসিতে অনেক দূর গেল। তখন বিজয়ীরা গড়ে ঢুকিয়াছে, নদীর পাড় দিয়া দলে দলে রক্তপতাকা উড়াইয়া জনমানবশূন্য প্রাসাদে ঢুকিতে লাগিল। সমস্ত পুরবাসী গুপ্তপথে পলাইয়াছে।

বিশ-পচিশটি মশালের আলো দীঘির জলে পড়িল।

ধর, ধর নৌকা—

মালতীমালা তলির পাটাখানি খুলিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে দীর্ঘ মাস্তলটিও নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। নৌকা কেহ ধরিতে পারিল না, কেবল কেমন করিয়া কোন ফাঁক দিয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠিল আঁচলের চাঁপাফুল কয়েকটি।

তার পর ক্রমে রাত্রি আরও গভীর হইয়া গড়ের উঁচু চূড়ার আড়ালে চাঁদ ডুবিল। আকাশে কেবল উজ্জ্বল তারা কয়েকটি পরাজিত বিগত-গৌরব ভগ্নজানু জানকীরামের ধূলিশয্যার উপর নির্নিমেষ দৃষ্টি বিসারিত করিয়া ছিল। সেই সময় কে-একজন অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া অতি সন্তর্পণে আসিয়া রাজকুমারকে ধরিয়া তুলিল।

চলুন, প্রভু—

কোথা?

বটতলায়। ওখানে ঘোড়া রেখেছি, ঘোড়ায় তুলে নিয়ে চলে যাব।

গড়ের আর আর সব?

বিশ্বস্ত পরিচারক গড়ের ঘটনা সব কহিল। বলিল, কোনো চিহ্ন নেই আর জলের উপর কনকচাঁপা ছাড়া—

কই? বলিয়া জানকীরাম হাত বাড়াইলেন। বলিলেন, আনতে পারনি?

ঘোড়ায় তুলে দিতে পার আমায়? দাও না আমায় তুলে দয়া করে—আমি একটা ফুল আনব শুধু।

নিষেধ মানিলেন না। খটখট খটখট করিয়া সেই অন্ধকারে উত্তরমুখো বাতাসের বেগে ঘোড়া ছুটিল। সকালে দেখা গেল, পরিখার মধ্যে যেখানে আজকাল ধান হইয়া থাকে—জানকীরাম পড়িয়া মরিয়া আছেন, ঘোড়ার কোন সন্ধান নাই।

সেই হইতে নাকি প্রতি রাত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া আসিতেছে। রাত দুপুরে সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন মধ্য-আকাশে আসিয়া পৌঁছে, আশপাশের গ্রাম-গুলিতে নিষুপ্তি ক্রমশ গাঢ়তম হইয়া উঠে, সেই সময়ে রাতের পর রাত ঐ গভীর নির্জন জঙ্গলের মধ্যে চার শ বছর আগেকার সেই রাজবধূ পঙ্কদীঘির হিম-শীতল অতল জলশয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ান, ভাঙা ঘাটের সোপান বহিয়া বিড়ালআঁচড়ার গভীর কাঁটাবন দুই হাতে ফাঁক করিয়া সাবধানে লঘু চরণ মেলিয়া তিনি ক্রমশ আগাইতে থাকেন। তবু বনের একটানা ঝিঁঝিঁর আওয়াজের সঙ্গে পায়ের নূপুর ঝুন-ঝুন করিয়া বাজিয়া উঠে। কুঙ্কুমে-মাজা মুখ, গায়ে শ্বেতচন্দন আঁকা, সিঁথায় সেই চার শতাব্দী আগেকার সিঁদুর লাগানো, পায়ে রক্তবরণ আলতা, অঙ্গের চিত্র-বিচিত্র কাঁচলি ও মেঘডম্বুর শাড়ি হইতে জল ঝরিয়া ঝরিয়া বনভূমি সিক্ত করে—বনের প্রান্তে আমের গুঁড়ি ঠেস দিয়া দক্ষিণের মাঠে তিনি তাকাইয়া থাকেন...

আবার বর্ষায় যখন ঐ গড়খাই কানায় কানায় একেবারে ভরিয়া যায়, ঘোড়া তখন জল পার হইয়া বনের সামনে পৌঁছিতে পারে না, মালতীমালা সেই কয়েকটা মাস আগাইয়া ফাঁকা মাঠের মধ্যে আসিয়া দাঁড়ান। দুধসর ধানের সুগন্ধি ক্ষেতের পাশে পাশে ভিজা আলের উপর হিম-রাত্রির শিশিরে পায়ের আলতার অস্পষ্ট ছোপ লাগে, চাষারা সকাল বেলা দেখিতে পায়, কিন্তু রোদ উঠিতে না উঠিতে সমস্ত নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া যায়।

চুরুটের অবশিষ্টটুকু ফেলিয়া দিয়া শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল। মাঠের ওদিকে মুচিপাড়ায় পোয়ালগাদা, খোড়ো ঘর, নূতন বাঁধা গোলাগুলি কেমন বেশ শান্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। চৈত্রমাসের সুশুভ্র জ্যোৎস্নায় দূরের আবছা বনের দিকে চাহিতে চাহিতে চারদিককার সুপ্তিরাজ্যের মাঝখানে বিকালের দেখা সেই সাধারণ বন হঠাৎ অপূর্ব রহস্যময় ঠেকিল, ঐখানে এমনি সময়ে বিস্মৃত যুগের বধূ তাকাইয়া আছে, নায়ক তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া সেই দিকে যাইতেছে, কিছুই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। মনে হয়, সন্ধ্যাকালে ওখানে সে যে

অচঞ্চল নিষ্ক্রিয় ভাব দেখিয়া আসিয়াছে, এতক্ষণ জঙ্গলের সে রূপ বদলাইয়া গিয়াছে, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি আজও যাহা আবিষ্কার করিতে পারে নাই তাহারই কোনও একটা অপূর্ব ছন্দ-সঙ্গীতময় গুপ্ত রহস্য এতক্ষণ ওখানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে তার সুধারাণীর কথা মনে পড়িল—সে যা-যা বলিত, যেমন করিয়া হাসিত, রাগ করিত, ব্যথা দিত, প্রতিদিনকার তুচ্ছাতিতুচ্ছ সেই সব কথা। ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের চোখে জল আসিয়া পড়িল। জাগরণের মধ্যে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া কোনদিন সে আর আসিবে না। · ক্রমশ তাহার মনে কারণ-যুক্তিহীন একটা অদ্ভুত ধারণা চাপিয়া বসিতে লাগিল। ভাবিল, সে দিনের সেই সুধারাণী, তার হাসি চাহনি, তার ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রত্যেকটি স্পন্দন পর্যন্ত এই জগৎ হইতে হারায় নাই—কোনোখানে সজীব হইয়া বর্তমান রহিয়াছে, মানুষে তার খোঁজ পায় না। ঐ সব জনহীন বন-জঙ্গলে এইরূপ গভীর রাত্রে একবার খোঁজ করিয়া দেখিলে হয়। শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, কেবল মালতীমালা সুধারানী নয়, সৃষ্টির আদিকাল হইতে যত মানুষ অতীত হইয়াছে, যত হাসি-কান্নার ঢেউ বহিয়াছে, যত ফুল ঝরিয়াছে, যত মাধবী-রাত্রি পোহাইয়াছে, সমস্তই যুগের আলো হইতে এমনি কোথাও পলাইয়া রহিয়াছে। তদ্‌গত হইয়া যেই মানুষ পুরাতনের স্মৃতি ভাবিতে বসে অমনি গোপন আবাস হইতে তারা টিপিটিপি বাহির হইয়া মনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। স্বপ্নঘোরে সুধারানী এমনি কোনখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কত রাতে তার কাছে আসিয়া বসিয়াছে, আদর করিয়াছে, ঘুম ভাঙিলে আবার বাতাসে মিশাইয়া পলাইয়া গিয়াছে!···

বটতলায় বটের ঝুরির সঙ্গে ঘোড়া বাঁধা ছিল, ঐখানে আপাতত আস্তাবলের কাজ চলিতেছে, পৃথক ঘর আর বাঁধা হয় নাই। নিজে নিজেই জিন কষিয়া স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো শঙ্কর ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিল। ঘোড়া ছুটিল। সুপ্ত গ্রামের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনুকম্পা হইতে লাগিল—মূর্খ তোমরা, জঙ্গলের বড় বড় কাঁঠাল গাছগুলাই তোমাদের কেবল নজরে পড়িল এবং গাছ মারিয়া তক্তা কাটাইয়া দু পয়সা পাইবার লোভে এত মকদ্দমা-মামলা করিয়া মরিতেছ। গভীর নিঝুম রাত্রে ছায়ামগ্ন সেই আম কাঁঠাল-পিত্তিরাজের বন, সমস্ত ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল, পদ্মদীঘির এপার-ওপার যাঁদের রূপের আলোয় আলো হইয়া যায়, এতকাল পাশাপাশি বাস করিলে একটা দিন তাঁদের খবর লইতে পারিলে না!

গড়খাই পার হইয়া বনের সামনে আসিয়া ঘোড়া দাঁড়াইল। একটা গাছের ডালে লাগাম বাঁধিয়া শঙ্কর আমিনদের সেই জঙ্গল-কাটা সঙ্কীর্ণ পথের উপর আসিল। প্রবেশমুখের দুইধারে দুইটি অতিবৃহৎ শিরীষ গাছ, বিকালে ভজহরির সঙ্গে কথায় কথায় এসব নজর পড়ে নাই, এখন বোধ হইল মায়াপুরীর সিংহদ্বার উহারা। সেইখানে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ সে সেই ছায়াময় নৈশ বনভূমি দেখিতে লাগিল। আর তাহার অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না, মৃত্যু-পারের গুপ্ত রহস্য আজি প্রভাত হইবার পূর্বে ঐখান হইতে নিশ্চয় আবিষ্কার করিতে পারিবে। আমাদের জন্মের বহুকাল আগে এই সুন্দরী পৃথিবীকে যারা ভোগ করিত, বর্তমান কালের দুঃসহ আলো হইতে তারা সব তাদের অদ্ভুত রীতি-নীতি বীর্য ঐশ্বর্য প্রেম লইয়া সৌরালোকবিহীন ঐ বনরাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। আজ জনহীন মধ্যরাত্রে যদি এই সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া নাম ধরিয়া ধরিয়া ডাক দেওয়া যায়, শতাব্দীপারের বিচিত্র মানুষেরা অন্ধকারের যবনিকা তুলিয়া নিশ্চয় চাহিয়া দেখিবে।

কয়েক পা আগাইতে অসাবধানে পায়ের নিচে শুকনা ডালপালা মড়মড় করিয়া ভাঙিয়া যেন মর্মস্থানে বড় ব্যথা পাইয়া বনভূমি আর্তনাদ করিয়া উঠিল। স্থির গম্ভীর অন্ধকারে নির্নিরীক্ষ্য সান্ত্রিগণ তাহাকে বাক্যহীন আদেশ করিল: জুতা খুলিয়া এসো।

শুকনা পাতা খসখস করিতেছে, চারিপাশে কত লোকের আনাগোনা··· জ্যোৎস্নার আলো হইতে আঁধারে আসিয়া শঙ্করের চোখ ধাঁধিয়া গিয়াছে বলিয়াই সে যেন কিছু দেখিতে পাইতেছে না। মনের ঔৎসুক্যে উদ্বেগাকুল আনন্দে কম্পিত হস্তে পকেট হইতে তাড়াতাড়ি সে টর্চ বাহির করিয়া জ্বালিল।

জ্বালিয়া চারিদিক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখে—শূন্য বন। বিশ্বাস হইল না, বারংবার দেখিতে লাগিল।···আর-একটা দিনের ব্যাপার শঙ্করের মনে পড়ে। দুপুরবেলা, বিয়ের কয়েকটা দিন পরেই, সুধারানী ও আর কে-কে তার নূতন দামি তাসজোড়া লইয়া চুরি করিয়া খেলিতেছিল। তখন তার আর-এক গ্রামে নিমন্ত্রণে যাইবার কথা, সন্ধ্যার আগে ফিরিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু কি গতিকে যাওয়া হইল না। বাহির হইতে খেলুড়েদের খুব হৈ-চৈ শোনা যাইতেছিল, কিন্তু ঘরে ঢুকিতে না ঢুকিতে সকলে কোন দিক দিয়া কি করিয়া যে পলাইয়া গেল—শঙ্কর দেখিয়াছিল, কেবল তাসগুলি বিছানার উপর ছড়ানো···

টর্চের আলোয় কাঁটাবনের ফাঁকে ফাঁকে সাবধানে দীঘির সোপানের কাছে গিয়া সে বসিল। জলে জ্যোৎস্না চিকচিক করিতেছে। আলো নিভাইয়া চুপটি করিয়া অনেকক্ষণ সে বসিয়া রহিল।

ক্রমে চাঁদ পশ্চিমে হেলিয়া পড়িল। কোনো দিকে কোনো শব্দ নাই, তবু অনুভব হয়—তার চারিপাশের বনবাসীরা ক্রমশ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে। প্রতিদিন এই সময়ে তারা একটি অতি-দরকারী নিত্যকর্ম করিয়া থাকে, শঙ্কর যতক্ষণ এখানে থাকিবে ততক্ষণ তা হইবে না—কিন্তু তাড়া বড্ড বেশি। নিঃশব্দে ইহারা তার চলিয়া যাওয়ার প্রতীক্ষা করিতেছে।

হঠাৎ কোনদিক হইতে হু হু করিয়া হাওয়া বহিল, এক মুহূর্তে মর্মরিত বনভূমি সচকিত হইয়া উঠিল। উৎসবক্ষেত্রে নিমন্ত্রিতেরা এইবার যেন আসিয়া পড়িয়াছে, অথচ এদিকে কোনো কিছুর যোগাড় নাই। চারিদিকে মহা শোরগোল পড়িয়া গেল। অন্ধকার রাত্রির পদধ্বনির মতো সহস্রে সহস্রে ছুটাছুটি করিতেছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে এখানে ওখানে কম্পমান ক্ষীণ জ্যোৎস্না, সে যেন মহামহিমার্ণব যারা সব আসিয়াছে, তাহাদের সঙ্গের সিপাহিসৈন্যের বল্লমের সুতীক্ষ্ণ ফলা। নিঃশব্দচারীরা অঙ্গুলি-সঙ্কেতে শঙ্করকে দেখাইয়া দেখাইয়া পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল: এ কে? এ কোথাকার কে—চিনি না তো!

উৎকর্ণ হইয়া সমস্ত শ্রবণশক্তি দিয়া শঙ্কর আরও যেন শুনিতে লাগিল, কিছু দূরে সর্বশেষ সোপানের নিচে কে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে! কণ্ঠ অনতিস্ফুট, কিন্তু চাপা কান্নার মধ্য দিয়া গলিয়া গলিয়া তার সমস্ত ব্যথা বনভূমির বাতাসের সঙ্গে চতুর্দিকে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অন্ধকারলিপ্ত প্রেতের মতো গাছেরা মুখে আঙুল দিয়া তাহাকে বারংবার থামিতে ইশারা করিতেছে—সর্বনাশ করিল, সব জানাজানি হইয়া গেল!...

কিন্তু কান্না থামিল না। নিশ্বাস রোধ করিয়া ঐ অতল জলতলে চার-শ বছরের জরাজীর্ণ ময়ূরপঙ্খীর কামরার মধ্যে যে মাধুরীমতী রাজবধূ সারাদিনমান অপেক্ষা করে, গভীর রাতে এইবার সে ঘোমটা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া নিত্যকার মতো উৎসবে যোগ দিতে চায়। যেখানে শঙ্কর পা ঝুলাইয়া বসিয়া ছিল, তাহার কিছু নিচে জলে-ডোবা সিঁড়ির ধাপে মাথা কুটিয়া কুটিয়া বোবার মতো সে বড় কান্না কাঁদিতে লাগিল।

তারপর কখন চাঁদ ডুবিয়া দীঘিজল আঁধার হইল, বাতাসও একেবারে বন্ধ হইয়া গেল, গাছের পাতাটিরও কম্পন নাই—কান্না তখনও চলিতেছে। অতিষ্ঠ হইয়া কাহারা দ্রুতহাতে চারিদিকে অন্ধকারের মধ্যে ঘন কালো পর্দা খাটাইয়া দিতে লাগিল—শঙ্কর বসিয়া থাকে, থাকুক—তাহাকে কিছুই উহারা দেখিতে দিবে না।

আবার টর্চ টিপিয়া চারিদিকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিল। আলো জ্বলিতে না জ্বলিতে গাছের আড়ালে কে কোথায় সব যেন পলাইয়া গিয়াছে, কোনো-দিকে কিছু নাই।

তখন শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে কহিতে লাগিল, আমি চলিয়া যাইতেছি, তুমি আর কাঁদিও না হে লজ্জারুণা রাজবধূ, মৃণালের মতো দেহখানি তুমি দীঘির তল হইতে তুলিয়া ধরো, আমি তাহা দেখিব না। অন্ধকার রাত্রি, অনাবিষ্কৃত দেশ, অজানিত গিরিগুহা, গভীর অরণ্যভূমি এ সব তোমাদের। অনধিকারের রাজ্যে বসিয়া থাকিয়া তোমাদের ব্যাঘাত ঘটাইয়া কাঁদাইয়া গেলাম, ক্ষমা করিও—

যাইতে যাইতে আবার ভাবিল, কেবল এই সময়টুকুর জন্য কাঁদাইয়া বিদায় লইয়া গেলেও না হয় হইত। তাহা তো নয়। সে যে ইহাদের একেবারে উদ্বাস্ত করিতে এখানে আসিয়াছে। জরিপ শেষ হইয়া একজনের দখল দিয়া গেলে বন কাটিয়া লোকে এখানে টাকা ফলাইবে। এত নগর-গ্রাম মাঠ-ঘাটেও মানুষের জায়গায় কুলায় না—তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে, পৃথিবীতে বন-জঙ্গল এক কাঠা পড়িয়া থাকিতে দিবে না। তাই শঙ্করকে সেনাপতি করিয়া আমিনের দলবল যন্ত্রপাতি নক্শা কাগজপত্র দিয়া ইহাদের এই শত শত বৎসরের শান্ত নিরিবিলি বাসভূমি আক্রমণ করিতে পাঠাইয়া দিয়াছে। শাণিত খড়্গের মতো ভজহরির সেই সাদা সাদা দাঁত মেলিয়া হাসি—উৎপাত কি আমরা কম করছি হুজুর? সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই, কম্পাস নিয়ে চেন ঘাড়ে করে করে·····

কিন্তু মাথার উপরে প্রাচীন বনস্পতিরা ভ্রূকুটি করিয়া যেন কহিতে লাগিল, তাই পারিবে নাকি কোনো দিন? আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাল ঠুকিয়া জঙ্গল কাটিতে কাটিতে সামনে তো আগাইতেছ আদিকাল হইতে, পিছনে পিছনে আমরাও তেমনি তোমাদের তাড়াইয়া চলিয়াছি। বন-কাটা রাজ্যে নূতন ঘর তোমরা বাঁধিতে থাক, পুরানো ঘরবাড়ি আমরা ততক্ষণ দখল করিয়া বসিব।···

হা-হা হা-হা-হা তাহাদেরই হাসির মতো আকাশে পাখা ঝাপটাইতে ঝাপটাইতে কালো এক ঝাঁক বাদুড় বনের উপর দিয়া মাঠের উপর দিয়া উড়িতে উড়িতে গ্রামের দিকে চলিয়া গেল।···

বনের বাহির হইয়া শঙ্কর ঘোড়ায় চাপিল। ঘোড়া আস্তে আস্তে হাঁটাইয়া ফিরিয়া চলিল। পিছনের বনে ডালে ডালে ঝাঁক-বাঁধা জোনাকি, আমের গুটি ঝরিতেছে তার টুপটাপ শব্দ, অজানা ফুলের গন্ধ···বারবার পিছন দিকে

সে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইতে লাগিল। অনেক দূরে কোথায় কুকুর ডাকিতেছে, কাহাদের বাড়িতে আকাশ-প্রদীপ আকাশের তারার সহিত পাল্লা দিয়া দপদপ করিতেছে···এইবার গিয়া সেই নিরালা তাঁবুর মধ্যে ক্যাম্প-খাটটির উপর পড়িয়া পড়িয়া ঘুম দিতে হইবে। যদি এই সময় মাঠের এই অন্ধকারের মধ্যে সুধারানী আসিয়া দাঁড়ায়···কপালে জলজ্বলে সিঁদুর, একপিঠ চুল এলাইয়া টিপিটিপি দুষ্টামির হাসি হাসিতে হাসিতে যদি সুধারানী ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া দুই চোখ ভরিয়া তার দিকে তাকাইয়া থাকে···মাথার উপর তারাভরা আকাশ, কোন দিকে কেউ নাই—ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া শঙ্কর তাহার হাত ধরিয়া ফেলিবে, হাত ধরিয়া কঠোর স্বরে শুনাইয়া দিবে—কি শুনাইবে সে? শুধু তাহাকে এই কথাটা জিজ্ঞাসা করিবে: কি করেছি আমি তোমার?

এই সময় হঠাৎ লাফ দিয়া ঘোড়া একটা আল পার হইল। শঙ্করের হুঁশ হইল, এতক্ষণের মধ্যে এখনও গড়খাই পার হয় নাই—জঙ্গল বেড়িয়া ঘোড়া ক্রমাগত ধানক্ষেতের উপর দিয়াই চলিয়াছে। জুতা-পায়ে জোরে ঠোক্কর দিল, আচমকা আঘাত পাইয়া ঘোড়া ছুটিল। গড়খাইয়ের যেন শেষ নাই, যত চলে ততই ধানবন, দিক ভুল হইয়া গিয়াছে, মাঠে না উঠিয়া ধানবন ঘুরিয়া মরিতেছে। শঙ্করের মনে হইতে লাগিল, যেমন এখানে সে মজা দেখিতে আসিয়াছিল, ঘোড়াসুদ্ধ তাহাকে ঐ বনের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সমস্ত রাত ছুটিলেও কেবল বন প্রদক্ষিণ করিতে হইবে—নিষ্কৃতি নাই—গড়খাই পার হইয়া মাঠে পৌছানো রাত পোহাইবার আগে ঘটিবে না। জেদ চাপিয়া গেল, ঘোড়া জোরে—আরও জোরে—বিদ্যুতের বেগে ছুটাইল, ভাবিল এমনি করিয়া সেই অদৃশ্য ভয়ানক বাঁধন ছিঁড়িবে। আর একটা উঁচু আল, অন্ধকারে ঠাহর হইল না, ছুটিতে ছুটিতে হুমড়ি খাইয়া ঘোড়া সমেত তাহার উপর পড়িল। শঙ্করের মনে হইল, ঘোড়ার ঝুঁটি ধরিয়া তাহাকে আলের উপর কে জোরে আছাড় মারিল। তীব্র আর্তনাদ করিতে করিতে সে নিচে গড়াইয়া পড়িল। ঘোড়াও ভয় পাইয়া গেল, শঙ্করকে মাড়াইয়া ফেলিয়া ঝড়ের মতো মাঠে গিয়া উঠিল। শুকনা মাঠের উপর দ্রুত বেগে খুর বাজাইতে লাগিল—খট খট খট খট। রাত্রির শেষ প্রহর, আকাশে শুকতারা জ্বলিতেছে। চার শ বছর আগে যেখানে একদা জানকীরাম পড়িয়া মরিয়া ছিলেন, সেইখানে অর্ধমূর্ছিত শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, সেই জানকীরাম কোন দিক হইতে আসিয়া তাহাকে ফেলিয়া ঘোড়া কাড়িয়া লইয়া উত্তর-মাঠের ওপারে তেঘরা বকচরের দিকে চলিয়া যাইতেছেন। ঘোড়ার খুরের শব্দ আঁধার মাঠে ক্রমশ মিলাইয়া যাইতে লাগিল।

রা জা

উড়ো খবর নয়—পোস্টকার্ডের চিঠি, সুধীর নিজ হাতে লিখিয়াছে—

বাবা, বহুদিন আপনাদের কুশল-সংবাদ না পাইয়া চিন্তিত আছি। শনিবার বারোটার গাড়িতে বাড়ি পৌঁছিয়া শ্রীচরণ দর্শন করিব এবং বিস্তারিত সাক্ষাৎ মতে নিবেদন করিব—

শনিবার অর্থাৎ আগামী কাল। নিবারণ তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে খবর জানাইলেন। পুরা দুইটি বছর অন্তে ছেলে বাড়ি আসিতেছে। ছুটি পায় নাই বলিয়া নহে, বরঞ্চ এতদিন ছুটি ছিল দিবা-রাত্রি চব্বিশ ঘণ্টাই। চাকরির উমেদারিতে এযাবৎ যত হাঁটাহাঁটি করিয়াছে, তাহার সমষ্টিতে বোধ করি পদব্রজে ভারতবর্ষ হইতে ল্যাপল্যাণ্ড অবধি পরিভ্রমণ সারা হইয়া যায়। যাহা হউক চাকরি জুটিয়াছে, ভালো চাকরি—এবং এই প্রথম ছুটি।

পাঁজি খুলিয়া নিবারণ মনোযোগসহকারে শনিবার তারিখটার গোড়া হইতে আগা অবধি পড়িয়া ফেলিলেন, একটা কিছু পূজাপার্বণ চোখে পড়িল না। ছুটিটা কিসের সাব্যস্ত হইল না। বুধবার ঈদের বন্ধ আছে বটে, চিঠির তারিখটা শনিবার কি বুধবার লিখিয়াছে—দৃষ্টি-বিভ্রম হইতে পারে, ভালো করিয়া আর একবার মিলাইয়া দেখিতে বালিশের নিচে হাত দিলেন, তারপর বিছানা উলটাইয়া ফেলিলেন, তবু চিঠি পাওয়া গেল না। যতদূর মনে পড়ে, বালিশের তলায় রাখা ছিল, তবে যায় কোথায়?

চিঠিটা তখন চলিয়া গিয়াছে উত্তরের ঘরে বাদামতলার দিককার জানালার কাছে। চোর চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে—চোর কিরণমালা। চার-পাঁচ লাইনের চিঠি, কিন্তু খুকির জ্বালায় কথা-কয়টা স্থির হইয়া পড়িবার জো আছে? থাবা দিয়া ধরিতে যায়। অবশেষে ননদ পটলীকে অনেক খোশামোদ করিয়া তাহার কোলে খুকিকে পাড়ায় পাঠাইয়া দিল। তারপর কিরণ এদিক-ওদিক তাকাইয়া আর একবার সবেমাত্র কাপড়ের ভিতর হইতে বাহির করিয়াছে, আবার বিপদ। শাশুড়ী আসিয়া ঢুকিলেন। কিরণ চিঠি ঢাকিয়া ফেলিল। শাশুড়ী সেকেলে মানুষ, অতশত দেখেন না, আসিয়াই বলিলেন—বৌমা, বিছানার চাদর, ওয়াড়-টোয়াড়গুলো খুলে দাও তো শিগগির—এখন ক্ষারে সেদ্ধ করে রাখি, ভোর থাকতে থাকতে কেচে দেব—কেমন?

বধূ সায় দিয়া বলিল—হ্যাঁ মা, কি রকম বিচ্ছিরি ময়লা হয়ে গেছে, দেখো না—

শাশুড়ী বলিলেন—খোকা বারোটার গাড়িতে যদি আসে···তার আগেই সব কেচে দেব। নোংরামি মোটে সে দুচক্ষে দেখতে পারে না। আর তোমাকেও বলে দিচ্ছি মা, এ রকম পাগলী মেয়ের মতো বেড়াতে পারবে না—কালকে সকাল-সকাল নেয়ে ফিটফাট থেকো। যে যেমন চায় তেমনি থাকতে হয়। শহরে-বাজারে থাকে, বোঝ না?

আনন্দে কিরণের বুকের ভিতরে কেমন করিতে লাগিল, হাসিও পাইল। খোকা—বুড়ো খোকা—অত বড় গোঁফওয়ালা ছেলে, এখনও মা কিনা খোকা বলিয়া ডাকেন!

এদিকে বাইরে নিবারণের গলা উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। ঘটনাটা এই—নটবর কামার বছর পাঁচ-সাত আগে একখানা বঁটি গড়াইয়া দিয়াছিল, তাহার দরুন এখনও তিন আনার পয়সা বাকি। উক্ত পয়সার তাগাদা করিতে আসিয়া এমনভাবে চাপিয়া ধরিয়াছে যে, তৃতীয় ব্যক্তি কেহ উপস্থিত থাকিলে নিশ্চয় মনে ভাবিত, ঐ তিন আনার পয়সা এখনই হাতে না পাইলে বেচারা সবংশে নির্ঘাত মারা যাইবে। কিন্তু নিবারণ বহুদর্শী ব্যক্তি, অপরে যে প্রকার ভাবুক—নটবরের জন্ম তাঁহার দুশ্চিন্তা হইল না। বলিলেন—রোসো, এইবারে ঠিক—আর একটা দিন মোটে—কাল সুধীর বাড়ি আসবে, কাল আর নয়, পরশু সকালের দিকে এসো একবার—পাই পয়সাটি অবধি হিসেব করে নিয়ে যেও। নাও কলকেটা ধরো—

বলিয়া হুঁকা হইতে নটবরের হাতে কলিকা নামাইয়া দিয়া আবার শুরু করিলেন—শোন নি নটবর, বল কি—শোন নি, কানে তুলো দিয়ে থাক না কি? আমার সুধীরের মস্ত বড় চাকরি হয়েছে, দেড়শ টাকা মাইনে—

কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া বলা নিবারণের অভ্যাস, এ গ্রামের সকলেই ইহা জানে। পাওনাদার এবং আত্মীয়স্বজন বহুবার নিবারণের মুখে শুনিয়াছে—চাকরি ঠিক হয়ে গেছে, এখন সাহেব বিলাত থেকে পৌছতে যা দেরি। এবারে আর ভুয়ো নয়, আসছে মাসের পয়লা থেকে নিশ্চয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহেব কখনও বিলাত হইতে আসিয়া পৌছে নাই এবং মাসের পর মাস অনেক পহেলাই কালসমুদ্রে তলাইয়া গিয়াছে। সুধীরের চাকরির কথা তাই লোকে বড় বিশ্বাস করে না। তবে এবারের কথা স্বতন্ত্র। দোকানে বসিয়া হাপর টানিতে টানিতে নটবরও যেন কাহার মুখে শুনিয়াছে, সুধীরের ভারি কপাল-জোর, ভালো চাকরি পাইয়াছে। এখন ঐ দেড়শ টাকার কথা যদি বাদ-সাদ দিয়া অন্তত

সত্যকার টাকা পঁচিশেও দাঁড়ায়, তবু নটবরের তিন আনা আদায় হইবার উপায় হইয়াছে। সে পুলকিত হইল।

নিবারণ পুত্রগর্বে স্ফীত হইয়া বলিতে লাগিলেন—সেদিন দাকোপার পাঁচু ঘোষের সঙ্গে দেখা—পিসি আর বৌকে নিয়ে কালীঘাট গিয়েছিল। সুধীর দেখতে পেয়ে এই টানাটানি—বাসায় না নিয়ে ছাড়লই না। পাঁচু বলে—দাদা, বলব কি—মস্ত তিনমহল বাড়ি ভাড়া করেছে, ঝি-চাকর যে কতগুলো গুনে ঠিক করতে পারলাম না। মাইনে দেড়শ আর উপরি—সকালে আপিসে যায় খালি পকেটে, সন্ধ্যাবেলা দু পকেট যেন ছিঁড়ে পড়ে। টাকার বোঝা নিয়ে হেঁটে আসতে পারবে কেন, গাড়ি করে ফিরতে হয়। দেখা হলে একবার পাঁচু ঘোষকে জিজ্ঞাসা করে দেখো।

নটবরের গা শির-শির করিয়া উঠিল—এই সেদিনের সুধীর, তাহার দোকানের সামনে দিয়া খালি পায়ে জেলেপাড়া হইতে মাছ লইয়া আসিত। বলিল—তা বেশ—বড্ড ভালো কথা, আর আপনার দুঃখ কি চৌধুরি মশাই, রাজ্যেশ্বর ছেলে—

নিবারণ বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—তোমরা পাঁচ জনে ভালো বললেই ভালো। পাঁচু যা বললে—বুঝলে—শুনে তাক লেগে যায়—পেত্যয় হয় না। রাজরাজড়ার কাণ্ডই বটে। শুনেছ বোধ হয়, এবার আমরা বাড়িসুদ্ধ কলকেতায় চলে যাচ্ছি, সুধীর আসছে সেই সব ঠিকঠাক করতে—

নিবারণ চুপিচুপি কথা বলিবার লোক নহেন, বিশেষত ছেলের এই সৌভাগ্যের কথা। ঘরের ভিতর হইতে কিরণ শুনিতে পাইল, সুধীর দেড়শ টাকার চাকরি পাইয়া রাজরাজড়ার কাণ্ড আরম্ভ করিয়াছে। কিরণ একবারও কলিকাতায় যায় নাই এবং সত্যকার রাজারা যে কি প্রকার কাণ্ড করিয়া থাকে তাহাও সঠিক আন্দাজ করিতে পারে না। গ্রামে শখের থিয়েটার আছে, অতএব রাজা সে অনেকবার দেখিয়াছে—গায়ে জরির ঝকমকে পোশাক, মাথায় মুকুট। সুধীরের মাথার উপর মুকুট বসাইয়া দিলে কি রকম দেখায় তাহাই সে সকৌতুকে কল্পনা করিতে লাগিল। নিবারণ সত্যবাদী যুধিষ্ঠির নয়, তাহা কিরণ জানে। তবু আজিকার কথাগুলি মিথ্যা বলিয়া ভাবিতে কিছুতেই প্রাণ চাহে না। অনেকবার অনেক আশা করিয়া শেষে সমস্ত মিথ্যা হইয়া গিয়াছে, এবারে মিথ্যা হইলে সে মরিয়া যাইবে। এইটুকু জীবনে সে অনেক দুঃখ পাইয়াছে, সে এক সাতকাণ্ড রামায়ণ। ছেলেবেলায় কিরণের মা মরিয়া গেলে বাবা আবার বিবাহ করেন। নূতন মা কিরণকে মোটে দেখিতে পারিত

না, এখন আর তাহাকে বাপের বাড়ি লইয়া যাইবার নামও কেহ করে না।… সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে, বাদাম গাছের ফাঁকে চাঁদ উঠিল। কিরণের মনে হইল যেন কোন অনির্দেশ্য স্থানে বসিয়া তাহার অনেক দিনের হারানো মা তাকাইয়া দেখিতেছেন এবং বড় খুশি হইয়াছেন যে সুধীর রাজা হইয়াছে, আর সে—তাঁহার সেই জন্মদুঃখিনী মেয়ে, এতকালের পর হইয়াছে রাজার পাটরানী! আয়না ও চুলের দড়ি পাড়িল, আবার ভাবিল—দূর হোক গে, চুল বাঁধব না আর আজ, বেলা একেবারে গেছে। রান্নাঘরে আসিয়া উনান ধরাইতে গিয়া ভাবিল—এত সকাল সকাল কিসের রান্না! ছেলেমানুষের মতো খিলখিল করিয়া হাসিতে ইচ্ছা করে, তাহার যেন কি হইয়াছে, তাহাকে ঠিক ভূতে ধরিয়াছে…

পটলি পাড়া বেড়াইয়া আসিয়া খুকিকে কিরণের কোলে ঝপ করিয়া ফেলিয়া দিল। তখনই ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়। কিরণ ডাকিল—ও পটলি, যাচ্ছিস কোথা? শোন—সুশীলাদির বাড়ি গেছলি? তার বর নাকি এসেছে—কলকেতায় বাসা করেছে, তাকে নিয়ে যাবে, সত্যি? পটলি দৃকপাত না করিয়া কোমরে আঁচল জড়াইয়া উঠানে কুমির-কুমির খেলিতে গেল।

উঠানে যেন ডাকাত পড়িয়াছে, পাড়ার ছেলেমেয়েদের কোলাহলে কান পাতা যায় না। পটলি হইয়াছে কুমির আর উত্তর ও পূর্ব ঘরের দাওয়া হইয়াছে ডাঙা। সেই ডাঙার উপর হইতে উঠানরূপ নদীতে সকলে যেই নাহিতে নামে, পটলি দৌড়াইয়া তাহাদের ধরিতে যায়। রান্নাঘর হইতে মেয়ে কোলে কিরণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল‥খুকির মোটে চারিটি দাঁত উঠিয়াছে, কিরণ খুকির গালের মধ্যে একবার একটা আঙুল দিয়াছে আর অমনি সে কামড়াইয়া ধরিল।

—ওরে রাক্কুসী ছাড় ছাড়—মরে গেলাম, ভারি যে দাঁতের দেমাক হয়েছে তোমার।

কিরণ হাত ছাড়াইয়া লইল। খুকি হাসিতে লাগিল। কিরণ খুকির দিকে তাকাইয়া মুখ নাড়িয়া বলে—অত হেসো না খুকি, অত হেসো না। সব মানিক পড়ে গেল, সব মুক্তো ঝরে গেল।…মেয়ে মোটে এইটুকু, বুদ্ধি কত—সব বোঝে, চৌকাঠ ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, আবার হাততালি দিয়া বলে—তা—তা—তা—

কিরণ বলিল—হাঁ করে হাবলার মতো দেখছ কি? ড্যাবডেবে চোখ মেলে একনজরে কি দেখছ আমার মানিক? খেলা দেখছ? তুমিও খেলো, বড় হও আগে। ঠাণ্ডা হয়ে বাবু হয়ে বোসো তো—এই যে দোলে—দোলে—

দোলন দোলন দুলুনি,
রাঙা মাথায় চিরুনি
বর আসবে যখনি
নিয়ে যাবে তখনি—

খুকি তালে তালে কেমন দোলে! কিরণ মেয়েকে মুখের উপর তুলিয়া কচি কচি নরম হাত-বুক-গাল চাপিয়া ধরিতে লাগিল। খুকির খুব আনন্দ হইয়াছে, মাথা নাড়ে আর টানিয়া টানিয়া বলে—বা-আ-আ—বা—বা। মেয়ে বাবাকে দেখে নাই, সুধীর বাড়ি হইতে যাইবার সময় কেবল মধুর সম্ভাবনার কথাটি জানিয়া গিয়াছিল। কিরণ ফিসফিস করিয়া বলিল—খুকি, দেখিস—দেখিস, কালকে বাবা আসবে—তোর খোকা বাবা—মার যেমন কাণ্ড, অত বড় ছেলে, এখনও খোকা—হি-হি। ছেলেমানুষের মতো হাসিতে লাগিল। তারপর চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল, কেহ কোনোখান হইতে শুনিতে পায় নাই তো? এমন সোনার চাঁদ তাহার কোলে আসিয়াছে—সুধীর তা জানে না, চোখে দেখে নাই, সুধীরের জন্য মনে করুণা হইল। আবার রাগ হইল—এই তো চিঠিপত্রে খবর পাইয়াছে, একবার কি এতদিনের মধ্যে মেয়েকে দেখিয়া যাইতেও ইচ্ছা করে না?

সেইদিন গভীর রাত্রে কিরণ বিছানায় শুইয়া আছে, ঘুম আর আসে না। মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছে, দু-তিনবার উঠিয়া মাটির কলসি হইতে জল গড়াইয়া মুখে চোখে দিল। এইবার ঠিক ঘুম আসিবে, চোখ বুজিয়া শুইল। বেড়ার ফাঁকে জ্যোৎস্না আসিয়া অনেকদিন আগেকার স্নেহস্পর্শের মতো সর্বাঙ্গ জড়াইয়া ধরিল। দুই বছর কম সময় নয়।...সুধীরকে গ্রামসুদ্ধ সকলে অকর্মণ্য ঠাওরাইয়াছিল, সেই সঙ্গে কিরণেরও দোষ পড়িয়াছিল, নাকি বরকে আঁচলছাড়া হইতে দেয় না। শাশুড়ী স্পষ্ট কিছু বলিতেন না, কিন্তু ওর চেয়ে মুখোমুখি হইলেই যে ভালো হইত। শেষাশেষি এমন হইয়াছিল, সুধীর বাড়ি হইতে বাহির হইলে সে বাঁচে। মুখ ফুটিয়া এ কথা বলিতে সাহস হইত না, কাহাকেও দোষ দিবার উপায় ছিল না, এক-এক সময়ে কিরণের মনে হইত -ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া ওঠে! যেদিন সুধীর রওনা হইল সেদিন সে খুশি হইয়াছিল, এখন সে-সব কথা ভাবিলে বড় কষ্ট হয়। আর লোকটিরও এমন ধনুক-ভাঙা পণ—চাকরি নাই-বা হইল, এতদিনের মধ্যে একবার বাড়ি আসিয়া গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত নাকি? কিন্তু সে দুঃখের দিন

কাটিয়াছে, সুধীর হইয়াছে রাজা, কাজেই কিরণ রাজরানী—কাল সে বাড়ি আসিবে। কাল এতক্ষণ—

আগামী কাল এতক্ষণ যে কি হইতেছে চক্ষু বুজিয়া সে সেই মনোরম ভাবনা ভাবিতে লাগিল।

ঘরে ঢুকিয়া হয়তো দেখিবে ক্লান্ত সুধীর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, জলের গ্লাসটা খুঁজিতে খুঁজিতে হেরিকেন তুলিয়া কিরণ দেখিয়া লইবে। আলোটা মুখের কাছ দিয়া বার বার ঘুরাইবে, তবু চক্ষু খুলিবে না। পা ধুইয়া জলের ঘটি ঠনাত করিয়া তক্তপোশের নিচে রাখিবে, সজোরে দোরে খিল দিবে, তারপর খুকির মাথাটা বালিশের উপর সাবধানে তুলিয়া দিয়া মশারি গুঁজিতেছে—

সুধীর আলগোছে একখানা হাত বাড়াইয়া খপ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে।

আসলে সুধীর ঘুমায় নাই, ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়া ছিল, কিংবা ঘুমাইলেও ইতিমধ্যে কখন জাগিয়াছে, আগে সাড়া দেয় নাই।

কিরণ বলিবে—বড্ড গরম, চল—দাওয়ায় বসিগে। কেমন ফুটফুটে জ্যোৎস্না দেখেছ?

সুধীর হাসিয়া বলিবে—ভয় করবে না? বাদামগাছে এক পা আর তাল গাছে এক পা—ঐ যে মস্ত একটা কি দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছ?

কিরণ বড় ভীতু। বিয়ের কিছুদিন পরে একদিন রাত্রিতে সে রাগ করিয়াছিল, তারপরে সুধীর ভূতের ভয় দেখাইয়া তাহাকে এমন বিপদে ফেলিয়াছিল সে কথা ভাবিলে হাসি পায়। সে সময়ে কি বোকাই না ছিল!

কিরণ বলিবে—ভয় দেখাচ্ছ, আমায় কচি খুকি পেয়েছ নাকি?

তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ আসিবে—কক্ষনো না, কচি খুকি ভাবব—সর্বনাশ! কুড়ি পেরুল, বুড়ি হতে আর বাকি কি?

—এখন আমার মোটেই ভয় করে না—কি দেবে বল, একলা-একলা এখনি খালের ঘাটে চলে যাচ্ছি। তারপর কিরণ হঠাৎ আর-এক কথা জিজ্ঞাসা করিবে—কলকাতায় যে বাসা করেছ, সে নাকি তিনতলা? ছাত থেকে কেল্লা দেখা যায়? গড়ের মাঠ কতদূর? সুশীলার বর যেখানে বাসা করেছে সে বাড়ি চেন? তুমি আপিসে গেলে আমি দুপুরবেলা খুকিকে নিয়ে সুশীলাদের বাসায় বেড়াতে যাব কিন্তু—

অথবা এরূপও হইতে পারে। হয়তো কাজকর্ম সারিয়া মেয়ে কোলে কিরণ যখন আসিয়া ঢুকিবে, তখন সুধীর শিয়রে আলো রাখিয়া নভেল পড়িতেছে। নভেল পড়া তো ছাই—কিরণকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বই রাখিয়া

দিবে, তারপর হাত ধরিয়া বসাইবে। বলিবে—এত দেরি হল? ভালো আছ তো? কই, মেয়ে দেখাও—দেখি—দেখি—

দেখাইবে না তো, মেয়ের মুখ কিরণ কিছুতে দেখাইবে না। কেন, এই যে এত চিঠিপত্র দাও—মেয়ের কথা ভুলিয়াও একবার লিখিয়া থাক? মেয়ে কি গাঙের জলে ভাসিয়া আসিয়াছে—মেয়ের বুঝি মান নাই!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখাইতে হইবে। সুধীর পকেট হাতড়াইবে। ও মা, একছড়া খাসা হার চিকচিক করিতেছে, অতবড় হার ঐটুকু মেয়ের জন্তে! মজা দেখো না, চারটে দাঁত উঠেছে—তিন দিনের ভেতর দস্যি মেয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে চেপটা করে দেবে।

বাপ নিজের হাতে মেয়ের গলায় হার পরাইয়া দিবে। কিরণ বলিবে—রাত্তিরটা গলায় থাকুক, কাল সকালে কিন্তু মনে করে হার খুলে নিও—ফের নীল কাগজে মুড়ে ভালোমানুষের মতো মার হাতে নিয়ে দিও। হ্যাঁগা, তাই করতে হয়—মাকে বোলো, মা এই তোমার নাতনীর হার নাও—মা খুশি হয়ে খুকির গলায় পরিয়ে দেবেন, সে কেমন হবে বল তো?

ঘুমন্ত মেয়ে ন্যাকড়ার মতো বাপের বুকে লাগিয়া থাকিবে। সুধীর বলিবে—ইঃ, একেবারে যে তোমার মতো হয়েছে—চোখদুটো, গায়ের রঙ, পায়ের গড়ন, একচুল তফাত নেই—

সুখের হাসি হাসিয়া কিরণ বলিবে—কিন্তু নাকটা যে বাপের। বিয়ের সময় ঐ বোঁচা নাকের দাম ধরে দিতে হবে হাজার টাকা।

নাকের উচ্চতা কি পরিমাণ হইলে ঠিক মানানসই হয়, তাহার তর্ক উঠিবে—সে-ই তাহাদের পুরাতন তর্ক।

জ্যোৎস্নাময় চৈত্র রাত্রির স্নিগ্ধ বাতাসে ঘরকানাচে বাদামগাছের পত্রমর্মর ·· ঘুমের ঘোরে খুকির ছোট্ট বুকখানা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। বাহির-বাড়ির ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপের ফাটলে তক্ষক ডাকে, চারিদিকের অতল নিষুপ্তির মধ্যে কিছু সময় অন্তর তাহার রব শোনা যায়—কটর্‌র্‌র্ তক্ষ তক্ষ!··· বিবাহের পরবর্তী স্বপ্নস্মৃতির টুকরা টুকরা আগামী দিনের মধুর কল্পনার সহিত মিলিয়া সেই রাত্রে একটি নিদ্রাহারা বিমুগ্ধ গ্রামবধূর মনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সকালে রোদ না উঠিতেই ননদ-ভাজে খালের ঘাটে গিয়া বাসনের বোঝা নামাইল। বাসন মাজা তো উপলক্ষ, কেবল গল্প আর গল্প—এমনি করিয়া উহারা রোজ এক প্রহর বেলা কাটাইয়া আসে। স্টেশন হইতে সাঁকো পার হইয়া গ্রামে আসিতে হয়। কিরণ সাঁকো পিছন করিয়া বাসন মাজিতেছিল,

হঠাৎ পটলি চেঁচাইয়া উঠিল · ও মা, এত সকালে এসে পড়ল? তাড়াতাড়ি এঁটো হাতেই কিরণ ঘোমটা টানিল। পটলি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—ও বৌদি, কলাবৌ সাজলি কেন? আমি কার কথা বললাম? আসছে আমাদের মুংলি গাইটা।

মুংলি গোরু আসিতেছিল ঠিক, কিন্তু পটলি যে ভঙ্গি করিয়া বলিয়াছিল, সেটা মুংলির সম্পর্কে নিশ্চয় নয়। পোড়ারমুখী মেয়ে এই বয়সে এমন পাকা হইয়াছে!

কিরণ বলিল—তাই বই কি! তুমি বড্ড ইয়ে হয়েছ, গুরুজনের সঙ্গে ঠাট্টা—তোমায় দেখাচ্ছি—বলিয়া বড় রাগিয়া শাসন করিতে গিয়া পারিল না, শাসন করিবে, না হাসি চাপিবে?

এদিকে নিবারণ ভারি ব্যস্ত। উঠিয়া আগে বেড়ার গায়ে ছাতিমগাছের কয়েকটা ডাল ছাঁটিয়া দিলেন, পথটা যেন আঁধার করিয়া ফেলিয়াছিল। তারপর নিশি গাঙ্গুলির বাড়ি গিয়া বলিলেন—একটা টাকা হাওলাত দিতে পার গাঙ্গুলি? কালকে নিও—

গাঙ্গুলী নিরাপত্তিতে টাকা বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন—সুধীর বাবাজি আজ আসছেন বুঝি! বাজারে যাচ্ছ? সাজা তামাকটা খেয়ে যাও, বেলা হয় নি। আর আমার কথাটা মনে আছে তো?

নিশি গাঙ্গুলির কথাটা হইতেছে, সুধীরকে বলিয়া তাহার আপিসে বা অন্য কোথাও মেজ ছেলে হেমন্তর একটা চাকরি করিয়া দিতে হইবে। তামাক খাইয়া এবং গাঙ্গুলিকে বিশেষ প্রকারে আশ্বাস দিয়া নিবারণ উঠিলেন।

বাজারে মাছ কিনিতে গিয়া বিষম বিভ্রাট। চারিটা সরপুঁটি আসিয়াছে, তাহার ন্যায্য দর চার আনার বেশি এক আধেলাও নয়। নিতান্ত গরজ বলিয়া পাঁচ আনা অবধি দর দিয়া নিবারণ ঘণ্টাখানেক ধন্না দিয়া বসিয়া আছেন। মাঝে মাঝে খোশামোদ চলিতেছে—ও পাড়ুয়ের পো, তুলে দে—অন্যেজ্য দর হয় নি। ছেলে বাড়ি আসবে, বড় চাকরে—আমাদের মতো কচুঘেচু দিয়ে খাওয়া তো অভ্যেস নেই! দে বাবা তুলে দে—। কিন্তু পাড়ুয়ের পুত্র কিছুতেই ভিজিতেছিল না। এমন সময় অক্রূর মোড়ল আট-আনা বলিয়া ধাঁ করিয়া মাছ ক-টা লইল।

নিবারণ একেবারে মারমুখী। অক্রুরও ছাড়িবে কেন—গতকল্য মন দশেক গুড় বেচিয়াছে, গুড়ের দর যাহাই হউক, একসঙ্গে অতগুলি টাকা গাঁটে থাকায় তাহার মেজাজ ভিন্ন প্রকার।

গ্রামের জনকয়েক নিবারণকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া হাত ধরিয়া ভিড়ের ভিতর হইতে সরাইয়া লইয়া গেল। কিন্তু নিবারণের রাগ মিটে নাই—ছোটলোকের এত আস্পর্ধা—আসুক সুধীর, দেখা যাইবে কত ধানে কত চাল!

সুধীর যখন পৌঁছিল তখন বিকাল হইয়া গিয়াছে। আজ আর আসিল না সাব্যস্ত করিয়া বাড়িসুদ্ধ সকলের খাওয়া দাওয়া সারা হইয়াছে, কিরণ এইবার চারিটা মুখে দিবে। কি মনে করিয়া ও ঘরে যাইতেছিল, এমন সময় দেখিল সাঁকোর উপর একটা ছাতি, শেষে আরও ভালো করিয়া দেখিল। তারপরে রান্নাঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

সুধীর আসিয়া ডাকিল- মা, ও মা, কোথায় সব?

সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতেছে, টিনের একটি সুটকেস স্টেশন হইতে নিজেই বহিয়া আনিয়াছে, কলিকাতার বাসায় যে অগুন্তি চাকর-বাকর তাহার একটাও সঙ্গে আনে নাই।

মা আসিয়া পাখা করিতে লাগিলেন। পটলি খুকিকে কোলে লইয়া সামনে দাঁড়াইল। সুধীরকে এক নজর চাহিয়া দেখিলেন, চেহারা মলিন রুক্ষ—সে শ্রী নাই, হয়তো চাকরির খাটুনিতে, তার উপর পথের কষ্ট।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া একটু জিরাইবারও অবকাশ হইল না, ইতমধ্যে গ্রামের হিতাকাঙ্ক্ষীরা আসিয়াছেন। শ্রীদাম মল্লিক সকলের চেয়ে প্রবীণ, সুধীর সর্বাগ্রে তাঁহার পায়ের ধুলা লইল। মল্লিক মহাশয় বলিলেন—শুনলাম সব কথা নিবারণের কাছে, শুনে যে কি আনন্দ হল! এখন বেঁচেবর্তে থাকো, অখণ্ড পরমাই হোক। বুড়ো বাপমাকে এইবারই নিয়ে যাচ্ছ তো? নিয়ে যাবে বই কি! গঙ্গায় চান করবে, হরিনাম করবে, এর চেয়ে আর ভাগ্যির কথা কি! আমাদের পোড়া কপাল—আমরাই পড়ে রইলাম পচা ডোবায়। বলিয়া একটি নিশ্বাস ফেলিলেন।

ভগবতী আচার্য কিঞ্চিৎ হস্তরেখাদি বিচার ও ফলিত-জ্যোতিষের চর্চা করিয়া থাকেন। বলিলেন—বলেছিলাম কিনা নিবারণ-দা, বৃহস্পতি তুঙ্গী—তোমার সুধীর রাজা হবে। ঊর্ধ্বরেখা আঙুলের গোড়া অবধি চলে এসেছে—বলি নি?

নিবারণের সে কথা মনে পড়ে না, কিন্তু ঘাড় নাড়িলেন।

নিশি গাঙ্গুলিও আসিয়াছিলেন। বলিলেন—বাবাজি, 'আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যের পর একবার অবিশ্যি করে যেও—তোমার খুড়িমা ডেকেছেন।

অমনি ড্রামাটিক ক্লাবের ছেলেরা সমস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিল—

সে কি করে হবে? সন্ধ্যের পর সুধীরবাবু আমাদের রিহার্শাল দেখতে যাবেন যে। ওঁকেই এবার ক্লাবের সেক্রেটারি করা হবে—কালকে আমরা মিটিং করব।

সুধীর সন্ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—সেক্রেটারি আমাকে কেন? আমাকে বাদ দাও, আমি থিয়েটারের কিছু বুঝি নে।

দলের একজন বলিল—তাতে কি হয়েছে, আমরাই সব বুঝিয়ে-টুঝিয়ে দেব। এই ধরুন, আপাতত উদ্যান দুর্গ আর অন্তঃপুর-সংলগ্ন প্রাসাদ এই তিনটে সিন, গোটা পাঁচেক চুল-দাড়ি, দুটো রয়াল ড্রেস আর একটা হারমোনিয়ম কিনে দেবেন—ব্যস। আমাদের নারদ যে কি চমৎকার গান গায় শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। কিন্তু দুঃখের কথা কি বলব, জুতসই একটা দাড়ির অভাবে অমন প্লেটা নামাতে পারছি নে।

গাঙ্গুলি পুনশ্চ বলিলেন—যেমন করে হোক একবার যেতেই হবে বাবাজি, নইলে তোমার খুড়িমা ভারি কষ্ট পাবে। সারাদিন বসে বসে চন্দোরপুলি বানিয়েছে। আমি হেমন্তকে পাঠিয়ে দেব, সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

অনেকের অনেকপ্রকার আবেদন, সুধীর উঠিল। জামা গায়ে দিবার জন্য ঘরে ঢুকিয়া দেখে, সেখানে মাত্র একটি প্রাণী—একলা কিরণ চুল বাঁধিতেছে। কিরণের বুকের ভিতর টিপটিপ করিতে লাগিল, যে দুষ্ট এই সুধীর!···কিন্তু তাহার সে দুষ্টামি আর নাই তো! শান্ত ভাবে জামাটা পাড়িয়া গায়ে দিল, একটা মুখের কথাও জিজ্ঞাসা করিল না।

ভাবখানা এমন যেন তাহারা দুটিতে বরাবর বারো মাস একসঙ্গে ঘর-গৃহস্থালি করিয়া আসিতেছে।

পটলি খুকিকে আনিয়া বলিল—দাদা, একবার কোলে নাও না। দেখো, তোমায় দেখে কেমন করছে।

সুধীর দাঁড়াইল, একবার হাসিয়া মেয়ের দিকে তাকাইল, তারপর কহিল—এখন বড় ব্যস্ত রে। সব দাঁড়িয়ে রয়েছেন—থাকগে এখন।

ড্রামাটিক ক্লাবের যতগুলি লোক—কেহই কলিকাতাবাসী ভাবী-সেক্রেটারির সম্মুখে গুণপনার পরিচয় দিতে ত্রুটি করিল না। ফলে রিহার্শাল যখন থামিল, তখন চাঁদ মাথার উপরে। নারদ যাইবার মুখেও একবার দাড়ির তাগাদা দিল। সুধীর বলিল—ব্যস্ত হবেন না, কালকের মিটিঙে একটা এষ্টিমেট ঠিক হবে।

দু-তিনজন আসিয়া সুধীরকে বাড়ি অবধি পৌঁছাইয়া দিয়া গেল।

দোরে খিল আঁটা, একটা জানালা খোলা ছিল। সুধীর দেখিল—মিটমিট

করিয়া হেরিকেন জ্বলিতেছে, থালায় ও বাটিতে ভাত-ব্যঞ্জন ঢাকা দেওয়া এবং ঠিক তাহার পাশেই মাটির মেঝেয় কিরণ ঘুমাইয়া আছে। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া অবশেষে বেচারি ওখানেই শুইয়া পড়িয়াছে। মনটা কেমন করিয়া উঠিল, ডাকিল—কিরণ, ও কিরণ—

ছু-বছর আগেকার সেই ডাক একেবারে ভুলিয়া যায় নাই তো!

কিরণ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দোর খুলিয়া দিল। সুধীর বলিল—তাড়াতাড়ি করছ কেন, বোসোই না। ভাতের দরকার নেই, গাঙ্গুলি-গিন্নির যা কাণ্ড—তিন দিন না খেলেও ক্ষতি হবে না।

কিরণ মৃদু হাসিয়া বলিল– তিন দিন থাকছ তো? বাবাকে আজ আসবার জন্যে লিখে দিলাম, পত্তোর পেয়ে মঙ্গলবার নাগাদ ঠিক এসে পড়বেন—এ তিনটে দিন থাকতে হবে কিন্তু।

সুধীর বলিল—মোটে তিন দিন? এরি মধ্যে তাড়াতে চাও, ভারি নিষ্ঠুর তো তুমি! তিন মাসের কম নড়ছি নে—দেখে নিও।

—আচ্ছা, আচ্ছা--দেখব।

কিরণ মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

—আর বড়াই কোরো না, মায়া-দয়া সব বোঝা গেছে। আমরা না-হয় পর, নিজের মেয়েকেও কি একটিবার চোখের দেখা দেখতে ইচ্ছা করে না?

সুধীর বলিল—সে কথা তো বলবেই কিরণ, তার সাক্ষী ভগবান। তারপর মুখখানা অতিশয় ম্লান করিয়া কহিতে লাগিল—শরীরের কি হাল হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ তো? ছু বছর যা কেটেছে, অতিবড় শত্তুরের তেমন না-হয়! জায়গা না পেয়ে একরকম রাস্তার ফুটপাথে শুয়ে কাটিয়েছি—এক পয়সার মুড়ি খেয়ে দিন কেটেছে, কদিন তাও জোটে নি। ভাগ্যিস রাস্তার কলের জলে পয়সা লাগে না!

কিরণের চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি বলিল—থাকগে, তুমি থামো। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—যে ছুঃখ কপালে লেখা ছিল, তা যাবে কোথায়? সে ছাইভস্ম ভেবে আর কি হবে বলো।

ছুজনে স্তব্ধ হইয়া রহিল। ঘুমন্ত মেয়ের দিকে তাকাইয়া আবার কিরণের মুখে হাসি ফুটিল।

—ওগো, তুমি খুকিকে দেখলে না? এমন দুষ্টু হয়েছে—ঐটুকু মেয়ে, হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি।

সুধীর কহিল—দেখব না কেন? দেখছি তো।

কিরণ যেন কত বড় গিন্নি, তেমনি সুরে কহিল—ও আমার কপাল, ঐ

রকম দেখলে হয় নাকি? মেয়ে আমার সঙ্গে কত দুঃখ করছিল—বাবা আমায় কোলে নিল না, আদর করল না···তুমি খুকিকে একটা সরু হার গড়িয়ে দিও—নির্মলা দিদির মেয়েকে দিয়েছে, খাসা দেখায়।

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল—মেয়ে কথা বলতে শিখেছে নাকি?

—বলে না? সব কথা বলে, সে কি আর তোমরা বুঝতে পার? বলিয়া হাসিতে লাগিল। তারপর আবার শুরু করিল—সেদিন বলছিল, বাবাকে একখানা ঠেলা-গাড়ি কিনে দিতে বোলো- তাই চড়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খাব।

সুধীর হাসিল, বলিল—বটে, আবার গড়ের মাঠের শখ হয়েছে?

—কেন অন্যায়টা কিসের? খালি খালি চুপটি করে বাসায় বসে থাকবে বুঝি! তুমি ভাব, আমরা কিছু জানি নে। আমাকে না লিখলে কি হয়, শ্বশুরঠাকুর সব রাষ্ট্র করে দিয়েছেন।

—কি শুনেছ বলো তো?

—মস্তবড় বাড়ি ভাড়া করেছ, আমাদের সবাইকে নিয়ে যাচ্ছ—কোনটা শুনি নি? তাই তাড়াতাড়ি বাবাকে আসবার জন্য চিঠি দিলাম, যাবার আগে একটিবার দেখা করে যাই—কতদিন দেখা হবে না।

সুধীরের মুখ অত্যন্ত বিবর্ণ হইয়া গেল। বলিল—এ সব মিছে কথা কিরণ।

—কি মিছে কথা?

—এই বাসা করার কথা-টতা। মতলব করেছিলাম বটে, কিন্তু সে সব আর হবে না।

কিরণ বলিল—কেন হবে না—আলবত হবে। মাইনে-খাওয়া লোকে কখনও যত্ন করে? তোমার শরীরের দশা দেখে যে কান্না পায়! আমি তোমাকে কখনো একলা ছেড়ে দেব না।

—কিন্তু খরচ চালাব কোত্থেকে?

—ও! বলিয়া কিরণ গম্ভীর হইল।

—কথা বলো না যে!

কিরণ কহিল—আমার খরচ বড্ড বেশি, আমায় নিয়ে কাজ নেই। বেশ তো, যাকে নিয়ে যাও। আমি যাব না, কক্ষনো তোমার বাসায় যাব না এই বলে দিলাম।

বলিয়া জানলা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইল।

সুধীর বলিল—রাগ হল? কতদিন বাদে এসেছি, আর এই রকম কষ্ট দিচ্ছ?

—আমি কষ্ট দিই, আর তো কেউ কাউকে কষ্ট দেয় না, সেই ভালো। বলিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিল— দু-বছরের মধ্যে ক-খানা চিঠি দিয়েছ? দশখানা কি এগারোখানা। সব বেঁধে ঐ বাক্সর মধ্যে রেখে দিইছি। বিকেল-বেলা এসেছ, তখন থেকেই ভাব দেখছি। বুঝি—বুঝি—সব বুঝি!

কিরণ চোখ মুছিল।

সুধীর বলিল—বললে তো বিশ্বেস করবে না, আমি কি করব?

—কি আর করবে—তিনমহল বাড়ির ভাড়া জোটে, চাকর-বাকরের মাইনে জোটে, কেবল···থাকগে!

বলিতে বলিতে কিরণ চুপ করিল।

—তিনমহল বাড়ি ভাড়া করেছি আমি?

কিরণ বলিল—হ্যাঁগো, আমি সব জানি। তিনমহল বাড়ি ভাড়া করেছ, দেড়শ টাকা মাইনে পাচ্ছ—লুকচ্ছ কেন?

সুধীর বলিল—না, লুকব না—আর কি জান বলো তো?

—মাইনে ছাড়া উপরি পাও, রোজ টাকায় আর নোটে পকেট ভর্তি হয়ে যায়। বলো—ঠিক কি না?

সুধীর বলিল—ঠিক।

—ঢাকছিলে যে বড়!

সুধীর হাসিল।

বলিল—দেখছিলাম, তোমরা কে কি রকম দরদী—অভাবের কথা শুনে কে কি বল। বাসা ভাড়া হয়ে গেছে কিরণ, নিয়ে যাব না তো কি! তোমাদের সব্বাইকে নিয়ে যাব।

কিরণ রুখিয়া বলিল—আমি যাব না, কক্ষনো যাব না—বলেছি তো। খুকিকে কোলে নিলে না, বিকেল থেকে একটিবার হাসছ না, দুঃখটা কিসের শুনি? টাকাকড়ি হয়েছে—ছাই টাকা, আমরা তোমার টাকা চাই নে।

তখনও ম্লান হাসি ঠোঁটের উপর ছিল। সুধীর বলিল—এই যে কত হাসছি, দেখছ না? এত ঝগড়াও করতে পার তুমি, তোমার ও-স্বভাবটা আর বদলাল না!

—তোমার স্বভাব বদলেছে, সেই ভালো।

বধূর হাত ধরিয়া টানিয়া সুধীর বলিল—সত্যি, আর রাগারাগি নয়। আজকে সারাদিন বড় কষ্ট গিয়েছে।

কিরণ বলিল—তবু তো এক দণ্ড জিরোন নেই এতখানি রাত অবধি।

—কি করব বলো? গাঙ্গুলিমশায় নাছোড়বান্দা—ছেলের চাকরি করে দিতে হবে। বলে এলাম, হেমন্তকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় যাব। কেশব ঘোষ, রাম মিত্তির, তারক চক্কোত্তি, সকলের চার সনের খাজনা বাকি—তার কড়াক্রান্তি হিসেব হয়ে গেল—কাল সকালে সব আসবেন—মিটিয়ে দিতে হবে। শ্রীদাম মল্লিক মশাই আপ্যায়ন করে বসিয়ে ঠিকানা টুকে নিলেন, গঙ্গাস্নানের যোগে সপরিবারে আমার বাসায় পায়ের ধুলো দেবেন। ক্লাবের ছেলেরা কাল মিটিং করবে, তাদের সিন ড্রেসের এষ্টিমেট হবে। বড়লোকের হাঙ্গামা কত! সবারই গরজ বেশি, কেউ ছাড়েন না, অব্যাহতি কোথায়?

এই সব বাজে কথা শুনিতে কিরণের মন চাহিতেছিল না।

—বেশ করেছ—বড় কাজ করেছ। বলিয়া হঠাৎ ঘুমন্ত মেয়েকে বিছানা হইতে টানিয়া তুলিয়া হাসিতে হাসিতে হুকুমের সুরে বলিল—মেয়ে কোলে নাও—তোমার মতো মোটেই নয়, দেখো তো কেমন। নাও।

সুধীর কিন্তু উৎসাহ প্রকাশ করিল না। বলিল—আবার জেগে উঠে এক্ষুনি কান্নাকাটি শুরু করবে। এ-সব কাল হবে। ভারি ঘুম পাচ্ছে, আমি এখন শুই।

ঠিক তাহার ঘণ্টা দুই পরে সুধীর খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। হেরিকেনের জোর কমানো ছিল, উস্কাইয়া দিয়া দেখিল—মেয়ের পাশে কিরণ বিভোর হইয়া ঘুমাইতেছে। একখানা চিঠি লিখিল :

কিরণ, আমার সম্বন্ধে কিছু ভুল শুনিয়াছিলে। চাকরি পাইয়াছিলাম, তবে মাহিনা দেড়শ নয়—চল্লিশ টাকা। বাসা ভাড়া করিয়াছিলাম—উহা তিনতলা নয়, পাকা মেঝে, চাঁচের বেড়া, টিনের ঘর। কিন্তু বাজার মন্দা বলিয়া আজ সাত দিন চাকরির জবাব হইয়াছে। তোমাদিগকে লইয়া একসঙ্গে থাকিব এই আশায় বাসা ভাড়া করিয়াছিলাম, কিন্তু যে অর্ধেক ভাড়া অগ্রিম দিতে হইয়াছিল সেইটাই লোকসান। দু-বছর যে কষ্টে গিয়াছে তাহা ভগবান জানেন। শহরে বসিয়া আর উঞ্ছবৃত্তি করিতে পারি না, তাই দু-দিন জিরাইতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু তোমরা এবং গ্রামসুদ্ধ সকল ইতর-ভদ্রে চক্রান্ত করিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিলে। আজ দিনরাত্রির মধ্যে আমার অবস্থা মুখ ফুটিয়া কাহারও কাছে বলিতে পারিলাম না, তাই চিঠি রাখিয়া পলাইলাম।

এই মাসের মাহিনার মধ্যে হোটেল-খরচ, বাসা-ভাড়া, আপিস-

দারোয়ানের দেনা এবং বাড়ি আসিবার ট্রেন-ভাড়া বাদে সম্প্রতি হাতে এগার টাকা বার আনা আছে। চিঠির সঙ্গে একখানা দশ টাকার নোট গাঁথিয়া রাখিয়া যাইতেছি। উহা হইতে খুকির জন্ত গিনি সোনার হার, কেশব প্রভৃতির খাজনা শোধ, ড্রামাটিক ক্লাবের সিন-ড্রেস, গাঙ্গুলি-পুত্রের কলিকাতার রাহা খরচ এবং বাবা ও তোমার যদি অপর কোনো সাধ-বাসনা থাকে, সমাধা করিও। আমার জন্ত চিন্তা নাই—নগদ সাত সিকা লইয়া রওনা হইলাম।

বা ঘ

বনকাপাসি গ্রামে এ রকম অত্যাশ্চর্য ব্যাপার কোনো দিন ঘটে নাই।

সকালবেলা তিনকড়ি বাঁড়ুজ্জে মহাশয় গাড়ু হাতে বাঁশবাগানের মধ্যে যাইতেছিলেন, এমন সময় যেন কেঁদো-বাঘ ডাকিয়া উঠিল। বাঁড়ুজ্জে গাড়ু ফেলিয়া তিন লাফে বাগান পার হইয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। ডাকটা কোন দিক হইতে আসিল তাহা সঠিক সাব্যস্ত করিতে পারিলেন না। কোন দিকে যে চূড়ান্ত নিরাপদ জায়গা তাহা নিরূপণ করিবার জন্ত এদিক-ওদিক তাকাইতেছেন, এমন সময় দেখা গেল জাল কাঁধে ছিদাম মালো উত্তর-মুখো বিলের দিকে চলিয়াছে।

—শুনিস নি ছিদাম ?

ছিদাম কিছু শুনিতে পায় নাই।

—শেষকালে দিনমানেও কেঁদো ডাকতে আরম্ভ করল! বিলকোলাচে পাতিবনের দিকটায়—

কথার মাঝখানেই পুনরায় বাঘের ডাক এবং যেন আরও একটু নিকটে।

ছিদামের মাছ ধরা হইল না, ফিরিল—পাগুলি একটু ঘন ঘন ফেলিয়াই। বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের বয়স হইয়াছে এবং বাতের দোষ আছে, তিনি তো দৌড়াইতে পারেন না—

কোনো গতিকে মিত্তিরদের চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকে উঠিয়া দেখিলেন, এক পাশে পাইক নিমাই হুঁকা শোধন করিতেছে এবং ভিতরে মিত্তিরের সেজ ছেলে বুধো তারক চক্কোত্তির সঙ্গে দাবা খেলিতেছে। বাঁড়ুজ্জে বাঘের বিবরণ আদ্যোপান্ত বলিলেন। তিন জনেই জোয়ান। বুধো এক দৌড়ে বাড়ির

ভিতর হইতে সড়কি বাহির করিয়া আনিল, নিমাই পাইক লইল তাহার পাঁচহাতি লাঠি, এবং হাতের কাছে জুতসই আর কোনো অস্ত্র না দেখিয়া তারক চক্কোত্তি একটানে একটা জিওলের বড় ডাল ভাঙিয়া কাঁধে করিল।...

তিন বীরপুরুষ বাহির হইয়া পড়িল—আগে তারক, মাঝে বুধো, শেষে নিমাই।

ঐ—ঐ—আবার বাঘ ডাকে।

একেবারে পাড়ার মধ্যে! দীঘির পাড়ে কিংবা হলুদভুঁইয়ের মধ্যে। সর্বনাশ—দিন দুপুরে হইল কি! তারক পিছাইয়া পড়িল। মাত্র জিওলের ডাল সম্বল করিয়া গোঁয়াতুর্মিটা কিছু নয়। নিমাই কহিল—ফেরা যাক সেজ কর্তা, পাড়ার সবাইকে ডেকে আনি।

বুধো তাড়া দিয়া উঠিল। কিন্তু আর আগাইল না, সড়কিটা শক্ত করিয়া ধরিয়া সন্তর্পণে সেখানে দাঁড়াইল।

ঐ—ফের।

একেবারে আসিয়া পড়িয়াছে। আমবাগানের আড়ালে—দশ হাতও হইবে না। বাবা রে! তারক ও নিমাই দৌড় দিল। বুধো একা একা কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না, এমন সময়ে মোড় ঘুরিয়া সামনে আসিয়া পড়িল—

বাঘ নয়, দুজন মানুষ!

একজনের মাথার উপরে চৌকা লালচে রঙের কাঠের ছোট বাক্স, বাক্সর উপর গামছায় বাঁধা পুঁটুলি। অপরের বাঁ হাতে হুঁকা, ডান হাতে অবিকল ধুতুরাফুলের মতো গড়নের বৃহদাকার একটি চোঙা। সেই চোঙা এক-একবার মুখে লাগাইয়া শব্দ করিতেছে, আর যেন সত্যকার বাঘের আওয়াজ হইতেছে।

বুধো লোক দুইটিকে সঙ্গে লইয়া বাহিরের উঠানে দাঁড়াইল।

বাঁড়ুজ্জে তখনও সেখানে ছিলেন। ইতিমধ্যে গ্রামের আরও দু-চারজন জুটিয়াছে। বাঘের গল্প হইতেছে—পাঠশালায় পড়িবার সময় একবার বাঁশের বাড়ি দিয়া ঘনশ্যাম মিত্তির একটা গোবাঘার সামনের দাঁত ভাঙিয়া দিয়াছিলেন—সেই সব অনেককালের কথা। গল্প ভালো জমিয়াছে, এমন সময় উহারা আসিল।

—কি আছে তোমার ওতে?

—গ্রামোফোন—গান আছে, একটো আছে, সাহেব-মেমের হাসি—একেবারে যেন ঠিক সত্যি, ছাদ ফেটে যাবে মশাই।

বাঁড়ুজ্জে বলিলেন—তুমি আর নতুন কি শোনাবে বাপু! আমাদের এই

গাঁয়ে যাত্রা বল, আর ঢপ-কবি-বৈঠকি বল, কোনো কিছু বাকি নেই। গেলবারেও ঠাকুরবাড়ি যাত্রা হয়ে গেল—নীলকণ্ঠ দাসের দল। নীলকণ্ঠ দাসের নাম শোন নি—হাকোবার নীলকণ্ঠ ?

রাম মিত্তির বলিলেন—সাহেব-মেম তো ইংরাজিতে হাসে। ও ইংরাজি-মিংরাজি আমরা কেউ বুঝতে পারব না। তবে গান-একটো—তা তুমি কি একলাই সব কর ? কিসের দল বললে তোমার ?

চোঙা হাতে লোকটি বলিল—গ্রামোফোন—কলের গান। আমি কিছু করব না মশাই, সব এই কল দিয়ে করাব। বলিয়া সে সঙ্গীর মাথার বাক্সটি দেখাইল।

প্রিয়নাথ থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া তামাক খাইতেছিল। গ্রাম সুবাদে রাম মিত্তিরের ভাইপো বলিয়া তাহার সামনে তামাক খায় না। একটা শেষ টান মারিয়া একটু আগাইয়া হুঁকাটা অশ্বিনী শীলের হাতে দিয়া সে বলিল—তোমার ঐ বাক্স একটো করবে ? কাঠে কখনো কথা কয় ? মন্তোর-তন্তোর জান নাকি ?

বামুনপাড়ার নিত্যঠাকরুন দীঘির ঘাটে স্নান করিয়া ঘড়া কাঁখে ঘটি হাতে সবেগে মন্ত্র পড়িতে পড়িতে পথের সকল অশুচিতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন। কথাটা তাঁহার কানে গেল। মন্ত্র থামাইলেন না, কিন্তু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বৃত্তান্তটা শুনিলেন।

এ-পাড়া ও পাড়ায় অবিলম্বে রাষ্ট্র হইয়া গেল—মিত্তিরবাড়ি এক আশ্চর্য কল আসিয়াছে, তাহা মানুষের মতো গান গায় ও একটো করে। খুকিরা এবং যেসব ছেলে পাঠশালায় যায় না, সকলেই ছুটিল। যাহাদের বয়স হইয়াছে তাহারা অবশ্য এমন গাঁজাখুরি গল্প বিশ্বাস করিল না—তবু দেখিতে গেল।

চোঙাওয়ালা লোকটার নাম হরসিত—জাতে পরামানিক। উঠানে বেশ ভিড় জমিয়া গিয়াছে। সে কিন্তু নিতান্তই নিস্পৃহভাবে তামাক খাইতেছে : এত যে লোক জমিয়াছে তাহার যেন নজরেই আসিতেছে না। চক্কোত্তিদের বুঁচি খানিক আগে আসিয়াছে। আঙুল দিয়া টেঁপিকে দেখাইয়া দিল, ঐ সে কল। কিন্তু টেঁপিকে বোকা বুঝাইলেই হইল! ছোট চৌকা কাঠের বাক্স—উহাই নাকি আবার গান গায়, যাঃ!

হরসিত চোখ বুজিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে তামাকের ধোঁয়ায় পৌষ মাসের সকালবেলার মতো চারিদিকে নিবিড় কুয়াশা জমাইয়া তুলিল। এ যেন আরব্য উপন্যাসের সেই কলসির ভিতর হইতে দৈত্য বাহির হওয়া—কেবলই

ধোঁয়া, ধোঁয়া—তার মধ্যে হরসিতের আবছা মূর্তি! এইবার বুঝি প্রচণ্ড লাফ দিয়া একটা অত্যদ্ভুত কিছু করিয়া বসিবে। কিন্তু সে তাহা কিছু না করিয়া সহসা হুঁকার ভুড়ভুড়ি থামাইল এবং চোখ খুলিয়া বলিল—তামাক যে ফ্যাকসা মশাই, গলায় সেঁকও লাগে না।

অমনি জন দুই ছুটিল কামারপাড়ায় যাদবের বাড়ি। সে গাঁজা খায়, তাহার কাছে গলা সেঁকিবার উপযুক্ত একছিলিম তামাক মিলিতে পারে।

সকলে রাম মিত্তিরকে ধরিয়া বসিল—তুমি কায়েতদের সমাজপতি, এ গান তোমাকে দিতে হবে। রাম মিত্তিরের হইয়া সকলে দর কষাকষি আরম্ভ করিল। টাকায় আটখানি করিয়া গান, দু টাকায় সতেরো খানা অবধি হইতে পারে—তার বেশি নয়। একটোর দর অন্যত্র হইলে বেশি হইত, কিন্তু এতগুলি ভদ্রলোক যখন বলিতেছেন তখন তা আর কাজ নাই। মোটের উপর হরসিতের বিবেচনা আছে। এক টাকায় নয়খানি রফা হইল।

তখন পকেট হইতে একটা চকচকে গোলাকার বস্তু, হাতল, কাঁটার কৌটা প্রভৃতি বাহির করিয়া ধাঁ-ধাঁ করিয়া চৌকা বাক্সে হরসিত সেগুলি পরাইয়া ফেলিল, চোঙাটিও বাক্সের গায়ে বসাইল। তারপর গামছার পুঁটুলি খুলিয়া হাত-আয়না, চিরুনি ও কাপড় সরাইয়া বাহির করিল কালো কালো পাতলা পাথর—

কাহারও আর নিশ্বাস পড়ে না।

হাতল ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল—বায়নার টাকা দিন। অগ্রিম দেবেন না, বলেন কি মশাই? আমার সাহেববাড়ির কল—

থালায় করিয়া টাকাটি আসরের ঠিক মধ্যস্থলেই রাখা হইল, যে-যে পেলা দিতে চাহিবে, তাহাদের কাহারও যাহাতে কোনো অসুবিধা না হয়। তারপর হরসিত কলের উপর একখানা পাথর বসাইয়া টিপিয়া দিল, আর পাথর চরকির মতো ঘুরিতে লাগিল। তারপর সেই ঘুরন্ত পাথরে যেই আর-একটা মাথা বসাইয়া দেওয়া, অমনি একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল তবলা, বেহালা, ইংরাজি-বাজনা, ঢোল, করতাল—বোধকরি পৃথিবীতে সুর-যন্ত্র যা কিছু আছে সবগুলিই।

ইতিমধ্যে হৈ হৈ করিয়া একপাল ছেলে আসিয়া পড়িল, এই উপলক্ষে পাঠশালায় ছুটি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ছেলেরা আর কতটুকু গণ্ডগোল করিতে পারে? কলের মধ্যে যেন এককুড়ি পাঠশালায় একত্রে সমস্বরে নামতা পাঠ হইতেছে। হাঁ—কল যে সাহেববাড়ির, তাহাতে সন্দেহ

নাই। হরসিত বলিয়াছিল—ছাদ ফেটে যাবে, সেইটাই বুঝি সত্য-সত্য ঘটিয়া বসে!

কিন্তু এত যে গোলযোগ, পাথরখানা বদলাইয়া দিতেই চুপচাপ। ক্রমশ শোনা গেল, চোঙের ভিতর হইতে একলা গলায় গীত হইতেছে—ধিন্‌তা ধিনা পাকা নোনা। একেবারে স্পষ্ট আর অবিকল মানুষের গলা! মানুষ দেখা যায় না, অথচ মানুষই গাহিতেছে।

মণ্টুর অনেকক্ষণ হইতে মনে হইতেছিল, ঐ চোঙের ভিতর কাহারা বসিয়া বাজাইতেছে- ঠিক তাহার বুড়োদাদা যেমন দুলিয়া দুলিয়া তেহাই দিয়া থাকেন, তেমনি আবার তেহাই দেয়। এবারে গান শুনিয়া তাহার আর এক ফোঁটা সন্দেহ রহিল না।

চোঙের অধিবাসী সেই গায়ক ও বাদক-সম্প্রদায়কে দেখিতে ছেলেদের দল ঝুঁকিয়া পড়িল। কিন্তু কলের ভিতর হরসিত এমনি করিয়া দলসুদ্ধ পুরিয়া ফেলিয়াছে যে কাহাকেও দেখিবার জো নাই।

বুঁচি খুব কাছে দাঁড়াইয়াছিল, সরিয়া দূরে দাঁড়াইল। শঙ্কা হইল—ঐ কলওয়ালা কতলোককে তো পুরিয়াছে, যদি কাছে পাইয়া তাহাকেও পুরিয়া ফেলে—তখন? কিন্তু টেঁপি বুঁচির চেয়ে দু-বছরের বড়, বুদ্ধিও বেশি। সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিল—বাক্স তো ঐটুকুন মোটে, বড় বড় মানুষ কি করে থাকে?

বাক্সর ও মানুষের আয়তনের তারতম্য হিসাব করিলে মনে ঐ প্রকার সন্দেহের উদয় হইতে পারে বটে, কিন্তু যখন স্পষ্ট মানুষের গলা শোনা যাইতেছে তখন যেমন করিয়া এবং যত ঠাসাঠাসি করিয়াই হউক তাহারা তো আছে নিশ্চয়ই!

বাঁড়ুজ্জে ঠিক সামনে বসিয়াছেন। গান-বাজনার আসরে এই স্থানটি তাঁহার নিত্যকালের। বনকাপাসিতে কত মজলিস হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এমন ওস্তাদ তো একজন আসিল না যে তিনকড়ি বাঁড়ুজ্জের পায়ের ধুলা না লইয়া চলিয়া যাইতে পারিল।

আগাগোড়া সভাসুদ্ধ লোক বিমূঢ় হইয়া শুনিতেছে, কেবল রাম মিস্ত্রির বলিলেন—গলায় মোটে দানা নেই, দেখছ বাঁড়ুজ্জে? যতই হোক, টিনের চোঙ আর কাঠের বাক্স তো!

কে-একজন নেপথ্যে মন্তব্য করিল—সকাল বেলা এই খরচান্ত, মিস্ত্রির-মশায়ের গায়ের জ্বালা কিছুতে মরছে না।

রাম মিস্ত্রিরের সঙ্গে বাঁড়ুজ্জের মিতালি সেই নকুল গুরুর কাছে পড়িবার

সময় হইতে। কলের গানের জন্য সকলে ধরিয়া পড়িয়া রাম মিত্তিরের একটা টাকা খরচ করাইয়া দিল, সেজন্য মন খারাপ আছে নিশ্চয়। কিন্তু বাঁড়ুজ্জের কেমন মনে হইল, রাম তাঁহাকে খোশামোদ করিয়াই গানের নিন্দা করিতেছে—টাকার শোকে নহে।

প্রিয়নাথ বলিল—ও বাঁড়ুজ্জে মশায়, গান-বাজনায় চুল তো পাকালেন, কত গানই গেয়ে থাকেন, এমন সুর-লয় শুনেছেন কখনও? নাপতের পো ডাকিনী-সিদ্ধ, অপ্সরী-কিন্নরী ধরে এনে গান গাওয়াচ্ছে যেন।

গানের পর গান চলিল। একটা গানের এক জায়গায় ভারি তানের প্যাঁচ মারিতেছিল। অশ্বিনী শীল অকস্মাৎ উচ্ছ্বাস ভরে বলিয়া উঠিল—কি কল বানায়েছে সাহেব কোম্পানি। দেবতা—দেবতা—বেহ্মা-বিষ্টুর চেয়ে ওরা কম কিসে? বাঁড়ুজ্জে মশায়, আপনার সেতারের টুং-টাং আর রামপ্রসাদীগুলো এবার ছাড়ুন।

কলের বলবান রাগিণীর তলায় অশ্বিনীর গলা চাপা পড়িল, বাঁড়ুজ্জে তাহার সদুপদেশ শুনিতে পাইলেন না।

কিন্তু বাঁড়ুজ্জের আর কি আছে ঐ সেতারের টুং-টাং ছাড়া? চকমিলানো পৈতৃক প্রকাণ্ড বাড়িটা খাঁ-খাঁ করে—চামচিকার বসতি। সেখানে থাকিবার লোক তিনটি—মণ্টু, তার দিদিমা এবং তিনকড়ি বাঁড়ুজ্জে স্বয়ং। নারানীও ছিল—সেই সকলের শেষ। সাত বছর আগে মণ্টুকে ছ মাসের এতটুকু রাখিয়া সেও ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল। ছয় ছেলের মা বাঁড়ুজ্জে-গিন্নি একে একে সব কটিকে বিসর্জন দিয়া এই শেষের ধন মরা-মেয়ের বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িলেন। পাড়ার সকলে আসিয়া আর সান্ত্বনা দিবার কথা খুঁজিয়া পায় না। কিন্তু বাঁড়ুজ্জের চোখে জল নাই। রাম মিত্তির কাঁদ-কাদ গলায় কহিলেন—বুক বাঁধো বাঁড়ুজ্জে, ভগবানের লীলা। তখন বাঁড়ুজ্জে স্ত্রীকে দেখাইয়া বলিলেন—ঐ যে অবুঝ মেয়েমানুষ উঠোনের ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে, ওকে গিয়ে তোমরা প্রবোধ দাও—আমার কাছে আসতে হবে না, ভাই। শুধু তিনি তাকের উপর হইতে সেতারটি নামাইয়া দিতে বলিলেন।...

এতকাল বাদে কি-না অশ্বিনী শীল তাঁহাকে সেতার-বাজনা ছাড়িয়া দিতে বলিল!

এক-একটা গান হইয়া গেলে হরসিত কাঁটা বদলাইয়া আগের কাঁটা ফেলিয়া দিতেছিল। তাই কুড়াইতে ছেলেমহলে কাড়াকাড়ি! একবার আর একটু হইলে মণ্টু কলের উপর গিয়া পড়িত। হরসিত তাড়া দিয়া উঠিল।

বাঁড়ুজ্জে মণ্টুকে ডাক দিলেন —তুই দাদু, আমার কাছে আয়-- এসে ঠাণ্ডা হয়ে বোস তো। নারানীর সেই ছ-মাসের মণ্টু এখন কত বড় হইয়াছে!

কিন্তু মণ্টু আসিল না, উহার অনেক কাজ। কাঁটা কুড়ানো তো আছেই, গানও লাগিতেছে বড় ভালো। তা ছাড়া চোঙের ভিতর বসিয়া যে গায়ক গাহিতেছে, তাহার মূর্তিদর্শন সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হইবার কারণ এখনও ঘটে নাই।

যখন ভালো করিয়া বুলি ফুটে নাই, বাঁড়ুজ্জে তখন হইতেই মণ্টুকে তবলার বোল শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রোজ সন্ধ্যায় রাম মিত্তির প্রভৃতি দু-চারজন বাঁড়ুজ্জে-বাড়ি গিয়া বসেন। শ্রাবণ মাসে বৃষ্টিবাদলা এক একদিন এমন চাপিয়া পড়ে যে কেহ বাড়ির বাহির হইতে পারে না। না পারুক, তাহাতে এমন কিছু অসুবিধা ঘটে না। সেদিন মণ্টুর সেতার-শিক্ষা আরও বিপুল উদ্যমে চলে। ভারি তাল কাটে, লজ্জা পাইয়া মণ্টু বলে—বুড়োদাদা, আজ আর হবে না, ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু ঘুম পাইলেই হইল। লাউয়ের খোলের ভিতর হইতে সুর আদায় করা সোজা কর্ম নয়।

অশ্বিনী শীল বনকাপাসির সুবিখ্যাত সংকীর্তনের দলে খোল বাজাইয়া থাকে। উল্লসিত হইয়া পুনশ্চ সে বলিয়া উঠিল—আজই বাড়ি গিয়ে খোলের দল ছিঁড়ে খড়মে লাগাব। মরি, মরি--- কি কীর্তনটাই গাইল রে! আমাদের গানের পরে আজ ঘেন্না হয়ে গেল।

রাম মিত্তির ক্ষীণ আপত্তি তুলিয়া বলিলেন—মন দিয়ে শুনেছ বাঁড়ুজ্জে? অন্তরার দিকটায় তালে গোলমাল করে গেল না?

বলিয়াছিল বটে আমির খাঁ ওস্তাদ—বাঁড়ুজ্জিবাবুর কান ভালকুত্তার মাফিক। খাঁ সাহেব অনেক কায়দা করিয়াও বাঁড়ুজ্জের কানকে ফাঁকি দিতে পারে নাই, কারচুপিটুকু ঠিক ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। দিল্লিওয়ালা আমির খাঁ অবধি ভুল করিতে পারে, কিন্তু এই অত্যাশ্চর্য কাঠের বাক্সর গানে একবিন্দু খুঁত ধরিবার জো নাই। রাম মিত্তির তালের কিছু বোঝেন না, তিনি ভুলের কথা বলিলেন। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া বাঁড়ুজ্জে কি ভুল ধরিবেন?

বিকালেও আর এক বাড়ি বায়না—কামারপাড়ায়। মণ্টু শুনিতে গিয়াছে, বাঁড়ুজ্জের মাথাটা কেমন টিপ-টিপ করিতেছিল বলিয়া যাইতে পারেন নাই।... আধঘুমের মধ্যে বাঁড়ুজ্জের মনে হইল, কে যেন আসিয়া কপাল টিপিয়া দিতেছে আর ডাকিতেছে—বাবা! মেজ ছেলে মানিকের গলা না? দশ বছরেরটি হইয়াছিল। গোলাঘাটার বড় ইস্কুলে পড়িতে যাইত। কিন্তু মানিক নয়, মানিক গিয়াছে ঘুড়ি উড়াইতে—নারানী—নারানী। নারানী ডাকিতেছে—

বাবা, বাঘ এয়েছে—খোকাকে ধরল যে! নারানী মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে।· ঘরের মধ্যে বাঘ? সেতারের তাল কাটিয়া গেল। মারো সেতারের বাড়ি বাঘের মাথায়—মারো—মারো। মণ্টুকে ছাড়িয়া বাঘ সেতার কামড়াইয়া ধরিল, তার ছিঁড়িল, চিবাইয়া চিবাইয়া আগাগোড়া একেবারে তছনছ। তা যাক, মণ্টু কই? মণ্টু, মণ্টু! বাঁড়ুজ্জে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া ডাকিলেন—মণ্টু!

মণ্টু গান শুনিয়া ফিরিয়াছে। তাহার আনন্দ ধরিতেছিল না। বলিল—বুড়োদাদা, তুমি গান শুনলে না—আমরা শুনে এলাম, দুই টাকার গান। এবেলা আরও খাসা খাসা। তুমি অমনি ভালো করে গাও না কেন দাদা?

বাঁড়ুজ্জে কহিলেন—ভালো গাই নে?

মণ্টু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না। তুমি গাও ছাই—বুধোকাকারা বলেছে।

বাঁড়ুজ্জে একটুখানি চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর যেন কত বড় রসিকতার কথা—প্রবলবেগে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—জানিস নে ও মণ্টু, জানিস নে—ও যে কোম্পানি বাহাদুরের কল, ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমি পারি? গোটা জেলাটা জুড়ে ওদের রাজ্যি, আর আমি ব্রহ্মোত্তরের খাজনা পাই মোটে একান্ন টাকা সাত আনা—

বলিতে বলিতে সেতারটা পাড়িয়া লইলেন।

মণ্টু বলিল—সেতারে কত ঝঞ্ঝাট, কলের গান আপনাআপনি বাজে। আমাকে একটা কলের গান এনে দিতে হবে।

বাঁড়ুজ্জে বলিলেন—দেব, বুঝলি দাদু, কলের গান দেব আর সেই সঙ্গে কলের হাত-পা-নাক-চোখওয়ালা একটা নাতবউ—কি বলিস?

বলিতে বলিতে গলাটা যেন বুজিয়া আসিল, তবু বলিতে লাগিলেন—ওস্তাদের কত গালাগালি খেয়েছি, সরস্বতী ঠাকরুনকে কত চিনির নৈবিদ্যি খাইয়েছি। এখন আর কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। তোরা যখন বড় হবি মণ্টু, ততদিনে সরস্বতী দুর্গা কালী শালগ্রামটা পর্যন্ত কলের হয়ে যাবে। খুব কলের পুজো করিস।

সন্ধ্যা গড়াইয়া যায়। আজ বাঁড়ুজ্জে-বাড়ি কেহ আসে নাই। মণ্টুও নাই। কেবল রাম মিত্তিরের খড়মের ঠকঠকি সিঁড়িতে শোনা গেল।

—কি বাঁড়ুজ্জে, একা একা খুব লাগিয়েছ যে! সুরটা পূরবী বুঝি?

বাঁড়ুজ্জে তদ্গত হইয়া সেতার বাজাইতেছিলেন। বলিলেন—দোসর কোথায় পাই ভাই? চাঁদা তুলে ঠাকুরবাড়িতে আবার কলের গান দিচ্ছে—মণ্টু গেছে সেখানে। একা-একাই বাজাচ্ছি—কেমন লাগছে বল তো?

রাম মিত্তির বলিলেন—এখন রেখে দাও, এ-সব তো রোজ শুনব। চল ঠাকুরবাড়ি যাওয়া যাক।

বাঁড়ুজ্জেকে লইয়া রাম মিত্তির ঠাকুরবাড়ির আসরে বসিলেন। হরসিতের কলে ইতিমধ্যে দু-খানি গান সারা হইয়া একটা শুরু হইয়াছে :

কি করিলি অবোধ বালিকা?

সুধা ভ্রমে হলাহল করিলি যে পান—

চেহারা তো দেখা যায় না, তবে হাঁ—গলা শুনিয়া একথা স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে বক্তা ভীম, রাবণ বা অন্ততপক্ষে তস্য পুত্র মেঘনাদ না হইয়া যায় না।

বাঁড়ুজ্জে বলিলেন—তুমি বাপু, একখানা পূরবী বাজাও তো।

হরসিত ঘোরপ্যাচের মানুষ নয়, জবাব সোজা করিয়াই দিল—হুকুম-টুকুম চলবে না মশাই, যা বাজাই শুনে যান—আমার সাহেব-বাড়ির কল—

অতএব সাহেববাড়ির কলের যেরূপ অভিপ্রায় হইল, বনকাপাসির সমুদয় শ্রোতা তটস্থ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিল। ইহা আমির খাঁ ওস্তাদের মজলিস নয় যে ফরমায়েশ খাটিবে।

অকস্মাৎ—ঘটর্-ঘটর্-ঘ্যস্—

গান থামিয়া গেল। কলের কোথায় কি কাটিয়া গিয়াছে। এতগুলি শ্রোতা বিরসমুখে বসিয়া রহিল। যন্ত্রপাতি বাহির করিয়া হরসিত কাঠের বাক্সটা খুলিয়া আলগা করিয়া ফেলিল।

কলের ভিতর মানুষ নাই, কেবল লোহালক্কড়।

হরসিত অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু মেরামত হইল না। তখন থালা হইতে বায়নার টাকা ও পেলার পয়সা তুলিয়া লইয়া উল্টাগাঁটে ভালো করিয়া গুঁজিয়া সে বলিল—রাত্তিরে আর নজর চলে না মশাই। সকালেই ঠিক করে বাকি গানগুলো শুনিয়ে দেব, কিরূপা করে মশাইরা সকলে পদধূলি দেবেন।

ঠাকুরবাড়িতে গ্রামস্থ সকল মহাশয়েরই সকালে যথাসময়ে ভিড় হইল। কিন্তু হরসিত নাই, কলের গান নাই, এমন কি নেত্য ঠাকরুনের পিতলের ঘটিটিও নাই। জল খাইবার জন্য হরসিতকে ঘটিটি দেওয়া হইয়াছিল।

অশ্বত্থামার দিদি

গুরুপুত্র অশ্বত্থামার গরু চুরি মকদ্দমায় এক বৎসরের জেল হইয়া গেল।

অধিকারী একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিল। কারণ, তিলসোনার মজুমদাররা লোক ভালো নয়। বাড়ি আসিয়া পাঁচ টাকা বায়না দিয়া গিয়াছে, এবং বারংবার বলিয়া গিয়াছে—কালীপুজো মঙ্গলবারে, তার পরের দিন বুধবার তেরোই তারিখে গান। বেলাবেলি হাজির হোয়ো হে, সাতাশ গ্রাম নেমন্তন্ন। অতএব গাফিলি হইলে তাহারা সহজে ছাড়িবে না নিশ্চয়। সেই তেরোই-ও আসিয়া পড়িল।

অধিকারী চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, মা কালীর খাঁড়ার লক্ষ্য এবার তাহারই মাথাটা।

কিন্তু মাথায় হাত দিয়া তো খাঁড়ার কোপ ঠেকানো চলে না। কাজেই আর একবার সৃষ্টিধরের হাতে পায়ে ধরিয়া দেখা ছাড়া উপায় কি? তিলসোনার আসরে অশ্বত্থামা সাজিয়া যদি সে এবারকার মতো ইজ্জত বাঁচাইয়া দেয়!

সৃষ্টিধর বিদ্বান ব্যক্তি, ইংরাজি ফার্স্ট বুকও পড়িয়াছে- কিন্তু তাহার মোটে বিবেচনা নাই। গত বৎসর যাত্রাদলের সূচনার সময় সৃষ্টিধরকে অনেক বলা-কওয়া হইয়াছিল, এমন কি দশ টাকা করিয়া মাহিনা দিবার কথাও উঠিয়াছিল। কিছুতে সে দলে আসিল না, সাফ জবাব দিল: দশটাকায় ষাঁড় কিনে কাজ চালাও গে—

কিন্তু সৃষ্টিধরের গোঁফ উঠে নাই, নধর চেহারা, রানী সখী বা নিতান্ত পক্ষে রাজপুত্র বেশেই মানায়, তাহাকে তো সেনাপতি সাজিতে ডাকা হয় নাই। অতএব ষাঁড় দিয়া তাহার কাজ চলে কি করিয়া?

যাহা হউক সে-সব আবশ্যক হয় নাই, বলাই তেলিকে পাওয়া গিয়াছিল এবং বড় সুবিধামতই পাওয়া গিয়াছিল। খুব স্ফূর্তিবাজ লোক, টাকাকড়ির খাঁই মোটেই নাই। খুলনার দিকে কোথায় তাহার মামার বাড়ি, মামারা বড়লোক। যে মরশুমে দলের গাওনা থাকিত না, মামার বাড়ি ডুব মারিত। ফিরিয়া আসিয়া দিন কতক হরদম খরচ করিত। অশ্বত্থামার পার্টও বলিত খাসা।

কিন্তু তিলসোনার বায়না লইবার কয়েকদিন পরে অকস্মাৎ একদিন থানার দারোগা আসিয়া বলাইকে ধরিয়া লইয়া গেল, উহারা কয়জনে মিলিয়া নাকি

কোন গ্রাম হইতে গরু সরাইয়া ঝিকরগাছির হাটে বেচিয়া আসিয়াছে। তারপর জেল।

অধিকারী মনে মনে সাব্যস্ত করিয়া গিয়াছিল—একটা রাতের গাওনা মোটে—টাকা তিনেকের মধ্যেই সৃষ্টিধর রাজী হইয়া যাইবে। তাহারও কিঞ্চিৎ হাতে রাখিয়া প্রথমে সে প্রস্তাব করিল: দু টাকা—

কিন্তু সৃষ্টিধর গরজ বুঝিয়া হাঁকিল একেবারে সৃষ্টিছাড়া দর: পাঁচ টাকার কম হবে না।

লোকটার সত্যই বিবেচনা নাই। পচিশ টাকা বায়না, জুড়ি বেহালাদার প্রভৃতিকে ধরিয়া মানুষও জন পঁচিশেকের কম হইবে না। তাহার মধ্যে একা অশ্বত্থামাকে যদি পাঁচ টাকা বখরা দিতে হয়, তাহা হইলে তস্য পিতা দ্রোণাচার্য পিতামহ ভীষ্ম মধ্যম-পাণ্ডব ভীম প্রভৃতি মহা মহা বীরগণের ভাগে কি পড়িবে?

তিন, সাড়ে-তিন, পৌনে-চার করিয়া অবশেষে পুরাপুরি চারই স্বীকার করিতে হইল। না করিয়া উপায় নাই। এই কয়দিনের মধ্যে পার্ট মুখস্থ করিয়া একরকম চালাইয়া দিতে পারে এ অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র ঐ সৃষ্টিধর।

গীতাভিনয় শুরু হইয়া গিয়াছে।

দ্রোণাচার্যের প্রায় আজানুলম্বিত দাড়ি—রাজবাড়িতে মাস্টারি করিবার মানানসই দাড়ি হইয়াছে বটে। আসরের দক্ষিণ কোণে অশ্বত্থামা চিঁ-চিঁ করিয়া বলিতেছে, দুধ, দুধ খাব বাবা—আর দ্রোণাচার্য দুই হাতে সেই দাড়ি-সমুদ্র অনবরত আলোড়িত করিয়া একবার ঝাড়লণ্ঠনের মধ্যে, একবার বেহালাদারদের পশ্চাদ্দেশে, একবার বা ছেঁড়া সামিয়ানার ফাঁকে আকাশমুখো তাকাইয়া দুধ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু এতসব অত্যুৎকৃষ্ট স্থান হইতেও দুধ মিলিল না। শেষে একজন ছোকরা হারমোনিয়ামের বাক্সের এক কোণ হইতে একটা ছোট অ্যালুমিনিয়মের তেলের বাটি বাহির করিয়া আগাইয়া দিল। দ্রোণাচার্য, কোন প্রকার উপকরণ ব্যতীত বোধকরি কেবলমাত্র তপঃপ্রভাবেই, সেই বাটিতে পিটালি গুলিয়া দুধ বলিয়া ফাঁকি দিয়া অশ্বত্থামাকে খাওয়াইয়া দিলেন। আর সেই নিরাকার পিটালিগোলার শক্তিই বা কি অসামান্য! মুহূর্তমধ্যে অশ্বত্থামার মিহি গলা দস্তুরমতো সবল হইয়া উঠিল এবং আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সহিত বিশ হাত আসরের আগাগোড়া প্রদক্ষিণ করিয়া দুধ-খাওয়ার আনন্দে একটো করিয়া সে লাফাইতে লাগিল।

চারিদিকে বাহবা বাহবা পড়িয়া গেল।

চিকের আড়ালে একটি বধূ কেবলি চোখ মুছিতেছিল—মজুমদার-এস্টেটের রকম সাতআনা শরিক স্বর্গীয় যদুনাথ মজুমদার মহাশয়ের কনিষ্ঠা পুত্রবধূ উমাশশী। তার যেন কেমন মনে হইল, ঐ অশ্বত্থামা তাহার ভাই, সে তাহার দিদি।

উমার কাঁচা বয়স, তবু এটুকু বুঝিবার বুদ্ধি আছে যে ইহার কিছু সত্য নহে, অভিনয় মাত্র। কিন্তু সত্য হউক মিথ্যা হউক, অমন সুন্দর ছেলেটি আসরের পাশে পড়িয়া একটুখানি দুধ খাইবার জন্য অত করিয়া কাঁদিতে লাগিল তো! আর যখন দুধ বলিয়া খানিক পিটালির গোলা খাওয়াইয়া দিল, অশ্বত্থামা রাগ করিয়া ঐ বাটিসুদ্ধ আসর ডিঙাইয়া কলাবনের মধ্যে ফেলিয়া দিল না কেন? তাহা না করিয়া অবোধ বালক আনন্দে নাচিতে লাগিল!…

যাত্রা দেখিতেছে আর কত কি ভাবিতেছে এমনি সময়ে উমার মনে পড়িয়া গেল, তাহার খোকামণি এতক্ষণ হয়তো জাগিয়াছে। সন্ধ্যার সময় তাহাকে খাটের উপর ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া মোক্ষদাকে সেখানে বসাইয়া তবে গান শুনিতে আসিয়া বসিয়াছে। যে আদুরে ঝি মোক্ষদা—এতক্ষণ কি করিতেছে তার ঠিক কি! হয় ঘুম মারিতেছে, নয় তো এই ভিড়ের মধ্যে কোনোখানে চুরি করিয়া বসিয়া সে-ও গান শুনিতেছে। মোটে এক বছরের একরত্তি ছেলে, দুধ খাইবার সময় হইয়াছে, বাড়িতে কেহ নাই, জাগিয়া থাকে তো কাঁদিয়া কাঁদিয়া খুন হইতেছে। ব্যস্ত হইয়া উমাশশী উঠিয়া পড়িল।

ছয় শরিকের এজমালি কালীপূজা। সম্পত্তির অংশক্রমে যাত্রাদলের লোকজন খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যদুনাথের তরফে খাইবে বারোজন। অনেক রাত্রে গান ভাঙিয়া গেলে পুরুষমানুষদের খাওয়া শেষ হইয়া গেল। তারপর উমা খাইতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল: যাত্রার লোকেরা খেয়ে গেছে?

বামুন-ঠাকরুন উত্তর করিলেন: না বউমা, এমন কি নবাবপুত্তুররা এয়েছেন যে সন্ধ্যা না লাগতে বাবুদের আগেভাগে খাইয়ে দেব। আমার সব হয়ে গেছে, আর দেরি নেই। মোক্ষদা এবার ডাকতে যাক। মোক্ষদা, ও মোক্ষদা—

উমার খাওয়া শেষ হইয়া আসিয়াছিল। অবশিষ্ট ভাতগুলির কতক খাইয়া তাড়াতাড়ি আঁচাইতে গেল। মোক্ষদা তখন উপর হইতে নিচে নামিতেছে।

উমা কহিল, কেমন গান শুনলি মোক্ষদা?

মোক্ষদা বিস্ময়ে খানিকক্ষণ কথাই বলিতে পারিল না। শেষে কহিল, অ

পোড়াকপাল, আমি গেনু কখন? আমি বলে মাজার ব্যথায় ছটফটিয়ে মরি।

উমা হাসিয়া ফেলিল: তুই যে আঁধারে আঁধারে কচুবনের পাশ দিয়ে—আমি নিজের চোখে দেখলাম। তা বেশ তো, কি হয়েছে তাতে, তুই খোকাকে একলা ফেলে চলে গেছিস, আমি কি কাউকে তা বলতে যাচ্ছি?

অতঃপর মোক্ষদার আর মনে না পড়িবার কথা নয়—এখনও স্মরণ না হইলে আরও যে কি বাহির হইয়া পড়িবে, তার ঠিক কি?

বলিল, আস্তে কথা কও বউদি, শুনতে পেলে গিন্নিমা আস্ত রাখবেন না। বামুন-ঠাকরুনকে বলে দিইছিনু, যখন যুদ্ধু হবে আমায় ডেকো। তিনি এসে বললেন, মোক্ষদা, দেখসে এসে, ভীম সাঁই-সাঁই করে কী গদাই ঘুরুচ্ছে! গিইছি আর এয়েছি—দাঁড়াই নি মোটে।

উমা বলিল, আর অশ্বত্থামা কেমন একটো করলে বল দিকিনি। দেখতেও যেন রাজপুত্তুর, না?

মোক্ষদা ঘাড় নাড়িয়া সংক্ষেপে বলিল, হুঁ। তাহার মাথার মধ্যে তখনও সাঁই-সাঁই করিয়া ভীমের গদা ঘুরিতেছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিল, কিন্তু দুর্যোধন কি পালোয়ান রে বাপু! আমি শুনে দেখনু, একটা নয়, দুটো নয়—ভীম ছয় ছয়টা গদার বাড়ি মারল, তবু লাফাতে লাফাতে চলে গেল। সোজা কথা! ভীমের ঐ গদা বিশ পঁচিশ মন হবে, না বউদি?

কিন্তু গদাতত্ত্বের আলোচনা আর অধিক চলিল না, বামুন-ঠাকরুন ডাকিতেছিলেন: ও মোক্ষদা, ডাকতে গেলি নে? যা দিদি, আমি আর কত রাত অবধি ভাত চৌকি দেব?

উমাও বলিল, যাচ্ছিস ডাকতে? যা, কেন মিছিমিছি রাত করিস? আর ঐ যে অশ্বত্থামা চিনতে পারবি নে? যে দুধ-দুধ করে কাঁদছিল গো, তাকেও ডেকে আনবি। বারোজন খাবে আমাদের বাড়িতে—ঐ ছেলেটাও খাবে। যদি না আসতে চায়, ছাড়বি নে—বুঝলি?

মোক্ষদা ডাকিতে চলিয়া গেল।

এবারে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকিয়া উমা দেখিল আয়োজন প্রচুর: ভীমরুলের ডিমের মতো মোটা মোটা আউশচালের ভাত, পুঁইডাঁটার চচ্চড়ি এবং খেসারির ডাল রান্না হইয়া গিয়াছে, এখন নিবন্ত উনানে পাঁচ সাতটি বেগুন পোড়াইয়া দিলেই হইয়া যায়। কহিল, ও বামুন মা, করেছ কি? এই দিয়ে লোকগুলো কি করে খাবে?

বামুন-ঠাকরুন আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, বল কি বউমা, বেগুন পোড়া দিয়ে তিন-তিনটে তরকারী হল—আরো খাবে কি দিয়ে? বাড়িতে ওরা কি সোনা-স্বর্ণ খেয়ে থাকে? তুমি ছেলেমানুষ, জানো না তো!

কিন্তু ছেলেমানুষ হইলেও উমা জানে। এই সব লোক—যাহারা যাত্রার দলে রাজা সাজিয়া বেড়ায়, আবার বাড়িতে ভাঙা মণ্ডপে সাবেকি চালে একরকম নিশ্চিন্তভাবে হুকা টানিয়া থাকে এবং ধান-ভরা সবুজ বিলের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আগামী পৌষে নূতন গোলা বাঁধিবার স্বপ্ন দেখে, তাহারা সদাসর্বদা যে-অপরূপ সোনা-সুবর্ণ খাইয়া থাকে তাহা উমা ভালো করিয়াই জানে। সেই যে রূপকথার কোন কাঠকুড়ানি ছেলে-মেয়ে বনের মধ্য দিয়া যাইতেছিল, রাজবাড়ির শ্বেতহস্তী শুঁড়ে করিয়া আনিয়া সিংহাসনে বসাইয়া দিল—উমারও হইল তাই।

উমার বাপের বাড়ি উজ্জলপুরে, এখান হইতে পুরা তিনটি ভাটির পথ, একেবারে মধুমতীর উপর। পাঁচ বৎসর আগে সেখানে প্রতি রাত্রে দিদি ও ভাইটি মায়ের কোলে জড়াজড়ি করিয়া থাকিত। বোকা ভাইটি—তার নাম হারান। এমনি অবোধ যে আর সকলের মতো তাহাদেরও বাবা বাঁচিয়া ছিল—এ রকম অসম্ভব কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিত না, ইহা লইয়া উমার সঙ্গে ঘোরতর তর্ক করিত।

একবার হইয়াছে কি, চৌধুরিবাড়ি অমিয়ার বিবাহ উপলক্ষে কলিকাতা হইতে নানান রকম জিনিস আসিয়াছে। সেদিন হারানের আর টিকি দেখিবার জো নাই, বেলা দুপুর অবধি আগামী উৎসবের আয়োজন দেখিতেছে। অমিয়ার কাকা ট্রাঙ্ক খুলিয়া জিনিসপত্র বাহির করিয়া অমিয়ার মাকে বুঝাইয়া দিতেছিলেন, উবু হইয়া বসিয়া হারান একমনে তাহা দেখিতেছিল।

বাড়ি ফিরিয়া হারান উমাকে চুপি চুপি কহিল, আজ এক তা পেয়েছি, কাউকে বলিস নে দিদি। ভুলে ওরা রোয়াকের পরে ফেলে চলে গেল, কেউ নেই দেখে তুলে নিলাম। কি বল্ দিকি? কলকাতার মেঠাই—না? বলিয়া চারিদিক তাকাইয়া কোঁচার খুঁট হইতে অতি সন্তর্পণে সেই দুষ্প্রাপ্য কলিকাতার মিঠাই বাহির করিল।

দেখিয়া খানিকক্ষণ তো হাসির চোটে উমা কথাই কহিতে পারিল না—একটা টকটকে রাঙা মোমবাতি। বলিল, ও হারান, ওরে বোকা, তুই যেন কি—বাতি চিনিস নে? বাতি, বাতি—জেলে দিলে ঠিক পিদ্দিমের মতো আলো হয়।

দিদির অত হাসি দেখিয়া হারান অপ্রস্তুত হইয়া প্রথমটা কিছু বলিতে পারিল না, কিন্তু একটু সামলাইয়া লইয়া শেষে পুরাদস্তুর তর্ক করিতে লাগল:

উহা কক্ষনো বাতি নয়—সে বুঝি বাতি চেনে না? চৌধুরিদের মানিক নন্দ প্রভৃতিকে স্বচক্ষে ঐ বস্তু খাইতে দেখিয়াছে যে।...

উজ্জলপুর গ্রামখানি পরগনে সৈদাবাদের মধ্যে, অতএব তিলসোনা মজুমদার-এস্টেটের অন্তর্গত।

যদুনাথ মজুমদার মহাশয় তখন বাঁচিয়া। একবার কিস্তির মুখে তিনি স্বয়ং আদায়পত্র তদারক করিতে গিয়াছিলেন। কাছারিবাড়ির সামনে দিয়া কাঁচা-রাস্তা সোজা দক্ষিণমুখো একেবারে খেয়াঘাট অবধি চলিয়া গিয়াছে। সকালবেলা মজুমদার মহাশয়ের অনেক কাজ—রোকড় সেহা খতিয়ান প্রভৃতি অত্যাবশ্যক কাগজপত্র পরীক্ষা করিতে হইত। তাহারই মধ্যে একবার রাস্তার দিকে তাকাইযা চশমার ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইতেন, পাততাড়ি বগলে একটি ছেলে একেবারে দিদির আঁচলের মধ্যে গা ঢাকিয়া পাঠশালায় যাইতেছে। দিদি আর ভাই হরদম বকিতে বকিতে যাইত, কী যে বকিত উহারাই জানে।

মজুমদার মহাশয় রোজই দেখিতেন। একদিন তিনি উমাকে ধরিয়া ফেলিলেন। সন্ধ্যাবেলা ভাইকে লইয়া ফিরিতেছিল, যদুনাথ রাস্তার পাশে পায়চারি করিতেছিলেন, ডাকিলেন, শোনো মা লক্ষ্মী--

উমা সসঙ্কোচে কাছে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যদুনাথ কি যে শোনাইবেন ঠিক করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন, আমার তিলসোনার বাড়িতে যাবে? আমার ঘরদোর আলো হয়ে যাবে—লক্ষ্মী-মা, যাবে তো? বলিয়া পরম স্নেহে উমার মুখের উপর যে ক-গাছি চুল উড়িতেছিল তাহা সরাইয়া দিলেন।

উমা কিছু কিছু বুঝিল, কিন্তু হারানের কাছে যদুনাথের কথাগুলি বড় দুর্বোধ্য ঠেকিল। পথে যাইতে যাইতে পরম উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল—দিদি, ওদের বাড়ি তোকে যেতে বলে কেন? আবার যদি জিজ্ঞাসা করে তুই বলে দিস--যাব না। যদি না যাস ওদের লেঠেল-পাইক দিয়ে ধরে নিয়ে যাবে না তো?

পরদিন যদুনাথ স্বয়ং উমাদের বাড়ি আসিয়া সকল কথা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, উমার সহিত তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রমানাথের বিবাহ দিতে চান। দেনাপাওনার কোনো কথা নাই, স্বয়ং মা-লক্ষ্মী ঘরে গিয়া উঠিবেন, টাকা দিয়া আর কি হইবে?

বিবাহ হইয়া গেল।

যে দিন উমারা রওনা হইয়া যাইবে তার আগের দিন সন্ধ্যায় হারান বলিল, দিদি, রাজরানী হলি, তা মাথায় মুকুট কই?

উমা বলিল, যাঃ—রাজরানী না হাতি! কে বলেছে রে?

কিন্তু হারান বুঝি কিছু বোঝে না! বলিল, রানী নয় তো কি? মা বললে, তবেগে সুশীল মানিক সবাই বলছিল— আর তুই লুকুচ্ছিস? ও দিদি, তোদের রাজবাড়িতে যেতে দিবি আমায়? সেপাইরা মারবে না?

উমা চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেউ কোথাও নাই তো? শ্বশুরবাড়ির কথা বলিতে বড় লজ্জা করে, কিন্তু অবুঝ ভাইটিকে আবার লজ্জা! বলিল, ইঃ মারলেই হল। আমার ভাইটিকে মারে কে? তুই আর একটু বড় হলি নে কেন হারান, তা হলে কালই সঙ্গে নিয়ে যেতাম। খানিক বড় হয়ে যাস—গেলে তোকে এত বড় রুইমাছের মাথা দিয়ে ভাত বেড়ে দেব, এই এত বড়। যাবি তো?

হারান ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল: হ্যাঁ, আর মেঠাই—কলকেতার মেঠাই দিস? দিবি নে দিদি?

বামুন ঠাকরুনের চাকরি অল্পদিনের, তিনি উমার বাপের বাড়ির কোনো খবর রাখেন না। বলিতেছিলেন, তুমি মা ছেলেমানুষ—ভাবো পিরথিমের সবাই বুঝি তোমাদের মতো খায় দায়। তিন তিনটে তরকারি রেঁধেছি, তবু বলছ যাত্রার লোকেরা কি দিয়ে খাবে? আর বড়বাবুর ঘরে দেখে এসগে, সেখানকার ব্যবস্থা শুধু ফ্যানসাভাত আর নুন—তেঁতুলটুকুও নয়—

উমা বলিল, তা হোক বামুন মা, বাড়িতে কত মিঠাই-মোণ্ডা ভিয়েন হল—তার কি কিছু নেই? থাকে তো, ওদের একটা একটা যাহোক-কিছু দাও। আচ্ছা, তুমি ভাত বাড়ো, আমি দেখছি—

উপরে আসিয়া ভাঁড়ার খুঁজিয়া দেখিল, কিছুই নাই। অনেক বড় বড় ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, তাঁহারাই শেষ করিয়া গিয়াছেন। সে কথা বামুন-ঠাকরুনকে গিয়া বলিতে লজ্জা করিতে লাগিল। যা হয় করুন গিয়া তিনি—উমা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

দেখিল, সারাদিন খাটিয়া-খুটিয়া রমানাথ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, মাথার কাছে আলো জ্বালা। শিয়রে এমনি আলো জ্বালিয়া কখনো ঘুমায়! এমন মানুষ, যদি কোনো কিছুর খেয়াল থাকে!

উমা আলোটা সরাইয়া জোর কমাইয়া দিল। তারপর খোকার চাঁদের মতো মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল। সে-ও অঘোরে ঘুমাইতেছে। আজ আর জাগে নাই, দুধও খায় নাই। খোকার সেই দুধের বাটি হাতে করিয়া উমা ফের নিচে নামিয়া গেল।

তখনও বামুন-ঠাকরুন একলা ভাত লইয়া বসিয়া আছেন। বলিলেন,

দেখ তো মা মোক্ষদার কাণ্ড! এখনও এলো না। হতভাগী কোথায় গল্প গিলতে বসেছে।

উমা বলিল, ওর ঐ রকম, কিছু বোঝে না। আচ্ছা, তুমিও তো যাত্রা শুনেছ বামুন-মা, সব চাইতে ভালো একটো করলে কে? অশ্বত্থামা, না?

বামুন-ঠাকরুন ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ছাই! একটোর কথা যদি বল ভীমের উপরে কেউ নেই। প্রথমে মোহড়ায় গোটা দুই লাফ দিয়েছে কি, সামনে যে ছেলেগুলো বসেছিল তারা ছুটে একেবারে নাটমণ্ডপের নিচে। হবে না, কত বড বীর! মহাভারত পড় নি বউমা?

উমা কহিল, তা ঠিক। কিন্তু অশ্বত্থামাকে দেখে আমার বড্ড কষ্ট হয়। গরিব বামুনের অবোধ ছেলে, একটুখানি দুধের জন্যে কী কান্নাটাই কাঁদলে! তারপর দুধের বাটিটা আগাইয়া দিয়া বলিল—ঐ অশ্বত্থামা ছোকরা এখানেই খেতে আসবে, তুমি তাকে এই দুধটুকু দিও বামুন-মা।

বিড়ালের বড় উপদ্রব। বামুন ঠাকরুন দুধের বাটি তাকের উপর তুলিয়া ঢাকা দিয়া রাখিলেন। উমা চুপ করিয়া রহিল, তারপর উনানের কাছে সরিয়া গিয়া বসিয়া বলিল, এবারে শীত যা পড়বে—এরি মধ্যে কেমন শীত-শীত লাগছে, দেখ না। আর আমার বাপের বাড়ি এদ্দিন ঠিক লেপ গায়ে দিতে হচ্ছে—একেবারে মধুমতীর উপর কি না! হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল, মজার কথা শোনো বামুন-মা, আজকে প্রথমে যখন অশ্বত্থামা আসরে এলো, আমি ভাবলাম আমার ভাই হারান এলো বুঝি! এমন পেটুক তুমি ভূ-ভারতে দেখ নি কখনো। অশ্বত্থামা যখন দুধ-দুধ করে কাঁদছিল, আমার মনে হল হারান কাঁদছে।

বামুন ঠাকরুন কহিলেন, তোমার ভাই বুঝি ঐরকম দেখতে?

উমা কহিল, দূর! ওর চেয়ে ঢের ছোট আর ধবধবে ফরসা—যেন কড়ির পুতুল। সেবারে যখন এখানে আসি, খুব ভোরবেলা—পানসিতে উঠে দেখলাম, হারান কখন এসে ঘাট-কিনারে বাবলাতলায় দাঁড়িয়ে আছে। পানসিতে ডেকে তার কড়েআঙুলে একটু কামড় দিয়ে এলাম। আঙুল কামড়ালে নাকি মায়া-মমতা ছেড়ে যায়—ওসব ছাই কথা।

বামুন-ঠাকরুন সমবেদনা প্রকাশ করিয়া কহিলেন, আহা! আসে না কেন?

উমা বলিল, আসে কার সঙ্গে? মোটে এগারো বছর বয়স। আর ক-টা

বছর বাদে বড় হয়ে আসবে ঠিক। এসে সে আমাকে ফি বছর উজ্জ্বলপুরে নিয়ে যাবে। তখন বছর বছর যাব, কাউকে খোশামোদ করছিনে, আর ক-টা বছর যাক না।

এমন সময় ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। কান্না তো নয়, যেন উপরে ডাকাত পড়িয়াছে। উমার বড় ইচ্ছা করিতেছিল, যাত্রার লোকদের খাওয়া হইয়া গেলে তবে যাইবে, কিন্তু আর দাঁড়ানো চলে না। যাইবার সময় বলিয়া গেল, বামুন-মা, ঐ ছোকরাকে মনে করে দুধটুকু দিও--ভুলো না যেন। তোমার যে ভোলা মন।

এমনি বেশ শান্ত, কিন্তু উমার খোকা একবার কান্না যদি আরম্ভ করিয়াছে—অবাক হইয়া যাইতে হয়, অতটুকু গলায় এ প্রকার আওয়াজ উঠে কি করিয়া?

ইতিমধ্যে রমানাথেরও ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল, উমাকে দেখিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল, কোথায় ছিলে এতক্ষণ? জ্বালাতন করলে! যাও, তোমার ছেলে নিয়ে যাও।

উমা ছেলে কোলে করিয়া বাহিরে ছাদের উপর আসিল।

অন্ধকার রাত্রির মাথার উপর লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র জ্বলিতেছে। উমা ছাদের উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছেলে শান্ত করিতে লাগিল। ছেলেকে বুকের উপর চাপিয়া বারংবার বলিতেছিল, কাঁদিস নি মানিক আমার, ধন আমার, আর কাঁদে না। আজকে আর দুধ পাবিনে—তোর সে দুধ দিয়ে দিইছি—একদিন দুধ না খেলে কি হয়? ওরে হিংসুটে, তবু কাঁদিস? তুই রোজ খাস, ওরা যে জন্মে কোন দিন দুধ খেতে পায় না—

চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, আঁচল দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া আবার বলিতে লাগিল, আ মরে যাই, মরে যাই, খোকনমণির কি হয়েছে! ও খোকা, মামার বাড়ি যাবি? মামা দেখবি? তুই ঘুমিয়েছিলি, দেখলিনে খোকা, তোর মামা এসেছিল। কেমন সুন্দর টুকটুকে মামা। দুধ-টুধ যা ছিল সব সে খেয়ে গেছে এক ফোঁটাও নেই। কান্না কেন ও আমার গোপাল, তুমি এখন ঘুমোও। আয় চাঁদ, আয়-আয়—খোকার কপালে টিক দিয়ে যা।

উমা আবার যখন ঘরে ফিরিয়া আসিল, রমানাথ বিছানায় উঠিয়া বসিয়া আলো ধরিয়া ছারপোকা মারিতেছে। কহিল, নতুন হিম পড়ছে, অমনি করে এখন বাইরে বাইরে ঘোরে!

যেন কে কাহাকে কহিতেছে, উমা যেন ঘরে নাই। ঘুমন্ত ছেলে কোল হইতে নামাইয়া সে আস্তে আস্তে শোয়াইয়া দিল।

রমানাথ কাছে আসিয়া উমার একখানি হাত ধরিয়া বলিল, রাগ করেছ উমা? ঘুমের ঘোরে কি বকেছি, আমার কিছু মনে নেই।

আর উমা চোখের জল ঠেকাইতে পারিল না, বর্ষার মধুমতী উমার চোখের কূলে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িল। রমানাথের কোলের উপর মাথা রাখিয়া উমা কাঁদিতে লাগিল, আর রমানাথ বিব্রত হইয়া তাহার চোখ মুছাইতে মুছাইতে বলিতে লাগিল, আমায় মাপ করো, মাপ করো উমা। অত কাঁদছ কেন? না, একেবারে পাগল তুমি!

কতক্ষণ পরে কাঁদিতে কাঁদিতে উমা বলিল, আমি উজ্জ্বলপুরে যাব। কতদিন যাইনি বলো তো। আমার বুঝি হারানকে মাকে দেখতে ইচ্ছা করে না!

রমানাথ বলিল—এই কথা? দাঁড়াও, কিস্তির মুখটা কেটে যাক, তারপর ছয় দাঁড়ের পানসি নিয়ে যাব—তুমি যাবে, আমি যাব, খোকা যাবে, মোক্ষদাও যাবে, আর কেঁদো না লক্ষ্মীটি—

যাত্রাওয়ালাদের ডাকিয়া আনিতে সত্যসত্যই অনেক রাত্রি হইয়া গেল, কিন্তু তাহাতে মোক্ষদার অপরাধ নাই। মোক্ষদা গিয়া দেখিল, অশ্বত্থামা ইতিমধ্যে পোশাক ছাড়িয়া ফেলিয়া বেঞ্চে বসিয়া বিড়ি টানিতেছে, কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি রথিবৃন্দ দাড়ি-গোঁফ-সমন্বিত অবস্থাতেই বায়নার টাকার বখরা করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। অবশেষে অনেক কষ্টে হিসাব মিটিয়া প্রতিজনের ভাগে সাড়ে দশ আনা করিয়া পড়িল। দ্রোণাচার্য পয়সা গুণিয়া ট্যাকে বাঁধিলেন, তারপর ছোঁ মারিয়া অশ্বত্থামার মুখ হইতে বিড়িটি কাড়িয়া লইয়া টানিতে লাগিলেন। অধিকারী অমনি হাঁ-হাঁ করিয়া আসিল, অমন দাড়ি-পরা অবস্থায় বিড়ি খায় কখনো? পাঁচ সিকা দামের দাড়িটায় আগুন লাগিলে একেবারে সর্বনাশ হইয়া যাইবে যে!

বারোজনকে একত্র করিয়া গোছাইয়া বাড়ির ভিতর লইয়া যাইতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল।

আর সকলের খেসারি ডাল অবধি পৌঁছিয়া ইতি, কেবলমাত্র সৃষ্টিধরের পাতের কোলে দুধের বাটি আসিল। সে যে আজিকার আসরে অত্যুৎকৃষ্ট একটো করিয়া সকলকে বিমোহিত করিয়াছে এবং তজ্জন্য অন্তঃপুরে আহারের এই বিশেষ ব্যবস্থা, তাহাতে সৃষ্টিধরের সন্দেহমাত্র রহিল না।

ফার্স্ট বুক ও চিত্রাঙ্গদা

রামোত্তম রায় মহাশয়ের সেজ ছেলে ননী তিন বছরে তেরোখানা ফার্স্ট বুক ছিঁড়িল, কিন্তু ঘোড়ার গল্প ছাড়াইতে পারিল না।

ব্যাপারটা আর কোনোক্রমে অবহেলা করা চলে না। অতএব পশু মাস্টারের ডাক পড়িল।

পশুপতির নামডাক যেমন বেশি, দরও তেমনি কিছু বেশি। তা হউক। ছেলে আকাটমূর্খ হইয়া থাকে, সে জায়গায় দু-একটা টাকার কম-বেশি এমন কিছু বড় কথা নয়।

সাব্যস্ত হইল, আট টাকা মাহিনা, তা ছাড়া রায় মশায়ের বাড়িতেই পশুপতি খাইবে, থাকিবে। পড়াইতে হইবে ফার্স্ট বুক, শিশুশিক্ষা, সরল পাটিগণিত—সকালে একঘণ্টা, সন্ধ্যার পর দু ঘণ্টা মাত্র।

বাহিরবাড়ির কাছারিঘরের পাশে ছোট্ট সঙ্কীর্ণ ঘরখানিতে চুন ও সুরকি বোঝাই থাকিত, উহা পরিষ্কৃত হইয়া একপাশে পড়িল তক্তাপোশ আর এক-পাশে একটি টেবিল ও ছোট বেঞ্চি একখানি।

পড়াশুনা বিপুল বেগে আরম্ভ হইল।

লোকে যে বলে, পশু-মাস্টার গাধা পিটাইয়া ঘোড়া করিতে পারে—তাহা মোটেই মিথ্যা নয়। ছয় মাস না যাইতেই ননী শিশুশিক্ষা ছাড়াইয়া বোধোদয় ধরিল, পাটিগণিতের ত্রৈরাশিক শুরু হইয়া গিয়াছে, ফার্স্ট বুকও শেষ হইবার বড় বেশি দেরি নাই।

আশ্বিন মাস। দেবীপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি।

অন্যান্য বার মহালয়ার সঙ্গেই ইস্কুল বন্ধ হইয়া যায়। এবার বছর বড় খারাপ, ছেলেরা মাহিনাপত্র মোটে দিতেছে না, তাই দেরি পড়িয়া যাইতেছে।

সকাল হইতে আকাশ মেঘলা। স্নান সম্বন্ধে বারোমাসই পশুপতি একটু বেশি সাবধান হইয়া চলে, এমন বাদলার দিনে তো আরোই। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া ইস্কুলের পথে পা বাড়াইয়াছে, এমন সময়ে পিওন একখানা চিঠি দিয়া গেল।

খামের চিঠি হইলে কি হয়. ইস্কুলমাস্টারের নামে আসিয়াছে—অতএব

ভিতরে এমন কিছু থাকিতে পারে না, যাহা না পড়া পর্যন্ত প্রাণ আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতে থাকে। এমনই আঁকাবাঁকা অক্ষরে ঠিকানা-লেখা খাম পশুপতির নামে বহুকাল ধরিয়া আসিতেছে। বিবাহের পর প্রথম বছর তিন-চারের কথা ছাড়িয়া দিলে পরবর্তী সকল চিঠির সুর একটিমাত্র। খাম না ছিঁড়িয়া পত্রের মর্ম স্বচ্ছন্দে আগে হইতে বলিয়া দেওয়া যায়, প্রভাসিনী সংসার-খরচের টাকা চাহিয়াছে।

ইস্কুলে গিয়া স্থির হইয়া বসিতে না বসিতে ঘণ্টা বাজিল।

প্রথমে অঙ্কের ক্লাস। ক্লাসে ঢুকিয়াই প্রকাণ্ড একটা জটিল ভগ্নাংশ বোর্ডে লিখিয়া পশুপতি হুঙ্কার দিল—খাতা বের কর—টুকে নে। বলাটা অধিকন্তু, সকল ছেলে ইহা জানে এবং প্রস্তুত হইয়াই ছিল। তারপর বোর্ডের উপর নক্ষত্রগতিতে অঙ্কের ঘোড়দৌড় আরম্ভ হইল। পশুপতি কষিয়া যাইতেছে, মুছিতেছে, আবার কষিতেছে। জোর-কদমে-চলা ঘোড়ার খুরের মতো খটাখট ক্রমাগত খড়ির আওয়াজ, তা ছাড়া সমস্ত ক্লাস নিস্তব্ধ। ক্লাসের মধ্যে যেন কোনো ছেলে নাই, কিংবা থাকিলেও হয়তো একেবারে মরিয়া আছে। প্রকাণ্ড খড়ির তাল দেখিতে দেখিতে জ্যামিতিক বিন্দুতে পরিণত হইয়া গেল। ছেলেরা একটা অঙ্কের মাঝামাঝি লিখিতে লিখিতে তাকাইয়া দেখে কোন্ ফাঁকে সেটা শেষ হইয়া আর-একটি শুরু হইয়াছে; দ্বিতীয়টি না লিখিতে সেটা মুছিয়া তৃতীয় একটা আরম্ভ হয় এবং সেটা ধরিবার উপক্রম করিতে করিতে পরেরটি শেষ হইয়া যায়। গায়ে তাহার নীল খদ্দরের জামা। ইহারই মধ্যে যখন একটু ফাঁক পায়, পকেট হইতে নস্যের শামুক বাহির করিয়া এক টিপ নাকে গুঁজিয়া দেয়, তারপর নাকের বাহিরের নস্য ঝাড়িয়া হাতখানা জামার উপর ঘসিয়া সাফ করিয়া আরম্ভ করে—শেষ হল? ফের দিচ্ছি আর গোটা আষ্টেক।

এমনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। লোকের মুখে পশু-মাস্টারের এত নামডাক শুধু শুধু হয় নাই, সে তিলার্ধ ফাঁকি দেয় না।

চারিটা ক্লাস পড়াইবার পর টিফিনের ঘণ্টা বাজিলে পশুপতি বাহির হইয়া আসিল। তখন নস্য ও খড়ির গুঁড়ায় জামার নীল রঙ ধূসর হইয়া গিয়াছে।

সিঁড়ির নিচে জানলাবিহীন ঘরখানিতে ক্লাস বসানো যায় না। ইনস্পেক্টর মানা করিয়া গিয়াছে, সেখানে বসিলে ছেলেদের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যাইবে। সেইটি মাস্টারদের বসিবার ঘর। ইতিমধ্যেই সকলে আসিয়া জুটিয়াছেন। হুঁকা গোটা পাঁচ-সাত—কোনোটার গলায় কড়ি-বাঁধা, কোনোটায় কেবলমাত্র

রাঙা সুতা, একটির নলচের উপর আবার ছুরি দিয়া গর্ত করিয়া লেখা হইয়াছে 'মা' অর্থাৎ মাহিষ্যের হুঁকা। নিজ নিজ জাতি বিবেচনা করিয়া মাস্টাররা উহার এক-একটি তুলিয়া লইলেন। যাঁহাদের ভাগ্যে হুঁকা জোটে নাই, তাঁহারা অনুকল্পে বিড়ি ধরাইলেন। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ছোট ঘরখানি অন্ধকার। রসালাপ ও প্রচণ্ড হাসি ক্রমশ জমিয়া আসিল। ক্ষণে ক্ষণে আশঙ্কা হয়, বুঝি-বা অত আনন্দের ধাক্কা সহিতে না পারিয়া বহুকালের পুরানো ছাদ ভাঙিয়া-চুরিয়া সকলের ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে।

কিন্তু ইস্কুলের জন্মকাল হইতে এমনি আটত্রিশ বছর চলিয়া আসিতেছে, ছাদ ভাঙিয়া পড়ে নাই।

উহারই মধ্যে একটা কোণে বসিয়া পশুপতি খামখানা খুলিল। খুলিতেই আসল চিঠিখানা ছাড়া আর-এক টুকরা কাগজ উড়িয়া মেঝেয় গিয়া পড়িল। তুলিয়া দেখে—অবাক কাণ্ড! ইহা হইল কি করিয়া?

এই সেদিন মাত্র সে খোকাকে ধরিয়া ধরিয়া অ আ লিখাইয়া বাড়ি হইতে আসিয়াছে, এরই মধ্যে ছেলে নিজের হাতে পত্র লিখিয়াছে। কাহাকে দিয়া কাগজের উপর পেন্সিলের দাগ কাটিয়া লইয়াছে, সেই ফাঁকের মধ্যে বড় বড় করিয়া লিখিয়াছে—

বাবা, আমি পড়িতে ও লিখিতে শিখিয়াছি। ছবির বই আনিবে।

ইতি।—কমল।

একবার, দুইবার, তিনবার সে পড়িল। লেখা যেমনই হউক, অক্ষরের ছাঁদ কিন্তু বেশ। বড় হইলে খোকার হাতের লেখা ভারি সুন্দর হইবে। পশুপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। এই ছেলে আবার বড় হইবে, তাহার দুঃখ ঘুচাইবে, বিশ্বাস তো হয় না! পর পর আরও তিনটি এমনি বয়সে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে।···ভাবিতে ভাবিতে সে কেমন একটু উন্মনা হইয়া পড়িল।

পরক্ষণে খোকার চিঠি খামে পুরিয়া বাহির করিল প্রভাসিনী যেখানা লিখিয়াছে।

ছোট ছোট অক্ষরের সারি চলিয়াছে যেন সারবন্দী পিপীলিকা। বিস্তর দরকারি কথা—সাংসারিক অনটন, ধানচালের বাজার-দর, গোয়ালের ফুটা চাল দিয়া জল পড়িতেছে, তারিণী মুখুজ্জে বাস্তুভিটার খাজনার জন্য রোজ একবার তাগাদা করিয়া যায়—ইত্যাদি সমাপ্ত করিয়া শেষকালে আসিয়া ঠেকিয়াছে কয়েকটি অত্যাবশ্যক জিনিসের ফর্দ—ছুটিতে বাড়ি যাইবার মুখে খুলনা হইতে অতি অবশ্য অবশ্য সেগুলি কিনিয়া লইয়া যাইতে হইবে, ভুল না হয়।

পশুপতি ফর্দখানির উপর আর একবার চোখ বুলাইল, তারপর পকেট হইতে পেন্সিল লইয়া পাশে পাশে দাম ধরিতে লাগিল।

কি ভাগ্য যে এতক্ষণ এদিকে কাহারও নজর পড়ে নাই। এইবার রসিক পণ্ডিত দেখিতে পাইল এবং ইশারা করিয়া সকলকে কাণ্ডটা দেখাইল। তারপর হঠাৎ ভারি ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিল—পশুভায়া, করেছ কি? হাটের মধ্যে প্রেমপত্তোর বের করতে হয়? ঢাকো—শিগগির ঢাকো, সব দেখে নিল।

পশুপতি আপনার মনে ছিল, তাড়াতাড়ি চিঠি চাপা দিয়া মুখ তুলিল।

হাসি চাপিয়া অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো রসিক কহিল—ঐ নকুড়চন্দোর বাবুর কাণ্ড, আড়চোখে দেখেছিলেন।

নকুড়চন্দ্র বসিয়াছিলেন ঘরের বিপরীত কোণে। বুড়ামানুষ, কাহারও স্ত্রীর চিঠি চুরি করিয়া দেখিবার বয়স তাঁহার নাই। পশুপতি বুঝিল, ইহাদের সুদৃষ্টি যখন পড়িয়াছে এখানে বসিয়া আর কিছু হইবে না। উঠিয়া পড়িল।

মন্মথ গরাই অত্যন্ত সহানুভূতি দেখাইয়া বলিল—মিছে কথা পশুপতিবাবু, কেউ দেখছে না। আপনি বসুন, বসুন। পণ্ডিত মশায়ের অন্যায়, ভদ্রলোকের পাঠে বাধা দিলেন। আপনি এই আমার পাশে এসে বসুন। গিন্নি কি পাঠ দিয়েছেন সেইটে একবার পড়ে শোনাতে হবে কিন্তু—

পশুপতি কোনোদিন এইসব রসিকতায় যোগ দেয় না। আজ তাহার কি হইয়াছে, বলিল—এই কথা? তা শুনুন না—বলিয়া চিঠির উপর দৃষ্টি দিয়া মিছামিছি বলিতে লাগিল—প্রাণবল্লভ, প্রাণেশ্বর, হৃদয়রঞ্জন, আর সব ও-পাতায় আছে। হল তো? পথ ছাড়ুন মন্মথবাবু। বলিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

রসিক কহিতে লাগিল—দেখলে? তোমরা তর্ক করতে, পশুপতি হাসতে জানে না—দেখলে তো? অন্য দিন বাড়ির চিঠি পেলে মাথায় হাত দিয়ে বসে, আজ যেন নবযৌবন পেয়েছে। ওহে মন্মথ, আজকের চিঠিতে কি আছে একবার দেখতে পার চুরি-চামারি করে?

ঘরের বাহির হইয়াই কিন্তু পশুপতির হাসি নিবিয়া গিয়া ভাবনা ধরিল—পাচ টাকা দু আনার মধ্যে প্রভাসিনীর শাড়ি, খোকার জামা, জিরামরিচ, পানে খাইবার চুন দু-সের, এক কৌটা বার্লি, বালতি এবং ছবির বই—এতগুলি কি করিয়া কুলাইয়া উঠে?

তখন ছেলের দল হাসিয়া খেলিয়া চেঁচাইয়া লাফাইয়া ইস্কুলের উঠানটি মাত করিয়া ফেলিয়াছে। পশু-মাস্টারকে দেখিয়া সকলে সন্ত্রস্তভাবে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল।

কিন্তু পশুপতির কোনো দিকে নজর নাই, সে ভাবিতেছে—

ইস্কুলে পঁচিশ টাকা বলিয়া তাহাকে সহি করিতে হয়, কিন্তু আসল মাহিনা পনরো টাকা। চিঠিতে ঐ যে তারিণী মুখুজ্জের তাগাদার কথা লিখিয়াছে, এবার বাড়ি গেলে মুখুজ্জের খাজনা অন্তত টাকা তিন-চার না দিলে রক্ষা নাই। আবার অগ্রহায়ণে নূতন ধান-চাল উঠিবে, চাষীদের সহিত ঠিকঠাক করিয়া এখনই অগ্রিম কিছু দিয়া আসিতে হইবে, না হইলে পরে দেখিয়া শুনিয়া কে কিনিয়া দিবে? অতএব ইস্কুলের মাহিনার এক পয়সা খরচ করিলে হইবে না। ভরসা কেবল রামোত্তমের বাড়ির আটটি টাকা। তাহা হইতে বাড়ি যাইবার রেল-স্টীমারের ভাড়া দুই টাকা চৌদ্দ আনা বাদ দিলে দাঁড়ায় পাঁচ টাকা দু আনা। সমস্ত পূজার বাজার ঐ পাঁচ টাকা দু আনার মধ্যে।

হেডমাস্টার কোনো দিক দিয়া হঠাৎ কাছে আসিয়া ফিস-ফিস করিয়া কহিলেন—সেক্রেটারির অর্ডার এসেছে, বন্ধ শনিবারে। ছেলেদের এখন কিছু বলবেন না, খালি ভয় দেখাবেন—কালকের মধ্যে যদি মাইনে সব শোধ না করে তবে একদম ছুটি হবে না। মাইনেপত্তোর আদায় যদি না হয়, বুঝতে পারছেন তো?

ছুটির পর পশুপতি ও বুড়া নকুড়চন্দ্র পাকা-রাস্তার পথ ধরিল। নকুড় কহিলেন—বন্ধ তা হলে শনিবারে ঠিক? শনিবারেই রওনা হচ্ছ পশুবাবু?

সে কথার জবাব না দিয়া পশুপতি জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা নকুড়বাবু, ছবির বই একখানার দাম কত?

—কি বই তা বলো আগে। ছবির বই কি একরকম?—দু টাকার তিন টাকার আছে, আবার বিনি-পয়সাতেও হয়।

পশুপতি কাছে আসিয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—বিনি-পয়সায় কি রকম? বিনি-পয়সায় ছবির বই দেয় নাকি? কি বই?

নকুড় কহিলেন—ক্যাটালগ। ছেলে-ভুলানো ব্যাপার তো! একখানা কবিরাজি ক্যাটালগ নিয়ে যেও। এই ধরো, হাঁপানি-সংহারক তৈল—পাশে দিব্যি ছবি, একটা লোক ধুঁকছে—কোলের উপর বালিশ—বউ তেল মালিশ করছে। ছেলেকে দেখিয়ে দিও।

যুক্তি পশুপতির পছন্দ হইল না, হাসি পাইল। কমলকে দেখেন নাই তো! সে যে বানান করিয়া করিয়া পড়িতে শিখিয়াছে, তাহার কাছে চালাকি চলিবে না।

কহিল—না, তাতে কাজ নেই—একখানা ছবির বই, সত্যি-সত্যি ছবির বইয়ের দাম কত পড়বে? দু টাকা তিন টাকা ও-সব বড়মানুষি কথা ছেড়ে দিন, খুব কমের মধ্যে—যার কমে আর হয় না, কত লাগবে?

নকুড় কহিলেন—বোধ হয় গণ্ডা চারেক পয়সা নেবে, কিনি নি কখনও। মাস্টারির পয়সা—মুখে-রক্ত-ওঠানো পয়সা—ও রকম বাজে খরচ করলে চলে?

পশুপতি তখন ফর্দ বাহির করিয়া আর একবার পড়িতে পড়িতে জিজ্ঞাসা করিল—আর, পাথুরে চুন দু সের?

নকুড় কহিলেন—তিন আনা।

এবারে নকুড়ের হাতে কমলের চিঠিটুকু দিল। কহিল—মজাটা দেখুন মশাই, ছেলে আবার চিঠি লিখেছে—ফরমায়েশটা দেখুন পড়ে একবার। বলিয়া হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল। তারপর বড় ফর্দখানি দেখাইয়া বলিল—বড় সমস্যায় পড়েছি, একটা সৎযুক্তি দিন তো নকুড়বাবু। পুঁজি মোটে পাঁচ টাকা দু আনা—ফর্দের কোন কোনটা বাদ দি?

দেখি—বলিয়া নকুড় চশমা বাহির করিয়া নাকের উপর পরিলেন। তার-পর বিশেষ প্রণিধান করিয়া বলিলেন—ছেলেপিলের ঘর, দুধ মেলে না বোধ হয়—তাই বার্লির কথা লিখেছে. ওটা নিয়ে যেও। তা জিরেমরিচ চুন-টুন সব বাদ দাও। ছবির বই পয়সা দিয়ে কিনে কি হবে? যা বললাম, পার তো একখানা ক্যাটালগ নিয়ে যেও। তোমরা বোঝ না—ছেলেপিলে যখন আবদার করে মোটে আশকারা দিতে নেই। তাদের শিখিয়ে দিতে হয়, এক আধলাও যাতে বাজে খরচ না করে! গোড়া থেকে মিতব্যয়িতা শিখুক, তবে তো মানুষ হবে!

মনে কেমন কেমন লাগে বটে, কিন্তু মোটের উপর নকুড়ের কথাটা ঠিক। পশুপতির স্মরণ হইল, সে-ও ক্লাসের একখানি বাংলা বহিতে সেদিন পড়াইতে-ছিল—'অপব্যয় না করিলে অভাব হয় না। হে শিশুগণ, তোমরা মিতব্যয়ী হইতে অভ্যাস করিবে। তাহা হইলে জীবনে কদাপি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না।' এমনি অনেক ভালো ভালো কথা।

ছবির বই, জিরামরিচ ও চুন কিনিয়া কাজ নাই তবে, বালতি, বার্লি ও কাপড়-জামা কিনিয়া লইলেই চলিবে।

নকুড় কহিতে লাগিলেন—তিল কুড়িয়ে তাল। হিসেব করে দেখো তো ভায়া, ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত আমরা কত পয়সা অপব্যয় করেছি। সেইগুলি যদি জমানো থাকত তবে আজ দুঃখ কিসের? বাঙালি জাত দুঃখ পায় কি সাধে?

পশুপতি আর কথা না কহিয়া ভাবিতে ভাবিতে চলিল।

গ্রামের মধ্যে কয়েক বাড়ি দেবীর ঘটস্থাপনা হইয়াছে। বড় মধুর সানাই বাজিতেছে। পশুপতির কানে নূতন লাগিল—এমন বাজনা সে অনেক দিন শোনে নাই।

হঠাৎ সে হাসিয়া উঠিল, বলিল—কথা যা বললেন নকুড়বাবু, ঠিক কথা! আমরা কি হিসেব করে চলি? আমাকে আজ দেখছেন এই রকম—শখ করে আমিই একবার একখানা বই কিনি—সে-ও একরকম ছবির বই, ইস্কুল কলেজে পড়ায় না। দাম পাঁচ টাকা পুরো।

নকুড় শিহরিয়া উঠিলেন—পাঁচ টাকার বাজে বই, বল কি?

—হুঁ, পাঁচ টাকা। তখন কি আমার এই দশা? বাবা বেঁচে। পায়ে পাম্প-শু, মাথায় টেড়ি। কলকাতায় বোর্ডিংয়ে থেকে পড়তাম। মাসে মাসে টাকা আসে। ফুর্তি কত! বইখানার নাম চিত্রাঙ্গদা—সেই যে অর্জুন আর চিত্রাঙ্গদা—পড়েন নি?

নকুড় কহিলেন—পড়ি নি আবার, কতবার পড়েছি। বলো যে মহাভারত। আজকাল সেই মহাভারত বিকুচ্ছে এগারো সিকেয়।

পশুপতি কহিল—মহাভারত নয়, তাহলেও বুঝতাম বই পড়ে পরকালের কিছু কাজ হবে। এমনি একখানা পদ্যের বই, পাতায় পাতায় ছবি। রাত-দিন তাই পড়ে পড়ে মুখস্থ করতাম। এখন একটা লাইনও মনে নেই।

পশুপতির নির্বুদ্ধিতার গল্প শুনিয়া নকুড় আর কথা বলিতে পারিলেন না। মহাভারত রামায়ণ নয়, মহামান্য ডিরেক্টর বাহাদুরের অনুমোদিত ইস্কুল-পাঠ্য বা কলেজের বই নয়, এমন বই লোকে পাঁচ টাকা দিয়া কিনিয়া পড়ে!

সেই-সব দিনের অবিবেচনার কথা ভাবিয়া পশুপতিরও অনুতাপ হইতেছিল। বলিল—তাও কি বইটা আছে? জানা নেই, শোনা নেই—পরস্য পর একটা মেয়ে—নির্বিচারে দামি বইটা তার হাতে তুলে দিলাম। কি বোকাই যে ছিলাম তখন! ও—আপনি তো এসে পড়েছেন একেবারে—আচ্ছা—

নকুড় বামদিকের বাঁশতলার সুঁড়িপথে নামিয়া পড়িলেন। সামনেই তাঁহার বাড়ি। কহিলেন—কাল আবার দেখা হবে। শিগগির শিগগির চলে যাও পশুবাবু, চারিদিকে থমথমা ছেয়ে আছে, বিষ্টি নামবে এক্ষুনি।

তখন সত্যসত্যই চারিদিক নিষ্কম্প, বাতাস আদৌ নাই, গাছের পাতাটি নড়িতেছে না। মাথার উপরে অতি-ব্যস্ত আকাশ মেঘের উপর মেঘ সাজাইয়া নিঃশব্দে আয়োজন পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে।

আজ পাঁচ টাকার মধ্যে সমস্ত পূজার বাজার সারিতে হইতেছে, আর বহু বৎসর পূর্বে একদিন ঐ দামের একখানি নূতন বই নিতান্ত শখ করিয়া বিসর্জন দিয়াছিল, একবিন্দু ক্ষোভ হয় নাই—চলিতে চলিতে কতকাল পরে পশুপতির সেই কথা মনে হইতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে সে বাড়ি ফিরিতেছিল, অন্তরভরা আশা ও উল্লাস, হাতে চিত্রাঙ্গদা।

বনগাঁর পর দু তিনটা স্টেশন ছাড়াইয়া—সে স্টেশনে ট্রেন থামিবার কথা নয়—তবু থামিল। ইঞ্জিনের কোথায় কি কল বিগড়াইয়া গিয়াছে। যাত্রীরা অনেকে নামিয়া পড়িল।

প্লাটফরমের উপর দক্ষিণ দিকটায় জোড়া পাকুড়গাছ ছায়া করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার গোড়ায় স্টেশনের মরিচা ধরা ওজনের কলটি। পাকুড়গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়া পা ছড়াইয়া কলটির উপর বসিয়া পশুপতি চিত্রাঙ্গদা খুলিয়া পড়িতে বসিল। লাইনের উপরে অনেক দূরে সূর্য অস্ত যায়-যায়। কুয়ায় কলসি ভরিয়া আ'লপথে গ্রামে ফিরিতে ফিরিতে বউ-ঝিরা তাকাইয়া তাকাইয়া রেলগাড়ি দেখিতেছিল।

পশুপতি একমনে পড়িয়া চলিয়াছে। ঠিক মনে নাই, বোধ করি অর্জুনের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার প্রথম পরিচয়ের মুখটা—খাসা জমিয়া উঠিয়াছে। এমন সময়ে সে অনুভব করিল, জোড়াগাছের পিছনে কেহ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেখানে চিত্রাঙ্গদার আসিবার তো সম্ভাবনা নাই। পশুপতি ভাবিল, হয় পানিপাড়ে কি পয়েন্টস্‌ম্যান, নয় তো ছাগলে গাছের পাতা খাইতে আসিয়াছে। অতএব না ফিরিয়া পাতা উলটাইতে যাইতেছে, এমন সময়ে কাচের চুড়ি বাজিয়া উঠিল।

তাকাইয়া দেখে, বছর আষ্টেকের একটি মেয়ে, মুখখানার চারিপাশে কালো কালো চুলগুলি ছড়াইয়া পড়িয়া আছে।

পশুপতি স্পষ্ট দেখিতে পাইল, মেয়েটির বড় বড় চোখ দুটির উপর লেখা রহিয়াছে সে ঐ পাতার ছবিগুলি ভালো করিয়া দেখিবে। আপিস-ঘরে টেলিগ্রাফের কল টক টক করিয়া বাজিয়া যাইতেছিল এবং লাইনের উপরে ইঞ্জিন একটানা শব্দ করিতেছিল- ইস্ স্ স্। আজ পশুপতি ভাবিতেছে, সে সব নিছক পাগলামি—সেদিন কিন্তু সত্যসত্যই তাহার মনের মধ্যে এরূপ একটা ভাবাবেশ জমিয়া আসিয়াছিল, যেন সুবিপুল ব্রহ্মাণ্ডও তাহার গতিবেগ থামাইয়া ম্লান অপরাহ্ণ-আলোয় মেয়েটির লুব্ধ ভীরু চোখ দুটিকে সমীহ করিয়া প্লাটফরমের ধারে চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

জিজ্ঞাসা করিল—খুকি, ছবি দেখবে? দেখো না কেমন খাসা খাসা সব ছবি।

অনুরোধের অপেক্ষামাত্র।

তৎক্ষণাৎ মেয়েটি সেই মরিচা-ধরা ওজন-যন্ত্রের উপর বিনাদ্বিধায় পশুপতির পাশে বসিয়া পড়িল।

পশুপতি ছবির মানে বলিয়া দিতেছিল, সে নিজেও পশুপতির পাণ্ডিত্যের মর্যাদা না রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে বানান করিয়া পড়িতেছিল। এমন সময় ঘণ্টা দিল। ইঞ্জিন ঠিক হইয়াছে—এইবার ছাড়িবে। পশুপতির মনে হইল, অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি করিয়া ইঞ্জিন ঠিক হইয়া গেল। মেয়েটির মুখখানিও হঠাৎ কেমন হইয়া গেল—তাহার ছবি দেখা তখনও শেষ হয় নাই, সে কথা মোটে না ভাবিয়া রেলগাড়ি তার সুদীর্ঘ জঠরে ছবির বই সমেত মানুষটিকে লইয়া এখনি গুড়গুড় করিয়া বিলের মধ্য দিয়া দৌড়াইবে—বোধ করি এইরূপ ভাবনায়। বইখানি মুড়িয়া নিজেই সে পশুপতির হাতে দিল, কোনো কথা বলিল না।

পশুপতি সেই সময়ে করিয়া বসিল প্রকাণ্ড বে হিসাবি কাজ। সেই চিত্রাঙ্গদা তাহার ডুরে শাড়ির উপর রাখিয়া বলিল- এ বই তুমি রেখে দাও—ছবি দেখো, আর বড় হলে পড়ে দেখো—। নতন বই—প্রায় আনকোরা, পাঁচ-পাঁচটা টাকা দিয়া কিনিয়াছিল। কেবল নিজের নামটি ছাড়া কালির আঁচড় পড়ে নাই। কাহাকে দিল তাহার পরিচয়ও জানে না—হয়তো কোনো রেলবাবুর মেয়ে কিংবা যাত্রীদের কেহ, অথবা নিকটবর্তী গ্রামবাসিনীও হইতে পারে।

* * *

রামোত্তম রায়ের বাড়ি বড় রাস্তার ঠিক পাশেই। রোয়াকে উঠিয়া পশুপতি ডাকিল—ও ননী, এক গ্লাস জল দিয়ে যা তো বাবা।

ননী জল দিয়া গেল। তাকের উপরে কাগজের ঠোঙায় এক পয়সার করিয়া বাতাসা কেনা থাকে। তাহার দুইখানি গালের মধ্যে ফেলিয়া ঢক-ঢক করিয়া সমস্ত জল খাইয়া পরম পরিতৃপ্তিতে পশুপতি কহিল—আঃ।

ইহাই নিত্যকার বৈকালিক জলযোগ।

তারপর এক ছিলিম তামাক খাইয়া চোখ বুজিয়া সে অনেকক্ষণ বিছানার উপর পড়িয়া রহিল।

সন্ধ্যা হইতে-না-হইতে প্রবলবেগে বৃষ্টি আসিল, সঙ্গে সঙ্গে বাতাস। রোয়াকের গোড়া হইতে একেবারে বড়রাস্তা অবধি উঠানের উপর দুই সারি

সুপারিগাছ। গাছগুলি যেন মাথা ভাঙাভাঙি করিয়া মরিতেছে। জল গড়াইয়া উঠান ভাসাইয়া কলকল শব্দে রাস্তার নর্দমায় গিয়া পড়িতে লাগিল। কি মনে করিয়া পশুপতি তাড়াতাড়ি উঠিয়া জামার পকেট হইতে কমলের পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল।

ক্রমে চারিদিক আরও আঁধার করিয়া আসিল, আর নজর চলে না।

রাস্তার ঠিক ওপার হইতে ধানভরা সবুজ সুবিস্তীর্ণ বিলের আরম্ভ হইয়াছে, তাহার পরপারে অতি অস্পষ্ট খেজুর ও নারিকেল-বন। সেইদিকে চাহিয়া পশুপতির মনটা হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল। ঐ নারিকেলগাছের ছায়ায় গ্রামের মধ্যে চাষীদের ঘরবাড়ি। বৃষ্টি ও অন্ধকারে বাড়ি দেখা যাইতেছে না, অতি ক্ষীণ এক-একটা আলো কেবল নজরে পড়ে। গ্রামটি ছাড়াইলে তারপর হয়তো আবার বিল। এমনি কত গ্রাম, কত খালবিল, কত বারোবেঁকি, কচিপাতা ও নাম না জানা বড় বড় গাঙ পার হইয়া শেষকালে আসিবে তাহার গ্রামের পাশের পশর নদী। ভাঁটা সরিয়া গেলে আজকাল চরের উপর বাঁধের ধারে ধারে শরতের মেঘভাঙা রৌদ্রে সেখানে বড় বড় কুমির শুইয়া থাকে। বাবলাগাছে হলদে-পাখি ডাকে। কমল মিহি স্বরে অবিকল পাখির ডাকের নকল করিতে পারে—বউ সরবে কোট্, বউ—

এমন দুষ্ট হইয়াছে কমলটা।

তাহাদের গ্রামের ঘাটে স্টীমার আসিয়া লাগে সন্ধ্যার পর। ঘাটের কাছেই বাড়ি, অন্ধকার সাবেককালের আম-বাগান এবং নাটা ও বেতের ঝোপ জঙ্গলের মধ্য দিয়া সরু পথ। তাহারই ফাঁকে ফাঁকে জোনাকিপোকার মতো একটি অতিশয় ছোট্ট আলো দূরে—বহুদূরে—পশুপতির স্তিমিত দৃষ্টির অগ্রে ঐ যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—আলো ছোট হইলে কি হয়, পশুপতি স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। আচ্ছা, তাহাদের গ্রামেও কি এই রকম ঝড়-বৃষ্টি হইতেছে? এই রকম অন্ধকার আকাশ, মেঘের ডাক··· ? হয়তো এসব কিছুই নয়। হয়তো সেদেশে এখন আকাশভরা তারা এবং প্রভাসিনী এতক্ষণ রান্নার যোগাড় করিতে করিতে আলো লইয়া এঘর-ওঘর করিতেছে। আর চারদিন পরে পশুপতি সেই অপূর্ব শীতল ছায়াচ্ছন্ন উঠানে গিয়া দাঁড়াইবে। খোকা?—সোনামানিক খোকন তখন কি করিতেছে? পড়িতেছে বোধ হয়—

পশুপতি ভাবিতে লাগিল, সে যেন পশর নদীর পারে তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া উঠিয়াছে, কমল শোবার ঘরে প্রদীপের আলোয় পড়া মুখস্থ করিতেছিল, বাপের সাড়া পাইয়া উঠানের উপর দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিল। এমন

ছুটিতেছে, বুঝি-বা পড়িয়া যায়। আস্তে আয়, ওরে পাগলা একটু দেখেশুনে —অন্ধকারে হোঁচট খাবি, অত দৌড়ুস নি…

ঘনান্ধকার দুর্যোগের মধ্যে বহুদূর হইতে কমল আসিয়া যেন দুই হাত উঁচু করিয়া সিক্তদেহ অকালবৃদ্ধ ইস্কুল-মাস্টারের কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।…

রামোত্তম এতক্ষণ কাছারি-ঘরে কি কাজকর্ম করিতেছিলেন। এইবার বাড়ির মধ্যে চলিলেন। পশুপতিকে বলিলেন—মাস্টার মশায়, আপনিও চলুন—বাদলা-রাত্তিরে সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়ুন আর কি! এই বৃষ্টিতে আপনার ছাত্তোর আর আসবে না।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া পশুপতি সকাল সকাল শুইয়া পড়িল। আলো নিবাইয়া দিল।

শুইয়া শুইয়া শুনিতে লাগিল, ঝড় দালানের দেয়ালে যেন উন্মত্ত ঐরাবতের স্তায় ছুটিয়া আসিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িতেছে, রুদ্ধ দরজা-জানলা খড়খড় করিয়া ঝাঁকাইতেছে, আকাশ চিরিয়া মেঘের ডাক, ছাদের নল হইতে ছড়ছড় করিয়া জল পড়ার শব্দ · সমস্ত মিলিয়া ঝটিকাক্ষুব্ধ নিশীথিনীর একটানা অস্পষ্ট চাপা আর্তনাদের মতো শোনাইতেছে।

পশুপতি আরাম করিয়া কাঁথা টানিয়া গায়ে দিল।

সেই অবিরল বাতাস ও বৃষ্টিধ্বনির মধ্যে পশুপতি শুনিতে লাগিল, গুনগুন গুনগুন করিয়া কমল পড়া মুখস্থ করিতেছে। কণ্ঠ কখনও উচ্চে উঠিতেছে, কখনও ক্ষীণ—ক্ষীণতর—অস্ফুটতম হইয়া সুরের রেশটুকু মাত্র কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিতেছে—তন্দ্রা-ঘোরে আঁধার আমবাগানের মধ্য দিয়া বাড়িমুখো যাইতে যাইতে সে শুনিতে লাগিল। মনে হইল, ঘরের দাওয়ায় কাঁধের পুঁটুলি নামাইয়া সে যেন ডাকিতেছে—কই গো কোথায় সব?

খোকা আসিয়া সর্বাগ্রে পুঁটুলি লইয়া খুলিয়া ফেলিল। জিনিসপত্র একটা একটা করিয়া সরাইয়া রাখিতেছে, কি খুঁজিতেছে পশুপতি তাহা জানে। ম্লান-মুখে কমল প্রশ্ন করিল—বাবা, আমার ছবির বই?

পশুপতি উত্তর দিল—সোনামানিক আমার, বই তো আনতে পারি নি। অপব্যয় করতে নেই—বুঝলি খোকা, পয়সাকড়ি খুব বুঝেসুঝে খরচ করতে হয়। তাহলে পরে আর দুঃখ পাবি নে।

ছেলে ঠোঁট ফুলাইয়া সরিয়া বসিল। অবোধ বালকের অভিমানাহত মুখখানির স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে কতক্ষণ পরে পশু-মাস্টার ঘুমাইয়া পড়িল।

গভীর রাত্রিতে হঠাৎ জাগিয়া ধড়মড় করিয়া সে বিছানার উপর উঠিয়া

বসিল। প্রাণপণ বলে বারংবার কে যেন দ্বারে ধাক্কা দিতেছে। ঝড়ের বেগ আরও বাড়িয়াছে বুঝি! এ কী প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড, দরজা সত্য সত্যই চুরমার করিয়া ফেলিবে না কি?

অন্ধকার ঘর। পশুপতির বোধ হইল, বাহির হইতে কে যেন ডাকিয়া ডাকিয়া খুন হইতেছে—দুয়োর খুলুন—দুয়োর খুলুন—

তখনও ঘুমের ঘোর কাটে নাই। তাহার সর্বদেহ শিহরিয়া উঠিল। ঝটিকামথিত দুর্যোগ-আঁধার বর্ষা-নিশীথ। নির্জন সুখসুপ্ত গ্রামের একপাশে, দিগন্তবিসারী বিলের প্রান্তে রামোত্তম রায়ের বাহির-বাড়ির রোয়াকে দাঁড়াইয়া কে অমন আর্তকণ্ঠে বারংবার দরজা খুলিয়া দিতে বলে!

শিকলের ঝনঝনানি অতিশয় বাড়িয়া উঠিল। নিশ্চয় মানুষ। পশুপতি উঠিয়া খিল খুলিয়া দিতেই কবাট দুইখানি দড়াম করিয়া দেয়ালে লাগিল এবং ঝড়ের বেগেই যেন ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল একটি পুরুষ, পিছনে এক নারী।

মেয়েটির হাতের চুড়ি ঝিনমিন করিয়া ঈষৎ বাজিয়া উঠিল এবং কাপড়-চোপড় হইতে অতি কোমল মৃদু সুগন্ধ আসিয়া পশুপতি মাস্টারের ঘর ভরিয়া গেল।

পুরুষ লোকটি আগাইয়া আসিতে গিয়া তক্তাপোশে ঘা খাইল। পশুপতি কহিল—দাঁড়ান, আলো জ্বালি।

হেরিকেন জ্বালিয়া দেখে, স্বাস্থ্য ও যৌবন-লাবণ্যে দুজনেই ঝলমল করিতেছে। মেয়েটি ঘরের মধ্যে আসে নাই, চৌকাঠের ওধারে ছাদের নলের নিচে দাঁড়াইয়া পরম শান্তভাবে ভিজিতেছিল, মুখভরা হাসি। দেখিয়া যুবক ব্যস্ত হইয়া কহিল—অ্যাঁ—ও কি হচ্ছে লীলা, এ কি পাগলামি তোমার? ইচ্ছে করে ভিজছ দুপুর রাত্রে?

সেখান হইতে সরিয়া আসিয়া বধূ মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

যুবক আরও চটিয়া কহিল—বড্ড ফুর্তি—না? এই সেদিন অসুখ থেকে উঠলে, আমি যত মানা করি তুমি মজা পেয়ে যাও যেন।

আঙুল তুলিয়া লীলা চুপি-চুপি তর্জন করিয়া কহিল—বাবারে বাবা, তোমার শাসনের জ্বালায় যাই কোথায়? সেই তো কাপড় ছাড়তে হবে, তা একটুখানি নেয়ে নিলাম—বলিয়া আঁচল তুলিয়া মুখে দিল, বোধকরি তাহার হাসি পশুপতি দেখিতে না পায় সেইজন্য।

যাক গে—আর একটা কথাও বলব না, মরে গেলেও না—বলিয়া যুবক গুম হইয়া রহিল। পরক্ষণে বাহিরে মুখ বাড়াইয়া ডাকিল—তুই কতক্ষণ ট্রাঙ্ক ঘাড়ে করে ভিজবি, এখানে এনে রাখ্।

উহাদের চাকর এতক্ষণ বাক্স মাথায় দিয়া রোয়াকের কোণে দাঁড়াইয়া ছিল, ঘরের মধ্যে আসিয়া বাক্স নামাইয়া দিল।

যুবক কহিল—যদি ইচ্ছে হয় তবে দয়া করে বাক্সটা খুলে শিগগির ভিজে কাপড়চোপড়গুলো বদলানো হোক, আর ইচ্ছে যদি না হয় তবে এক্ষুনি ফিরে মোটরে যাওয়া যাক। আমি আর কাউকে কিছু বলছি নে।

মেয়েটির হাসিমুখ আঁধার হইল, হেঁট হইয়া বাক্স খুলিতে লাগিল।

কাণ্ড দেখিয়া পশুপতি একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ এত রাত্রে এই তরুণ দম্পতি কোথা হইতে আসিল এবং আসিয়া নিঃসঙ্কোচে পশুপতির ঘরের ভিতর ঢুকিয়াই অমনি রাগারাগি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এতক্ষণ ইহাদের মধ্যে কথা বলিবার ফাঁকই পাইতেছিল না, এইবার বলিল—আপনারা তবে কাপড় ছাড়ুন, আমি লোকটাকে নিয়ে কাছারিঘরে বসি গে।

যুবক যেন এইমাত্র পশুপতিকে দেখিতে পাইল। কহিল—কাপড়টা ছেড়ে আমিও যাচ্ছি। বড্ড কষ্ট দিলাম আপনাকে। আমি এ বাড়িতে আরও অনেকবার এসেছি, রামোত্তমবাবু আমার পিসেমশাই হন। আপনাকে এর আগে দেখি নি। একটু আলাপ টালাপ করব- তা মশায়, কাণ্ডটা দেখলেন তো? সেদিন অসুখ থেকে উঠেছে, কচি খুকি নয়—একটু যদি বুদ্ধি-জ্ঞান থাকে! একেবারে আস্ত পাগল।

লীলা মুখ রাঙা করিয়া একবার স্বামীর দিকে তাকাইল। তারপর রাগ করিয়া খুব জোরে জোরে ট্রাঙ্ক হইতে কাপড়চোপড় নামাইয়া ছড়াইয়া মেজেয় রাখিতে লাগিল। কাপড়ের সঙ্গে আতরের শিশি ঠক করিয়া পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল।

পশুপতি ও চাকরটি ততক্ষণে কাছারিঘরে গিয়া বসিয়াছে।

যুবক কহিল—গেছে তো? তক্ষুনি জানি। আস্ত শিশিটা—এক ফোঁটাও খরচ হয় নি।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে লীলা কহিল—আর বোকো না, তোমার আতর আমি কিনে দেব কালই। তারপর কথা যেন কান্নায় ভিজিয়া আসিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—অজানা জায়গায় এসে লোকজনের সামনে কেবল বকাবকি—কেন? কিসের এত? আমি বিষ্টি লাগাব, খুব করব, অসুখ করে যাই মরে যাব- তোমার কি?

পাশাপাশি দুটি ঘর। কলহের প্রতি কথাটি পশুপতির কানে যাইতেছিল।

স্বামী উত্তর করিল—আমার আর কি—আমি তো কারও কেউ নই। ঘাট হয়েছে—আর কোনোদিন কিছু বলব না।

কিছুক্ষণ আর কথাবার্তা নাই। খুটখাট আওয়াজ, বাক্সর ভিতরের জিনিসপত্র নাড়াচাড়া হইতেছে।

লীলা বলিতে লাগিল—মোটরের হুড উড়িয়ে যে ভিজিয়ে দিয়ে গেল তাতে কিছু দোষ হয় না, আর আমি একটুখানি বাইরে দাঁড়িয়েছি অমনি কত কথা—আস্ত পাগল—হেনোতেনো—কেন, কি জন্যে বলবে?

অন্য পক্ষের সাড়া নাই।

পুনরায় বধূর কণ্ঠস্বর—ভিজতে আমার বড্ড আরাম লাগে। ছেলেবেলা এই নিয়ে মার কাছে কত বকুনি খেয়েছি। তা বকবে যদি তুমি আমায় আড়ালে বকলে না কেন? অজানা অচেনা কোথাকার কে-একজন তার সামনে···ওগো, তুমি কথা বলবে না আমার সঙ্গে?

স্বামী বলিল—না, বলব না তো। কেউ মরলে আমার কিছু আসে যায় না যখন—বেশ তো—আমি যখন পর।—

বধূ কহিল—কতদিন তো সাবধান হয়ে আছি। ছড়ছড় করে জল পড়ছে দেখে আজকে হঠাৎ কেমন ইচ্ছে হল। আমি আর করব না—কোনোদিনও না। ওগো, তুমি আমায় মাপ করো- সত্যি করব না।

স্বামীর কণ্ঠ অভিমানে কাঁপিতে লাগিল, বলিল—কথায় কথায় তুমি মরতে চাও—কেন? কি জন্যে? আমি কি করেছি তোমার?

বধূ কহিল—না, মরব না।

—দিব্যি করো গা ছুঁয়ে যে কক্ষনো না—কোনোদিনও না—

স্বামীকে খুশি করিতে বধূ দিব্য করিল, সে কোনোদিন মরিবে না।

আরও খানিকক্ষণ পরে যুবক কাছারিঘরে ঢুকিল। পশুপতি কহিল—হয়ে গেছে? এবার চলুন বাড়ির মধ্যে, আমি আলো দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

যুবক কহিল—আজ্ঞে না। এক্ষুনি চলে যাব। সকালে পিসেমশাইকে বলবেন, জাগুলগাছির সুরেশ এসেছিল। থাকলাম না বলে চটে যাবেন—

পশুপতি কহিল—তবে আর কি। আত্মীয়ের বাড়ি এসে পড়েছেন যখন দয়া করে—

সুরেশ বলিল—দয়া করে নয় মশায়, দায়ে পড়ে। ফাল্গুন মাসে ওর টাইফয়েড হয়, একত্রিশ দিন যমে-মানুষে টানাটানি করে কোনো গতিকে প্রাণটুকু নিয়ে চেঞ্জে পালিয়েছিলাম। সেই গেছলাম আর আজ এই ফিরছি। স্টেশনে নেমে বিষ্টি-বাদলা দেখে বললাম— কাজ নেই লীলা, রাতটুকু ওয়েটিং-

কমে কাটানো যাক। তা একেবারে নাছোড়বান্দা—বলে, মোটরে হুড দেওয়া রয়েছে—এক ফোঁটা জল গায়ে লাগবে না. ঝড়-বাতাসের মধ্যে ছুটতে খুব আমোদ লাগে। শুনেছেন কখনও মশায়, ভূ-ভারতে এমন ধারা? এদেশের ট্যাক্সি—ফাঁকা মাঠের মধ্যে এসে বাতাসে হুড গেল উলটে। ভিজে একেবারে জবজবে। এখানে উঠতে কি চায়? ভিজে কাপড় বদলাতে একরকম জেদ করে নিয়ে এলাম।

পশুপতি কহিল—বেশ তো, ওঁদের সঙ্গে দেখা-টেখা করে অন্তত রাতটুকু কাটিয়ে কাল সকালেই চলে যাবেন।

সুরেশ বলিল—বলছেন কাকে? ওদিকে একেবারে তৈরি। এরই মধ্যে দু-দুবার দরজার উপর ঠকঠক হয়ে গেছে—শোনেন নি? বিষ্টি বোধ হয় ধরে গেল এইবার। আচ্ছা নমস্কার। খুব বিব্রত করে গেলাম—

তরুণ-তরুণী পাশাপাশি গুঞ্জন করিতে করিতে এবং তাহাদের পিছনে চাকরটি ট্রাঙ্ক ঘাড়ে করিয়া রাস্তার উপরের মোটরে গিয়া উঠিল।

তারপরে সেই রাত্রে অনেকক্ষণ অবধি পশুপতি মাস্টার আর ঘুমাইতে পারিল না। ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, তারা উঠিয়াছে, আকাশ পরিষ্কার রমণীয়। শিশি ভাঙিয়া ঘরময় আতর ছড়াইয়া গিয়াছিল, তাহার উগ্র মধুর মাদক সুবাসে পশুপতির মাথার মধ্যে রিমঝিম করিয়া বাজনা বাজিতে লাগিল। এই ঘর তৈয়ারি হইবার পর বরাবর চুনসুরকি পড়িয়া ছিল, এই প্রথম আতর পড়িয়াছে এবং বোধকরি দুর্যোগের রাত্রে বিপন্ন তরুণ-দম্পতি কয়েক মুহূর্তের জন্য আসিয়া আতরের সহিত তাহাদের কলহের গুঞ্জন রাখিয়া গিয়াছে।

হেরিকেনটা তুলিয়া লইয়া পশুপতি প্রভাসিনীর চিঠিখানি গভীর মনোযোগের সহিত আর-একবার পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে সমস্ত অন্তর করুণায় ভরিয়া উঠিল। একটা সোহাগের কথা নাই, অথচ সমস্ত চিঠি ভরিয়া সংসারের প্রতি ও তাহাদের সন্তানের প্রতি কতখানি মমতা ছড়ানো রহিয়াছে! কোনোদিন সে এসব ভাবিয়া দেখে নাই।

জানালা খুলিয়া দিয়া অনেকক্ষণ একাগ্রে বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ভাবিতে ভাবিতে পশুপতির মন চলিয়া গেল আবার সেই বহুদূরবর্তী পশর নদীর পারে তাহার নিজের বাড়িতে...এবং সেখান হইতে চলিয়া গেল আরও দূরে, প্রায় বিশ বছরের ওপারে বিস্মৃতের দেশে—যেদিন প্রভাসিনীকে বিবাহ করিয়া গ্রামে ঢুকিয়া সর্বপ্রথমে ঠাকরুনতলায় জোড়ে প্রণাম করিয়াছিল

…তারপর কত নির্জন নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের মধুর স্মৃতি—ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যাকালে চুরি করিয়া চোখোচোখি—সুপ্তিমগ্ন জ্যোৎস্নারাত্রি জাগিয়া জাগিয়া কাটানো—ভোর হইলে বউকে তুলিয়া দিয়া নিজে আবার পাশ ফিরিয়া শোওয়া…

এখন আর সে-সব কথা কিছু মনে পড়ে না, পৃথিবীতে কিন্তু তেমনি দুপুর সন্ধ্যা ও রাত্রি আসিয়া থাকে ; পৃথিবীর লোক গান গায়, কবিতা পড়ে, প্রেয়সীর কানে ভালোবাসার কথা গুঞ্জন করে, আকাশে নক্ষত্র অচঞ্চল দীপ্তিতে ফুটিয়া থাকে, তারার আলোকে নারিকেল-পাতা ঝিলমিল করিয়া দোলে। পশুপতি সে সময় সংসারের অনটনের কথা ভাবে, জ্যামিতির আঁক কষে, নয় তো ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে জানলা আঁটিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

অকস্মাৎ তাহার বোধ হইল, চিত্রাঙ্গদার ভুলিয়া-যাওয়া লাইনগুলি তাহার যেন মনে পড়িতেছে। ছেলেমানুষের মতো মাথা দোলাইয়া দোলাইয়া সে গুনগুন করিতে লাগিল। এখনও ঠিক মনে পড়ে নাই… মনে হইল, এমনি করিয়া রাত্রি জাগিয়া আরো বহুক্ষণ অবধি যদি সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে পারে, সমস্ত কবিতাগুলি তাহার মনে পড়িয়া যাইবে।

তারপর হঠাৎ একটি অদ্ভুত রকমের বিশ্বাস তাহার মনে চাপিয়া বসিল। বহুকাল আগে একদিন স্টেশনে যে-মেয়েটির হাতে সচিত্র চিত্রাঙ্গদা তুলিয়া দিয়াছিল, সে-ই আজ আসিয়াছিল—এই বধূটি… লীলা, এই যেন সেই মুখ। ইহা যে কত অসম্ভব, সেই মেয়ে বাঁচিয়া থাকিলে এতদিনে নিশ্চিত তার যৌবন পার হইয়া গিয়াছে, এসব কথা পশুপতি একবারও ভাবিতে পারিল না। বারংবার তাহার মনে হইতে লাগিল, ট্রাঙ্কে এই বধূটির কাপড়চোপড় ছিল, সকলের নিচে ছিল সেই চিত্রাঙ্গদা—পাঁচ টাকা দামের। লীলা আতরের শিশি ভাঙিয়াছে, কে জানে হয়তো চিত্রাঙ্গদাও এই ঘরের মেজেয় ফেলিয়া গিয়াছে। খুঁজিয়া দেখিলে এখনই পাওয়া যাইবে—কিংবা থাকগে এখন খোঁজাখুঁজি, কাল সকালে…

পরদিন পশুপতির ঘুম ভাঙিতে বেলা হইয়া গেল। চোখ মেলিয়া দেখে ইতিমধ্যে ননী আসিয়াছে। বেঞ্চের উপর বসিয়া চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া সে ফার্স্ট বুকের পড়া তৈয়ারি করিতেছে—

> One night when the wind was high a small
> bird flew into my room…
>
> একদিন রাত্রিবেলা যখন বাতাস প্রবল হইয়াছিল, একটি ছোট
> পাখি আমার ঘরের মধ্যে উড়িয়া আসিয়াছিল…

শুনিতে শুনিতে পশুপতি আবার চোখ বুজিল। ঘরের মধ্যে উড়িয়া-আসা ছোট্ট একটি পাখির কল্পনা করিতে লাগিল। হঠাৎ মনে হইল, রোদ উঠিয়া গিয়াছে, পাখির ভাবনা ভাবিবার সময় আর নাই। এখনই হয়তো রাষোত্তম ছেলের পড়ার তদারক করিতে আসিবেন। উঠিয়া বসিয়া হুঙ্কার দিল—বানান করে করে পড়—

রা ত্রি র রো মা ন্স

বধূ ডাকিল—ঘুমুচ্ছ?

মনোময় পাশ ফিরিয়া শুইল এবং বলিল—উঁহু—

বধূ কহিল—বালিশ কোথায়? অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না তো! হ্যাঁগো, আমার বালিশ কোথায় লুকিয়ে রাখলে? না—এই যে পেয়েছি। বলিয়া আন্দাজি বালিশ খুঁজিয়া লইয়া তাহার উপর শুইয়া পড়িল। মনোময় বলিয়া উঠিল, আঃ ঘাড়ের উপর শুলে কেন? সরে গিয়ে জায়গায় শোও—

বধূ বলিল—সর্বনাশ! গায়ের উপর শুয়েছি নাকি? পিদ্দিমটা নিভে গেল, অন্ধকারে কিছু বুঝতে পারি নি। ভাগ্যিস কথা কইলে—

কিন্তু কথা যদি মোটে না-ই কহিত, তাহা হইলেও মনোময়ের অস্থিসার দেহটাকে তুলার বালিশ বলিয়া ভুল করা কাহারও উচিত নয়।

এবার শুইয়া পড়িয়া বধূ চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু কতক্ষণ! একা-একাই কথা চলিতে লাগিল।

—উঃ কী গরম! বৃষ্টি-বাদলার নাম-গন্ধ নেই, গরমে সিদ্ধ করে মারছে। তার উপর দু-দুটো উনুনে যেন রাবণের চিতে! সেই বেলা থাকতে রান্নাঘরে ঢুকেছি আর এখন বেরিয়ে আসা। ঘরে একটা জানলাও নেই···ওগো ও কর্তা,—ও ছোটবাবু, তোমরা রান্নাঘরে একটা জানলা করে দাও না কেন? এইবার করে দাও···বুঝলে?

তবু ছোটবাবু সাড়া দিল না। বোধকরি সে জানালা করিয়া দিবেই, তাই কথা কহিল না।

বধূর মুখের কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কয়টা মশা ভনভন করিয়া উঠিল। তবু যা হোক কথার দোসর জুটিল, ঐ মানুষটিকে আর ডাকিয়া ডাকিয়া খুন হইবার দরকার নাই। মশার সঙ্গেই আলাপ শুরু হইল।

—দাঁড়া, কাল তোদের জব্দ করছি। সন্ধ্যাবেলা নারকেলের খোসার আগুন করে আচ্ছা করে ধুনো দেব, দেখি ঘরে থাকিস কি করে?

খানিক জোরে জোরে পাখা করিতে লাগিল।

তারপর মনোময়ের গায়ে নাড়া দিয়া বলিল—ঘুমুচ্ছ কি করে? মশায় কামড়ায় না? সরে এসো একটু, মশারি ফেলি—

এখানে বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে ঘুম সম্বন্ধে মনোময়ের বিশেষপ্রকার নিপুণতা আছে। মশা ক্ষুদ্র প্রাণী, কামড়াইয়া কি করিবে? ঘুম যদি সত্য-সত্যই আসিয়া থাকে, সুন্দরবনের বাঘে কামড়াইলেও ভাঙিবে না।

বধূ মশারি ফেলিল। মনোময়ের পাশটা গুঁজিয়া দিবার জন্য গায়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। খাটের একেবারে কিনারা ঘেঁসিয়া শুইয়াছে মনোময়। বধূ তাহার হাতখানা সরাইয়া দিল, যেখানে সরাইয়া রাখিল, সেইখানেই এলাইয়া রহিল। পুনরায় তুলিয়া লইয়া সেই হাতখানা নিজের হাতের উপর রাখিল। তারপর মনোময়ের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—ঘুমুলে নাকি? ওগো শুনছ? এরি মধ্যে ঘুম।

মনোময় নড়িয়া চড়িয়া পাশবালিশটা টানিয়া লইয়া বলিল—ঘুম কোথায় দেখলে? বলো কি বলবে।

বধূ বলিল—এসো খানিক গল্প করি, এত সকাল-সকাল ঘুমোয় না—

মনোময় কহিল—করো।

—কালকে আমি গল্প বলেছি, আজ তোমার পালা। সেই রকম কথা ছিল না?

—হুঁ—

—তবে?

মনোময় বলিল—তা হোক, আজও তুমি বলো উষা। কালকের শেষটা শোনা হয় নি—ঘুম এসেছিল।

বধূর নাম উষা। বলিল—আজও তেমনি ঘুমুবে তো?

মনোময় কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল—কক্ষনো না—

উষা কহিল—কিন্তু এখনি তো ঘুমুতে আরম্ভ করেছ, ঐ যে দেখছি—

মনোময় বলিল—দেখতে পাচ্ছ? অন্ধকারে তোমার চোখ জ্বলে বুঝি—

উষা বলিল—জ্বলেই তো। সাত রাজার ধন মানিকের গল্প শোন নি—অজগর সাপ সেই মানিক মাথা থেকে নামিয়ে গোবরে লুকিয়ে রাখল, গোবর ফুঁড়েও তার আলো বেরোয়। তেমনি একজোড়া মানিক হচ্ছে আমার এই চোখ দুটো। চিনলে না তো!

মনোময় বলিল—কিন্তু মানিক ছাড়াও মেনি-বেড়ালের চোখ অন্ধকারে জলে, বিজ্ঞান-পাঠ পড়ে দেখো।

—কিন্তু এবার তো আর চোখ দিয়ে দেখা নয় মশায়, হাত দিয়ে ছোঁওয়া। অন্ধকারের মধ্যে উষা মনোময়ের চোখের উপর হাত বুলাইয়া দেখিল, উহা যথানিয়মে মুদ্রিত হইয়া আছে।

ভারি রাগিয়া গেল!

—বেশ, ঘুমোও—খুব করে ঘুমোও—আমি জ্বালাতন করব না। বলিয়া সরিয়া গিয়া উলটাদিকে মুখ করিয়া শুইল।

মনোময়ও সরিয়া আসিল, আসিয়া তাহার একখানা হাত ধরিল। বলিল —ফিরে শোও, অত রাগ করে না—এদিকে একবার ফিরেই দেখো, ঘুমিয়েছি কি না। ফিরবে না? আহা যদি কথা না বলো মাথা নাড়তে কি বাধা?

অপর পক্ষ নির্বিকার। যেন ঘুম পাইয়াছে, তেমনি গভীর নিশ্বাস পড়িতেছে। মনোময় বলিল—ঘুমুলে নাকি? ও উষা, ঘুমিয়ে পড়েছ? তারও পরীক্ষা আছে। সত্যিসত্যি যদি ঘুমিয়ে থাক 'হ্যাঁ'—বলে জবাব দাও।

এবার উষা কথা কহিল।

—খুব যা তা বুঝিয়ে যাচ্ছ!

মনোময় হাসিতে হাসিতে বলিল—কি?

—এই যে বললে, ঘুম এসে থাকলে আমি 'হ্যাঁ'—বলে উত্তর দেব। ঘুম এলে বুঝি জ্ঞান থাকে! ভাব, আমি বুঝি নে কিছু— আমি বোকা।

মনোময়ের দুর্গ্রহ। বলিয়া বসিল—বোকা নও তো কি! আমি বরাবর জেগেই আছি—তুমি চোখে হাত দিয়ে বললে, আমার চোখ বোজা। খোলা চোখে হাত দিলে বুজে যায় না কার? নিজের চোখে হাত দিয়ে দেখো না। আর, এই নিয়ে তুমি মিছামিছি রাগারাগি করলে—

উষাকে বোকা বলিলে খেপিয়া যায়। বলিল—আমি বোকা আছি, বেশ আছি—তোমার কি? বলিয়া জানালার ধারে একেবারে খাটের শেষপ্রান্তে চলিয়া গেল এবং তাহার ও মনোময়ের মধ্যেকার ফাঁকটুকুতে দুমদুম করিয়া দুইটা পাশবালিশ ফেলিয়া দিল।

মনোময় হতাশভাবে বলিল, তা বেশ! মাঝে একেবারে ডবল পাঁচিল তুলে দিলে···

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল—বেশ, আমার দোষ নেই—এবার নিশ্চিন্তে ঘুমোনো যাক।

যা বলিল তাই। হাই তুলিয়া সত্য-সত্যই পাশ ফিরিয়া শুইল।

তা হোক! উষাও পড়িয়া থাকিতে জানে। দুইজনে চুপচাপ। যদি কেহ দেখিতে পাইত, ঠিক ভাবিত উহারা নিঃসাড়ে ঘুমাইতেছে।

খানিক পরে উষা উসখুস করিতে লাগিল। এমনও হইতে পারে, মনোময় সুযোগ পাইয়া এই ফাঁকে সত্য সত্যই খানিকটা ঘুমাইয়া লইতেছে। ইহার পরীক্ষা করিতে কিন্তু বেশী বেগ পাইতে হয় না, গায়ে একটু সুড়সুড়ি দিলেই বোঝা যায়। ঘুম যদি ছলনা হয় মনোময় ঠিক লাফাইয়া উঠিবে, চুপ করিয়া কখনও সুড়সুড়ি হজম করিতে পারিবে না। কিন্তু যদি সে না ঘুমাইয়া জাগিয়াই থাকে, এবং উষা গায়ে হাত দিবামাত্রই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠে! না—রাগ করিয়া শেষকালে অতখানি অপদস্থ হওয়া উচিত হইবে না।

ও-ঘরে বড় জায়ের ছেলে জাগিয়া উঠিয়া কাঁদিতে লাগিল। শেষে তিনি দালানে আসিয়া ডাকিলেন—ছোট বউ, অ ছোট বউ, ঘুমুলি নাকি?

বার দুই ডাকাডাকির পর উষা উঠিয়া গিয়া ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল—কি?

—তোর ঘরে স্পিরিটের বোতলটা আছে, বের করে দে—খোকার দুধ গরম করব।

বোতল বাহির করিয়া দিয়া তোশকের তলা হইতে দেশলাই লইয়া উষা প্রদীপ জ্বালিল। মধ্যেকার পাশবালিশের প্রাচীর তেমনি অটল হইয়া আছে। উষা যখন উঠিয়া গিয়াছিল, অন্তত সেই অবকাশে বালিশ দুইটির অন্তর্ধান হওয়া উচিত ছিল। কাণ্ডখানা কি?

দীপ ধরিয়া মনোময়ের মুখের দিকে তাকাইতেই বুঝিতে পারিল, সে দিব্য অঘোরে ঘুমাইতেছে—ঘুম যে অকৃত্রিম, তাহাতে সন্দেহ নাই। দাম্পত্য জীবনের উপর উষার ধিক্কার জন্মিয়া গেল। পুরুষমানুষের কেবল চিঠিতে চিঠিতেই ভালোবাসা। ভালোবাসা, না—ছাই! গরমের ছুটিতে ক-দিনের জন্য বাড়ি আসা হইয়াছে, একেবারে রাজ্যের ঘুম সঙ্গে করিয়া লইয়া। আজ যখন কাজকর্ম মিটাইয়া নিজেরা খাইয়া বাসনকোশন ও পিঁড়ি তুলিয়া এঘরে চলিয়া আসিতেছে—এমন সময় টুপটুপ করিয়া রান্নাঘরের পিছনে সিঁদুরে গাছের তলায় ক-টা আম পড়িল। সেজ জা প্রস্তাব করিলেন—চল না ছোট বউ, আম ক-টা কুড়িয়ে আনি। উষা বলিল—এখন থাকগে, সকালে কুড়োলেই হবে। সেজ জা বলিলেন—সকালে কি আর থাকবে? রাত থাকতেই পাড়ার মেয়েগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যাবে। তখন বড় জা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন—না—না সেজবউ, ও ঘরে যাক। আর একজনের

ওদিকে ঘুম হচ্ছে না, তা বোঝ? চলো, তুমি আর আমি কুড়োইগে। আজ তোরও খুব ঘুম ধরেছে, না রে ঊষা? ঊষার লজ্জা করিতে লাগিল। জোর করিয়া বলিল—না, আমিও কুড়োতে যাব—এবং খুব উৎসাহের সহিত আম কুড়াইয়া বেড়াইয়াছিল। তখনই কিন্তু ছাঁত করিয়া মনে উঠিয়াছিল—জাগিয়া আছে তো?…

এবারে মনোময়ের ট্রাঙ্ক হইতে ঊষা কখানা উপন্যাস আবিষ্কার করিয়াছে। আজ রান্নাঘরে ভাত চড়াইয়া দিয়া তাহার একখানা লইয়া বসিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ গোবর্ধন পালিত মহাশয়ের রচিত 'অদৃষ্টের পরিহাস'। বইখানা শেষ করিতে পারে নাই, ফেন উথলাইয়া উঠিল—অমনি সে পাতা মুড়িয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এখন এমন করিয়া শুইয়া কি করা যায়, ঘুম যে আসে না! কুলুঙ্গি হইতে বইখানা টানিয়া লইল।

খাসা লিখিয়াছে, পড়িতে পড়িতে ঊষা অবিলম্বে মগ্ন হইয়া গেল।

উপন্যাসের নায়িকার নাম অধীরা। সম্প্রতি তাহার সঙ্গীন অবস্থা। নায়ক প্রণয়কুমারকে দস্যু ভৈরব সর্দার ইতিপূর্বে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। অধীরা অনেক কৌশলে তাহার সন্ধান পাইয়া স্বয়ং দস্যুগৃহে গিয়াছিল, এখন রাত্রিবেলা ফিরিয়া আসিতেছে।

বর্ণনাটা এইপ্রকার—

একে অমাবস্যার রাত্রি, তায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সূচীভেদ্য অন্ধকার, কেবল মধ্যে মধ্যে খদ্যোৎকুল ইষৎ জ্যোতিঃ বিকিরণ করিতেছে। এই অন্ধকার-মগ্ন নিস্তব্ধ নিশীথে অরণ্য সমাকীর্ণ পথপ্রান্তে উন্মাদিনীর ন্যায় চলিয়াছে কে? পাঠক-পাঠিকাগণ নিশ্চয়ই চিনিতে পারিয়াছেন, ইনি আমাদের সেই জমিদার-দুহিতা ষোড়শী সুন্দরী অধীরা। কণ্টকে পদযুগল রক্তাক্ত হইতেছে, তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই। এমন সময় পশ্চাতে পদধ্বনি শ্রুত হইল। নিশ্চয়ই ভৈরব সর্দারের অনুচর অনুসরণ করিতেছে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া অধীরা আরও দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল। পশ্চাতের পদধ্বনি ক্রমশ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। অধীরা অধিকতর বেগে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দুর্দৈববশত একটি বৃক্ষকাণ্ডে বাধিয়া পদস্খলন হইল। অনুসরণকারী তৎক্ষণাৎ বজ্রমুষ্টিতে তাহার হস্তধারণ করিল। অধীরা নানাপ্রকারে অঙ্গসঞ্চালন করিয়া দস্যুহস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা পাইতে লাগিল। এই সময়ে চকিতে বিদ্যুৎস্ফূরণ হইল। দামিনীর তীব্র আলোকে দেখিতে পাইল অনুসরণকারী আর কেহ নহে,

স্বয়ং প্রণয়কুমার। প্রণয়কুমার প্রশ্ন করিল—পাপীয়সী, এই গভীর রাত্রে নিবিড় অরণ্য মধ্যে কোথায় চলিয়াছিস? আমি তোকে ভালবাসিয়া পরম বিশ্বাসে বক্ষে ধারণ করিয়াছি, সেই বিশ্বাসের এই প্রতিদান?—প্রণয়কুমার আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু অকস্মাৎ মেঘগর্জন দিঙমণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া তাহার কণ্ঠস্বর বিলুপ্ত করিয়া দিল এবং প্রলয়বেগে বাত্যা ও ধারাবর্ষণ আরম্ভ হইল।

ঐ যে বাত্যা ও ধারাবর্ষণ শুরু হইল, ইহার পর পাতা তিনেক ধরিয়া আর তাহার বিরাম নাই। বর্ণনাগুলি বাদ দিয়া উষা পরের পরিচ্ছেদে আসিল। সেখানেও বৃহৎ ব্যাপার। প্রণয়কুমার একাকী পঞ্চাশজন আততায়ীকে কিরূপ বিক্রম-সহকারে ধরাশায়ী করিয়া দস্যুগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার রোমাঞ্চকর বিবরণ। কিন্তু উষার তাহাতে মন বসিল না। ষোড়শী সুন্দরী অধীরা নায়ককে খুঁজিতে গিয়া যে উলটা উৎপত্তি ঘটাইয়া বসিল, সে কোথায় গেল? প্রণয়কুমারের বিক্রমের বৃত্তান্ত পরে অবগত হইলেও চলিবে, উষা তাড়াতাড়ি একেবারে উপসংহারের পাতা খুলিল।

উপসংহারে আসিয়া অধীরার দেখা মিলিল, কিন্তু বেচারী তখন অন্তিম-শয্যায়। এমন সময়ে অতি আকস্মিক উপায়ে প্রণয়কুমার তথায় উপস্থিত হইল। স্থান সম্ভবত হিমালয় কিংবা বিন্ধ্যাচলের একটি নিভৃত গুহা, কারণ ইতিপূর্বে উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গের বর্ণনা হইয়া গিয়াছে।

উষা পড়িতে লাগিল—

অধীরা বলিল—আসিয়াছ হৃদয়বল্লভ? আমি জানিতাম তুমি আসিবে। এই সংসারে ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী। শেষ মুহূর্তে বলিয়া যাই, আমি অবিশ্বাসিনী নহি। ভৈরব সর্দারের গৃহে যে ছদ্মবেশী নবীন দস্যু তোমার শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া দিয়াছিল, সে এই দাসী ভিন্ন আর কেহ নহে। হায়, আমাকে চিনিতে পার নাই।

প্রণয়কুমার বক্ষে করাঘাত করিয়া কহিল—আমি কি দুরাত্মা! তোমার ন্যায় নিষ্পাপ সরলাকে তুষানলে দগ্ধ করিয়া হত্যা করিলাম। আমারই দুষ্কৃতিতে অদ্য একটি অম্লান অনাঘ্রাত কুসুম কাল-কবলিত হইতে চলিয়াছে। এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইবে?

অধীরা গদগদ কণ্ঠে কহিল—তোমার কোন দোষ নাই, সমস্তই অদৃষ্টের পরিহাস। আমার জন্য তুমি কত যন্ত্রণা সহিয়াছ। যাহা হউক

এই পৃথিবী হইতে অভাগিনীর অন্য চিরবিদায়। আবার জন্মান্তরে দেখা হইবে! যাই প্রাণেশ্বর।

এই বলিয়া অধীরা ঝঞ্ঝাতাড়িত লতিকার ন্যায় প্রণয়কুমারের পদতলে পতিত হইল।

বই শেষ হইয়া গেল, তবু উষার ঘুম আর আসে না। ঐ বইয়ের কথাই ভাবিতে লাগিল। এ সংসারে পুণ্যের জয় পাপের ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে আর ভুল নাই। অতবড় দাম্ভিক দুর্ধর্ষ প্রণয়কুমার—তাহাকেও শেষকালে অধীরার শোকে রীতিমতো বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া ভাসাইতে হইয়াছে। হাঁ—বই লিখিতে হয় তো লোকে যেন গোবর্ধন পালিত মহাশয়ের মতো করিয়া লেখে।

বিছানার ও-পাশে তাকাইয়া মনোময়ের জন্য অনুকম্পায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। আজ ভালো করিয়া কথা কহিলে না, মাঝের বালিশ দুইটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া একটু টানাটানিও করিলে না, করিলে তোমার অপমান হইত—বেশ ঘুমাও, এমনিভাবে অবহেলা করিয়া নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাও—কিন্তু একদিন বুক চাপড়াইতে হইবে। উষার রাগ আরও ভয়ানক হইল, রাগের বশে কান্না পাইল। এমন করিয়া এক বিছানায় শুইয়া থাকা যায় না। উষা ভাবিতে লাগিল, এখনই একখানা চিঠি লিখিয়া রাখিয়া দূরে—বহুদূরে একেবারে চিরদিনের মতো চলিয়া গেলে হয়, কাল সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া তখন প্রণয়কুমারের মতো হাহাকার করিতে হইবে।

আলো লইয়া টেবিলের ধারে গিয়া সে সত্যসত্যই চিঠি লিখিতে বসিল। কিন্তু ছত্র পাঁচেক লিখিয়া আর উৎসাহ পাইল না। কারণ, দূরে—বহুদূরে—চিরদিনের মতো, যে-স্থানে চলিয়া যাইতে হইবে, তাহার ঠিকানা জানা নাই। বাইরে উঠানের পরপারে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় লিচুগাছটি ডালপালা মেলিয়া ঝাঁকড়া-চুল ডাইনী-বুড়ির মতো দাঁড়াইয়া আছে। আর যাহাই হউক এই রাত্রিতে দরজার খিল খুলিয়া উহার তলা দিয়া কোথাও যাওয়া যাইবে না, ইহা নিশ্চিত। অতএব চিরদিনের মতো দূরে—বহুদূরে যাইবার আপাতত তাড়াতাড়ি নাই। উষা পুনরায় বিছানায় শুইতে আসিল। আসিয়া দেখে, ইতিমধ্যে মনোময় জাগিয়া উঠিয়া মিটমিট করিয়া তাকাইয়া আছে। আলো নিবাইয়া গম্ভীরমুখে সে শুইয়া পড়িল।

হঠাৎ মনোময় ত্রস্তভাবে বলিয়া উঠিল—উষা, উষা—দেখেছ—লিচুগাছের

ডালে কে যেন ধবধবে কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে, জানলা দিয়ে ঐ মগডালের দিকে তাকিয়ে দেখো না।

উষা বুঝিল, ইহা মিথ্যা কথা। সে বড় ভীতু বলিয়া মনোময় মিছামিছি ভয় দেখাইতেছে। তবু তাকাইয়া দেখিবার সাহস হইল না, সে চোখ বুজিল। কিন্তু চোখ বুজিয়া আরও মনে হইতে লাগিল, যেন সাদা কাপড় পরিয়া তাহার মেজ জা একেবারে চোখের সামনে ঘুরঘুর করিয়া বেড়াইতেছেন। এই বাড়িতে মেজ জা গিয়াছেন, চৈত্রে চৈত্রে এক বৎসর হইয়া গিয়াছে, লিচুতলা দিয়া তাঁহাকে শ্মশানে লইয়া গিয়াছিল।

উষা এমন করিয়া আর চোখ বুজিয়া থাকা বড় সুবিধাজনক বোধ করিল না। একবার ভাবিল—তাকাইয়া সন্দেহটা মিটাইয়া লওয়া যাক, মিছা কথা তো নিশ্চয়ই—ভূত না হাতি। সাহস করিয়া সে চোখ খুলিল, কিন্তু তাকাইয়া দেখা বড় সহজ কথা নয়। ক্যাঁচক্যাঁচ কটকট করিয়া বাঁশবনের আওয়াজ আসিতেছে, তাকাইতে গিয়া কি দেখিয়া বসিবে তাহার ঠিক কি? মনোময়ের উপর আরও রাগ হইতে লাগিল। এতক্ষণ ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া জ্বালাইল, এখন জাগিয়া উঠিয়াও এমনি করে!

উঠিয়া তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিতে গেল, অমনি মনোময় খপ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া বসিল।

—ও কি? কি হচ্ছে? এই গরমে জানালা বন্ধ করলে টিকব কি করে?

উষা বলিল—আমার শীত করছে—

মনোময় বলিল- বোশেখ মাসে শীত কি গো?

উষা বলিল— শীত করে না বুঝি! কখন থেকে একলা একলা খোলা হাওয়ায় পড়ে আছি।

উষার গলার স্বর ভারি-ভারি।

মনোময় বলিল- আচ্ছা, আমি জানলার দিকে শুই—তুমি এই দিকে, কেমন?

উষা কহিল—থাক, থাক—আর দরদে কাজ নেই।

দু-ফোঁটা চোখের জল গড়াইয়া আসিয়া মনোময়ের গায়ে পড়িল।

মনোময় শুনিল না—বালিশ দুটাকে এক পাশে ফেলিয়া জোর করিয়া ধরিয়া উষাকে ডানদিকে শোয়াইয়া দিল। উষা আর নড়িল না, শুইয়া রহিল। একেবারে চুপচাপ।

খানিকক্ষণ পরে মনোময় ডাকিল—ওগো!

উষা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মনোময় জিজ্ঞাসা করিল—হাসছ কেন?

উষা বলিল—ঘুমুচ্ছিলে যে বড়!

মনোময় কহিল—তুমি যে রাগ করেছিলে বড়! এমন ভয় দেখিয়ে দিলাম—

উষা বলিল- না, তুমি বড্ড খারাপ। অমন ভয় আর দেখিও না। আমি সত্যি সত্যি যেন দেখলাম, সাদা কাপড়-পরা মেজদিদির মতো কে একজন। এখনো বুক কাঁপছে। তুমি সরে এসো—বড্ড ভয় করে—

ভাব হইয়া গেল।

টং—

বড় জায়ের ঘরে ক্লক আছে, নিশুতি রাত্রে তাহার শব্দ আসিল।

মনোময় বলিল—ঐ একটা বাজল—আর বকে না, এবার ঘুমনো যাক।

উষা বলিল—একবার আওয়াজ হলেই বুঝি একটা বাজবে। উঃ, কী বুদ্ধি তোমার! বাজল এই মোটে সাড়ে ন-টা।

মনোময় বলিল—সাড়ে ন-টা বেজে গেছে সাড়ে তিন ঘণ্টা আগে।

উষা বলিল—না হয় সাড়ে দশটা, তার বেশি কক্ষনো নয়।

মনোময় বলিল—তারও বেশি। আচ্ছা, দেশলাই জ্বালো, আমার হাত-ঘড়িটা দেখা যাক।

উষা তবু তর্ক ছাড়িল না।

—তা বলে এর মধ্যে একটা বাজতেই পারে না—

মনোময় বলিল—আলোটা জ্বালো আগে—

—জ্বালি। তুমি বাজি রাখো, হেরে গেলে আমায় কি দেবে?

মনোময় বলিল—যা দেব তা এখনো দিতে পারি—মুখটা এদিকে সরাও—

উষা বলিল—যাও!

দেশলাই ধরাইয়া কুলুঙ্গির মধ্য হইতে হাত ঘড়ি বাহির করিয়া দেখা গেল, কাহারও কথা সত্য নয়—একটা বাজে নাই, আড়াইটা বাজিয়া গিয়াছে।

সর্বনাশ! উষা শঙ্কিত হইয়া পড়িল। আবার খুব সকালে সকলের আগে উঠিতে হইবে। না হইলে রাধারানী নামক এক খুদে ননদী আছে, সে উহাকে খেপাইয়া মারিবে।

বিছানাময় স্বচ্ছ জ্যোৎস্না। চাঁদ অনেক নামিয়া পড়িয়াছে—উষা হঠাৎ জাগিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। আগে বুঝিতে পারে নাই। শেষে

দেখিল তখনও ভোর হয় নাই। ভালো হইয়াছে, সেজ জা ও রাধারানীকে ডাকিয়া তুলিয়া রাত থাকিতে থাকিতেই ননদ ভাজে মিলিয়া বাসন মাজা গোবর-ঝাঁট দেওয়া ও আর আর সকল কাজ সারিয়া রাখিবে, শাশুড়ি সকালে উঠিয়া দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া যাইবেন।

খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়া আগের রাত্রির কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে উষার হাসি পাইল। বাপরে বাপ, মানুষটি এত ঘুমাইতে পারে, এখনো বেহুঁশ! আগে ভালো করিয়া দেখিয়া লইল, মনোময় সত্যসত্যই ঘুমাইয়াছে কি-না, তারপর চুপিচুপি তাহার পায়ের গোড়ায় প্রণাম করিল। এ কয়দিন রোজ সকালেই সে প্রণাম করে, কারণ গুরুজন তো! রাত্রে ঘুমের ঘোরে কতবার হয়তো গায়ে পা লাগে। তবে মনোময়কে চুরি করিয়া কাজটা করিতে হয়, সে জানিতে পারিলে ঠাট্টায় ঠাট্টায় অস্থির করিয়া তুলিবে।

মনোময়ও একটু পরে জাগিল। তাকাইয়া দেখে, পাশে উষা নাই। আকাশে তখনো চাঁদ আছে। কি কাজে হয়তো বাহিরে গিয়াছে, ঘুমের ঘোরে এমনি একটা যা-তা ভাবিয়া সে আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে জাগিয়া উঠিয়াও পাশে উষাকে দেখিতে পাইল না। তাহাতে অবশ্য আশ্চর্য নাই, রোজ সকালেই উষা অনেক আগে উঠিয়া যায়। সেলফ হইতে দাঁতন লইতে গিয়া মনোময় দেখিল, টেবিলে প্যাডের উপর উষার হাতের লেখা চিঠি রহিয়াছে। রাত্রে বসিয়া বসিয়া কি লিখিতেছিল বটে!

উষা লিখিয়াছে—

তোমার কোন দোষ নাই। তুমি আমার জন্য কতই যন্ত্রণা সহিয়াছ। তুমি কতই বিরক্ত হইয়াছ। এই পৃথিবী হইতে অভাগিনীর চিরবিদায়। জন্মান্তরে দেখা হইবে, যাই—

ইহার পর 'প্রাণেশ্বর' কথাটা লিখিয়া ভালো করিয়া কাটিয়া দিয়াছে। উষার পেটে যে এত তাহা মনোময় আগে জানিত না। এরূপ লিখিবার মানে কি?

যাহা হউক সে বাহিরে গেল। অন্যদিন উষা এই সময়ে রান্নাঘরের দাওয়া নিকায়। আজ সেখানে নাই। এবার একটু শঙ্কা হইল। মেয়েরা তো হামেশাই আত্মহত্যা করিয়া বসে, যখন তখন শুনিতে পাওয়া যায়। খিড়কির পুকুর বেশি দূরে নয়, জলও গভীর। কিন্তু কি কারণে উষা যে এত বড় সাংঘাতিক কাজ করিবে, তাহা বুঝিতে পারিল না। রাত্রে ঘুমের ঘোরে

হয়তো সে কি বলিয়াছে! আনাচ-কানাচ সকল সন্দেহজনক স্থান দেখিয়া আসিল, উষা কোথাও নাই। এমন মুশকিল যে একথা হঠাৎ মুখ ফুটিয়া কাহাকে জানাইতে লজ্জা করে। পোড়ারমুখী রাধারানীটাও সকাল হইতে কোথায় বাহির হইয়াছে যে তাহাকে দুটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবে!

অবশেষে মনোময় বড় বউদিদির ঘরে ঢুকিল। সে-ঘর ইতিপূর্বেই একবার খুঁজিয়া দেখা হইয়াছে।

বড়বধূ বিছানা তুলিতেছিলেন, বোধকরি মনোময়ের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, হাসিয়া বলিলেন—হারানিধি মিলল না? না ভাই, আমি চোর নই। ঘর তো আমাদের অজান্তে একবার দেখে গিয়েছ, এইবার বিছানাপত্তর ঝেড়েঝুড়ে দেখাচ্ছি—এর মধ্যে সেরে রাখি নি।

মনোময় বলিল—ঠাট্টার কথা নয় বউদি, ছোট বউ কোথায় গেল বল দিকি? এই দেখো চিঠি—

বলিয়া চিঠিখানা দেখাইল।

চিঠি পড়িয়া বড়বধূ গম্ভীর হইয়া গেলেন। বলিলেন—কি হয়েছিল বলো তো—এ তো ভয়ের কথা!

মনোময় প্রতিধ্বনি করিল—সাংঘাতিক ভয়ের কথা।

—তোমার দাদাকে বলি তবে?

বিমর্ষ মুখে মনোময় কহিল—না বলে উপায় কি?

বড়বধূ বলিলেন—ভালো করে খুঁজে-টুজে দেখেছ তো?

—কোথাও বাকি রাখি নি, বউদি!

—গোয়ালঘর, সিঁদুরে আঁবতলা?

—হুঁ।

—চিলেকোঠা?

—হুঁ।

—তোমার নিজের ঘরে? সিন্দুকের তলায় কি বাক্সের পাশে? দুষ্টুমি করে লুকিয়ে থাকতে পারে।

মনোময় বলিল—তা ও দেখেছি, তন্নতন্ন করে দেখেছি।

বড়বধূ হতাশভাবে বলিলেন—তবে কি হবে? আচ্ছা, সিন্দুকের ভিতরে, বাক্সের ভিতরে?

বলিতে বলিতে হাসিয়া ফেলিলেন।

মনোময় মাথা নাড়িয়া বলিল—বউদি, ব্যাপার কিন্তু সহজ নয়—

বড়বধূ বলিলেন—নয়ই তো! আচ্ছা এসো তো আমার সঙ্গে, একটু দেখি—

জনার্দনের ...তে পাচ্ছি নে, চোখ খুলে দেখব আমার জুতোজোড়া আপনা-এমন পড়ে আছে—

জুতোজোড়া সত্যসত্যই যথাস্থানে পৌঁছিল, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক নবগোপাল চোখ মিটমিট করিয়া দেখিতেছিল। কাতু পলাইয়া যাইতেছে, খাঁ করিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিল।

— ওরে দুষ্টু, শব্দ হবে বলে মল খুলে রেখে জুতো-চুরি—এত বুদ্ধি তোমার? কেমন, এইবার?

কাতু আঁকিয়া-বাঁকিয়া হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু নবগোপালের শক্ত মুঠি খুলিল না। হঠাৎ সে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। নবগোপাল ভারি অপ্রস্তুত হইল। বলিল—কাঁদ কেন খুকি, কি হল?

খুকি বলিল—আমার লাগে না বুঝি! হাত একেবারে ভেঙে গেছে, উহু-হু—

মহাব্যস্ত হইয়া নবগোপাল বলিল—দেখি, কোথায় লাগল? না, কিচ্ছু হয় নি ফুঃ—আচ্ছা, ধুলোপড়া ধুলোপড়া ছাগলের শিং—

কিন্তু মন্ত্র শেষ হইবার আগেই যন্ত্রণা নিরাময় হইল। নবগোপাল ধুলা পড়িতেছে, কাতু ফিক করিয়া হাসিয়াই দৌড়। দৌড়—দৌড়। পিছন হইতে নবগোপাল ডাকিতে লাগিল- খুকি, তোমার মল পড়ে রইল—নিয়ে যাও—নিয়ে যাও। আর খুকি!

পরদিন আর কোনো বাধা নাই, জনার্দন বসিয়া আছেন, মহা আড়ম্বরে কাব্যচর্চা হইতেছে। কাতু কাহাকেও কিছু না বলিয়া সরাসরি ফরাসের উপর গিয়া বাবার কাছে গম্ভীর হইয়া বসিয়া পড়িল। এই অতি-শান্ত মেয়েটির যেন ইহা নিত্যকার অভ্যাস! এমন একমনে শুনিতে লাগিল যে চোখের পাতাটিও নড়ে না।

কবিতা পড়া শেষ হইল। নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিল—কেমন শুনলে খুকি? কাতু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—ভালো। একটু পরে বলিল—তুমি অনেক ছড়া জান—আমায় শিখিয়ে দেবে?

নবগোপাল তাহার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিল যে উহা ছড়ার মতো হেয় জিনিস নয়—কবিতা, বইয়ের মধ্যে ছাপা হইয়া বাহির হয়। কিন্তু কাতু প্রত্যয় করিল না। এই লোকটা- জামা গায়ে কাপড়-পরা আর সকলের মতো মানুষ একটা—তাঁহার ছড়া নাকি ছাপা হইয়া বই হয়! মাথা নাড়িয়া বলিল—তুমি বই ছাপাও? যাঃ, মিথ্যেবাদী কোথাকার—বই না আরো কিছু! কাতু সম্প্রতি বানান করিয়া করিয়া পড়িতে শিখিয়াছে, বইয়ের সম্ভ্রম বোঝে।

নবগোপালের বড় ইচ্ছা হইল, নিজের নাম ছাপানো অবস্থায় দেখিয়া বোকা মেয়েটার তাক লাগাইয়া দেয়। কিন্তু বাড়ি হইতে একবার ঘুরিয়া আসিতে না পারিলে তাহার উপায় নাই। জনার্দন হিসাবী মানুষ, সাহিত্য-রসিক বটে কিন্তু মাসিকপত্র কিনিয়া পয়সার অপব্যয় করেন না।

আর একদিন দুপুরবেলা রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে—নবগোপাল খাতা বগলে ঘামিতে ঘামিতে আসিয়া রোয়াকে উঠিল। ঘরের ভিতর ফড়ফড় করিয়া ফুরশির আওয়াজ উঠিতেছে, কর্তা যে বাড়িতে আছেন এবং সচেতন অবস্থায় আছেন তাহাতে সন্দেহ নাই, নবগোপাল পুলকিত হইয়া ভিতরে ঢুকিল। কিন্তু যাহা দেখিল, তাহাতে বিশেষ আশা রহিল না।

জনার্দন ইজিচেয়ারে পড়িয়া নাক ডাকাইতেছেন. ফুরশির আওয়াজ বলিয়া যাহা ভাবিয়াছিল তাহা নাকের ডাক, দূর হইতে নাক ও ফুরশির আওয়াজের প্রভেদ নির্ণয় করা দুষ্কর। কাতুও মেঝের উপর সর্বাঙ্গ এলাইয়া বিভোর হইয়া ঘুমাইতেছে। নবগোপাল মনঃক্ষুণ্ণ হইল। এই কাঠ-ফাটা রোদে শ্যামবাজার হইতে এত পথ আসিয়াছে!

মনে হইল, কাতুর কি অসুখ করিয়াছে, ঘুমের ঘোরে কাশিয়া কাশিয়া উঠিতেছে, সমস্ত মুখ লাল, মাঝে মাঝে কাটা কবুতরের মতো ছটফট করিয়া উঠে। নবগোপাল বড় ব্যস্ত হইয়া ডাকিল—কাতু, ও কাতু, কাত্যায়নী। কাতু চোখ মেলিল বটে, কিন্তু কথা বলে না। এত ডাকাডাকি, জবাব নাই—স্বর বন্ধ হইয়া গেল নাকি? ডাক্তারেরা এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট কোনো কোনো ব্যারামের কথা বলিয়া থাকে বটে। জনার্দনকে ডাকিয়া তুলিতে যাইতেছে, সহসা কাতু লাফ দিয়া উঠিল, বলিল—বাব্বাঃ, দুপুরে একটু ঘুমুতে দেবে না—কী জ্বালাতন! সঙ্গে সঙ্গে নাক মুখ দিয়া প্রচুর ধোঁয়া নির্গত হইল। বোঝা গেল, সে কেন কথা কহিতেছিল না। তামাক টানিতে টানিতে জনার্দন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, সাজা তামাক পাইয়া পোড়ারমুখী চুরি করিয়া টানিয়া দেখিতেছিল। নবগোপাল বলিল—তামাক খাচ্ছিলি তুই—আমি বলে দেব, সব্বাইকে বলে দেব।

কাতু প্রতিবাদ করিল—বা-রে, আমি ঘুমিয়েছিলাম না? দেখ নি আমার চোখ বোজা? আমি তামাক খাই নি।

নবগোপাল বলিল—ও রে মিথ্যুক, তামাক খাস নি? তবে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল কেন রে—নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ইঞ্জিনের চোঙের মতো?

কাতু সাফ অস্বীকার করিল—কখন? কক্ষনো নয়। অমন মিছে কথা বোলো না।

জনার্দনের ;ছে কথা? নবগোপাল হাত ধরিয়া ফেলিল—দেখি, মুখ শুঁকে এমন,—এই এখনো গন্ধ রয়েছে, তোমার বাবাকে জাগিয়ে দেখাব। দাঁড়াও—

কাত্যায়নী তাহার কনুইতে দিল কামড়, একেবারে দুটা দাঁত বসিয়া গেল। নবগোপাল হাত ছাড়িয়া দিয়া যন্ত্রণায় বসিয়া পড়িল। কনুয়ের সে দাগ আজও মুছিয়া যায় নাই।

নবগোপাল ভাবিল মেয়েমানুষ হইয়া তামাক খায়, হউক না ছোটমানুষ—অমন মেয়েকে ছাই পাতিয়া কাটিয়া ফেলিতে হয়, তাহার রক্তটুকুও যেন মাটিতে না পড়ে- আপনার কেহ হইলে সে সেদিন ঐ মেয়েকে পিটাইয়া হাড় ভাঙিয়া দিত।

সেই পাঁচ বছর আগেকার চঞ্চল দুরন্ত কাতু আজ আয়তনয়না শান্ত কিশোরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি গত বুধবারের বৃত্তান্তটা শোনো—

বুধবার বিকালবেলা সেই যে বড় জল হইয়া গেল, তাহার কিছু আগে নবগোপাল যথারীতি খাতাসহ জনার্দনের বাড়ি গিয়াছিল। বৈঠকখানার দুয়ার ভেজানো, সে অবস্থায় ধাঁ করিয়া ঢুকিয়া পড়িতে নাই—আগে কড়া নাড়িতে হয়, কড়া যদি না থাকে বারকয়েক সশব্দে কাশিলেও চলে। নবগোপালের তো সে কাণ্ডজ্ঞান নাই। ঘরে ঢুকিয়া মহা বেকুব হইয়া গেল। পাঁচ বছর এ বাড়িতে গতায়াত, কোনোদিন গিন্নি নবগোপালের সামনে পড়েন নাই, তিনি বৈঠকখানার দিকে আসেন না। কিন্তু ঐ দিন আসিয়াছিলেন এবং বিপুল বপু লইয়া তক্তাপোশের আধখানা জুড়িয়া বসিয়াছিলেন, কর্তার সঙ্গে কি একটা কথা হইতেছিল। নবগোপালকে দেখিয়া মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া কেবলমাত্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া লজ্জা রক্ষা করিলেন, ঐ বিশাল দেহখানা লইয়া অন্দরে পলাইয়া যাওয়া তো সোজা কথা নয়!

জনার্দন ঠেকাইয়া দিলেন—আহা উঠছ কেন? ও যে নবগোপাল, ঘরের ছেলের মতো! ওর পদ্য পড় নি? দাড়ি-টাড়ি উঠলে ঠিক রবি ঠাকুর হবে বলে দিচ্ছি।

গিন্নি আর দাঁড়াইয়া লজ্জা করিলেন না। সাধ্যও ছিল না, এইটুকু দাঁড়াইয়াই হাঁপ ধরিয়াছিল। বলিলেন—তুমি নবগোপাল? কোনোদিন দেখি নি বটে, ওদের মুখে শুনে থাকি। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো বাবা, বোসো—। এবং একটু পরেই সহসা কর্তার উপর ঝাঁঝিয়া উঠিলেন—হাত গুটিয়ে বসে থাকলে যে! ফর্দ-টর্দ করো, ভদ্দোরলোককে শুধুমুখে বিদায় করতে হবে নাকি?

গিন্নি বলিয়া গেলেন, কর্তা নিরাপত্তিতে ফর্দ করিতে লাগিলেন- দেখিয়া রসগোল্লা, পানতুয়া, ক্ষীরমোহন ইত্যাদি ইত্যাদি, ভদ্রলোককে ঠিক যে প্রটিয়া অভ্যর্থনা করিতে হয়! প্রথম আলাপের দিনই গিন্নির মিষ্টান্নের কথা মনে পড়িয়াছে অথচ জনার্দন পাঁচ বছর কেবল ভূরিভূরি মিষ্টকথাই শুনাইয়াছেন। এই বস্তু-তান্ত্রিক আপ্যায়নে নারীজাতির প্রতি ভক্তিতে নবগোপাল আপ্লুত হইয়া উঠিল।

গিন্নি উঠিলেন, বড় ব্যস্ত। বলিলেন -তুমি এসেছ, থির হয়ে যে দুটো কথা বলব বাবা, তার কি জো আছে? দেখিগে আবার ওদিকে, চারখানা লুচির যোগাড় তো করতে হবে!

লোকে নাকি বলিয়া থাকে, বাংলা দেশে কবিতা লিখিয়া কোনো খাতির নাই!

কিন্তু পরমাশ্চর্যের বিষয় এই যে নিজহাতে নগদ আট আনার মিষ্টান্নের ফর্দ করিয়া দিয়া এবং তদতিরিক্ত লুচির প্রস্তাবের পরেও জনার্দন হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন- আজকে যে তুমি এসেছ, খাসা হয়েছে—তোমার কথাই ভাবছিলাম, ভগবান মিলিয়ে দিয়েছেন। ওরে বেহায়া মেয়ে, তারা এক্ষুনি এসে পড়বে—এ দিকে যে বড় ঘুরঘুর করছিস?

বেহায়া মেয়ে বলা হইল কাতুকে। সে ওদিকের দুয়ারের সামনে দিয়া যাইতে যাইতে নবগোপালকে দেখিয়া দাঁড়াইল, হয়তো ঘরেও আসিত, কিন্তু বাবার তাড়া খাইয়া সরিয়া গেল।

নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিল—কারা আসবে?

জনার্দন বলিলেন—আহিরিটোলা থেকে—কারা-টারা নয় হে—সেই এক-জনই, তোমাদের আজকালকার যেমন দস্তর। আমি এ ভালোই বলি- যার জিনিস সে-ই দেখেশুনে বাজিয়ে নিয়ে যায়, মন্দ কি।

নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিল—কাতুর বিয়ে নাকি?

—সে কি বাপু, আমার হাত? জন্ম মৃত্যু বিয়ে তিন বিধাতায় নিয়ে—যদি আর-জন্মে ওদের হাঁড়িতে চাল দিয়ে থাকে, তবে তো? বাবাজীবন নিজেই দেখতে আসছেন আজ।

নবগোপাল কহিল—বেশ, ভালো কথা।

জনার্দন বলিতে লাগিলেন—ভালো বলে ভালো! আজ যদি ওখানে লেগে যায়, বুঝব মেয়ের ভাগ্যি, মেয়ের বাবারও ভাগ্যি। হাঁ—সম্বন্ধ বটে! অবিনাশ দত্তর নাম শোন নি? সে-ই—

নামটি হয়তো সুবিখ্যাত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নবগোপাল শুনে নাই।

জনার্দনের কথাতেই সমুদয় পরিচয় প্রকাশ পাইতে লাগিল।—তবু গিন্নি বলেন, এমন পটের মতো মেয়ে দোজবরের হাতে! আরে, লোহাপটিতে তিন-তিনখানা দোকান, কমসে কম লাখো টাকা খাটছে—দোজবরে বললেই হল? ভালোভালি দু-হাত এক হোক, তারপর বছরের মধ্যে আমার এই ব্যবসার ভোল ফিরিয়ে না দিতে পারি তো তখন দেখো। বাবাজীবন মানুষ খুব ভালো, এরি মধ্যে অনেক আশা-টাশা দিয়েছেন—বুঝলে?

নবগোপাল বলিল—তবে আমি উঠি, আপনারা ব্যস্ত আছেন—

জনার্দন বলিলেন—উঠবে মানে? আমি যে ভাবছিলাম তোমার কথাই। বাবাজীবন নিজে যেয়ে দেখবেন, আমি বাপ হয়ে কি করে সেখানে থাকব? এসে যখন পড়েছ, তুমি ঘরের ছেলে—তোমাকে সব সেরে সামলে দিতে হবে। যে হাবা মেয়ে, কি কথায় কি সব উত্তর দিয়ে বসবে তার ঠিক কি!

যথাসময়ে বাবাজীবন আসিলেন। আধুনিক দস্তুর অনুযায়ী নিজেই পাত্রী দেখিতে আসিয়াছেন বটে, তা বলিয়া বয়স হিসাবে তিনি কিন্তু নিতান্ত আধুনিক নহেন। ভুঁড়ি দেখিলেই প্রত্যয় জন্মে টাকা আছে এবং লোকটি কাজেরও। আসিয়াই হুকুম করিলেন, চটপট নিয়ে আসুন, কিচ্ছু সাজাবেন না—একেবারে এক কাপড়ে, যেমন আছে তেমনি—

ঝি কাতুকে লইয়া আসিল। জনার্দন নবগোপালকে বিশেষ প্রকারে ইশারা করিয়া অন্তর্ধান করিলেন। কিন্তু কাতু সত্যসত্যই এক কাপড়ে আসে নাই। দেখিলে হাসি আসে, সাজিলে-গুজিলে তাহাকে কি মানায়? টিপ পরিয়া চুলে পাতা কাটিয়া মা ঠাকুরমা এবং বাড়িসুদ্ধ বোধকরি বা পাড়াসুদ্ধই সকলের নানা আকারের বিবিধ গহনায় সর্বাঙ্গ বোঝাই করিয়া রাঙা বেনারসির আঁচল লুটাইতে লুটাইতে কাতু আসিয়া ঘাড় নিচু করিয়া দাঁড়াইল। অবিনাশ হাঁকিলেন—তোলো, তোলো—মুখটা উঁচু করো—ও ঝি, মুখটা তুলে ধরো গো। ঝি মুখ উঁচু করিয়া ধরিল, কিন্তু তখনই নামিয়া পড়িল, অবিনাশ দুই চোখের দূরবীন কষিবার সময় পাইলেন না। আর মেয়ে ঘামিয়া ঘামিয়া খুন হইতেছে, পড়িয়া যায় আর কি! নবগোপাল হাত ধরিয়া বসাইয়া দিল।

অবিনাশ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—উঁহু, বসলে হবে না—হাঁটিয়ে দেখতে হবে। ঝি, তুমি নিয়ে যাও তো ঐ কোণ অবধি··

হাঁটাইয়া দেখা হইল। খোঁপা খুলিয়া চুলের বহর মাপা হইল। হাতের কব্জিতে বুড়া-আঙুল ঘষিয়া ঘষিয়া অবিনাশ সঠিক বুঝিলেন, পরিদৃশ্যমান রঙটাও মেকি নহে। কিন্তু দৃষ্টিপরীক্ষা লইতে গিয়া বাধিল মুশকিল। কাতু কিছুতেই চোখ মেলিয়া তাকাইতে পারে না। এদিকে নেপথ্য হইতে জনার্দন

নবগোপালকে পুনঃ পুনঃ ইঙ্গিত করিতেছেন এবং হাত-পা নাড়িয়া কাতুর উদ্দেশে শাসাইতেছেনও খুব। কিন্তু খানিকটা ঘাড় তুলিয়া তাকাইতে গিয়াই আবার নিচু হইয়া পড়ে! নবগোপাল বুঝাইতে লাগিল—এমন দেখি নি—আহা, অত লজ্জা কিসের? বুঝলেন অবিনাশবাবু, বড্ড লাজুক—যেন একালের মেয়ে নয়। এমন ভালো আপনি মোটে দেখেন নি। কই তাকাও, তাকাও না—আচ্ছা, আমার দিকে তাকালেই হবে—আমার দিকে—হাঁ, এই যে—ভালো করে—

কোনোপ্রকারে একপলক চাহিয়াই কাতু ঘাড় গুঁজিল, যেন দুটা চোখের খোঁচা মারিল। ছোটবেলায় আর একদিন এই মেয়েটাই দুটা দাঁত বসাইয়া দিয়াছিল।

অবশেষে কাতু ছুটি পাইল। সঙ্গে সঙ্গে জনার্দন আসিলেন এবং আসিল লুচিসহযোগে সেই সন্দেশ ক্ষীরমোহন প্রভৃতি একখানি মাত্র রেকাবি বোঝাই হইয়া। দেখা গেল অবিনাশের উদরে আয়তনের অনুপাতে স্থানেরও প্রাচুর্য আছে। নবগোপাল উঠিল। জনার্দন কিছুতেই ছাড়িবেন না—শুভকর্মের মধ্যে এসে পড়লে, একটা পান খেয়ে যাও। কিন্তু নবগোপাল দাড়াইল না।

মোড়ে আসিয়া আধপয়সার পান কিনিল, ফিরিয়া ফিরিয়া জনার্দনের বাড়ির দিকে তাকাইতে লাগিল, দোক্তা লইল, আর একবার সুপারি চাহিয়া লইল, বোঁটার আগায় করিয়া একটুখানি চুনও লইল। শেষে ভকভক করিয়া অবিনাশের গাড়ি তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেলে সে বড়রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

আজ সকালে নবগোপালের মেসে একখানা লাল রঙের চিঠি আসিয়াছে—আগামী ২৪শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার আহিরিটোলা-নিবাসী ৺পীতাম্বর দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান অবিনাশচন্দ্র দত্ত বাবাজীউর সহিত মদীয় কন্যা কল্যাণীয়া কাত্যায়নীর শুভবিবাহ হইবেক। মহাশয় সানুগ্রহে উক্ত দিবস ইত্যাদি। চিঠি পড়িয়া নবগোপালের মনে হইল, তাহার কর্তব্যচ্যুতি ঘটিয়াছে, শুভ-কর্মের কতদূর কি হইল এ কয়দিনের মধ্যে একবার সন্ধান লওয়া উচিত ছিল।

বিকালে বেড়াইতে বেড়াইতে নেবুতলা গেল। জনার্দনের সঙ্গে দেখা হইল না, তিনি হোগলার মেরাপ বাঁধিবার বায়না দিতে গিয়াছেন। কাতুকে ডাকিয়া এক গ্লাস জল চাহিল। জল খাইতে খাইতে নবগোপাল কহিল—তোর ভাগ্যি ভালো রে কাতু, অবিনাশের বউ হচ্ছিস—শুনেছিস তো কত বড়লোক, শুনিস নি আবার! শ্বশুরবাড়ির কথা চুরি করে সব শুনেছিস। সত্যি, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

কাতু গেলাস লইয়া চলিয়া যাইতেছিল, নবগোপাল আবার বলিল—তোর বিয়ের পদ্য ছাপাব, আজ দুপুরে লিখে ফেলেছি, এইসা হয়েছে—

কাতু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—সত্যি নাকি ? ভালো হয়েছে ?

—খুব ভালো হয়েছে—হবে না কেন ? প্রাণের ভেতর থেকে এসেছে কি-না ! তুই তো পর নোস—

কাতু হাসিয়া কহিল—পর নই, আপনার ?

—বড্ড আপনার রে ! আচ্ছা শুনে দেখ—পকেটেই আছে। পকেট হইতে পদ্য বাহির করিয়া সে পড়িতে লাগিল। সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর বিষয় উল্লেখ করিয়া স্বামী শ্বশুর শাশুড়ি পরিজন স্বধর্ম স্বদেশ প্রভৃতি যাবতীয় বস্তুর প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া অবশেষে নবদম্পতির সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করা হইয়াছে, কোনো বিষয়ে আর খুঁত ধরিবার জো নাই।

পড়া শেষ করিয়া নবগোপাল সগর্বে কহিল—কেমন হয়েছে ? বল তো এবার, লজ্জা করিস নে—

—না, লজ্জা করব না, দেখি—বলিয়া কাতু কবিতাটি লইয়া কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। ছিঁড়িয়া নির্বাকভাবে চলিয়া যাইতেছিল। নবগোপাল প্রথমটা হতভম্ব হইয়া গেল, তারপর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—ছিঁড়লে যে বড় ! কেন আমার কবিতা ছিঁড়লে—কেন ?

কাতু শান্তভাবে কহিল তুমি ছাইভস্ম লিখবে কেন ? আমাদের যে শুনে ঘেন্না ধরে যায়—

নবগোপাল কহিল—আমি ছাইভস্ম লিখি ?

—লেখই তো। তুমি যদি পদ্য ছাপাও আমি গলায় দড়ি দেব—কী করেছি আমি তোমার ? বলিয়া কান্না চাপিতে চাপিতে কাতু ছুটিয়া পলাইল।

কবিতার নিন্দা করিলে নবগোপাল ক্ষমা করে না। সে সাব্যস্ত করিয়াছে কাতুর বিয়েয় সে যাইবে না। না যাক, তাহাতে শুভকর্ম আটকাইয়া থাকিবে না। তোমরা যদি বিয়ে দেখিতে চাও, ২৪শে সন্ধ্যার পর নেবুতলা লেনে ঢুকিয়া পড়িও, মিষ্টান্ন মিলিবে। নম্বরটা ভুলিয়া গিয়াছি, জামরুল-গাছ-ওয়ালা সাদা বাড়ি—দেখিলেই চিনিতে পারিবে।

পিছনের হাতছানি

বড় ছেলেটির কিছু হইল না, মেওটির কিন্তু পড়াশুনায় চাড খুব। সারা সকাল বন্ধুদের বাড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া কলেজের নোট সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়। বন্ধুচক্রের পরিধিও বড কম নয়--সেই টালিগঞ্জ বেহালা ইস্তক। ফিরিতে এগারোটা বাজিয়া যায়। ইহাতেও বোধকরি সময়ে কুলাইয়া উঠে না। তাই ইদানীং মায়ের কাছে একটা মোটর সাইকেলের ফরমায়েশ হইয়াছে।

গিন্নি আসিয়া কহিল- শুনছ গো, একটা বিশেষ কথা আছে—

গিরিজার এমন হইয়াছে যে ভূমিকা শুনিয়াই সমস্ত বুঝিতে পারে, কথা খুলিয়া বলিতে হয় না। সে বাড়িব কর্তা সন্দেহ নাই, কিন্তু মা ও ছেলেরা মিলিয়াই খাসা কাজকর্ম চালাইয়া যায়, তাহাকে দরকার পড়ে না। কেবল যা মধ্যে মধ্যে এই প্রকার বিশেষ কথা শুনিতে হয়। কারণ, আবশ্যকমাত্রই টাকা বাহির করিয়া দেওয়া--ইহার অত্যাশ্চর্য কৌশলটি একমাত্র তাহারই জানা আছে।

অতএব কথাটি শুনিতে হইল। শুনিয়া গিরিজা ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিল—সুমতি, শ্রীমানদের পায়ে হাত দিতে বলি নে, তবু একবার তাকিয়ে যেন দেখে তাদের বাপের পায়ে এই এখানে কতগুলো কাঁটাখোঁচার দাগ।

সুমতি হাসিমুখে কহিল—তোমার সঙ্গে ওদের তুলনা? তুমি ছিলে কি লোকের ছেলে, আর ওদের বাপ কত বডলোক।

—তা বটে। বলিয়া গিরিজাও একটু ম্লানভাবে হাসিল। বলিল—দেখো নীলগঞ্জের ইস্কুল ছিল আমার মামাবাড়ি থেকে পাকা দুই ক্রোশ—

সুমতি হাত-মুখ নাড়িয়া বাধা দিয়া বলিল—আবার সেই সাতকাণ্ড রামায়ণ শুরু করবে নাকি এখন? রক্ষে করো মশাই, আমি চলে যাচ্ছি— আমার ঢের কাজ—

ছোট মেয়ে মিনা কুকুর-বাচ্চাটাকে কোলে লইয়া এতক্ষণ বিস্কুট খাওয়াইতেছিল। সে-ও উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—মা, গাড়ি বের করতে বলি? আজ কিন্তু একঝুড়ি ফুল চাই আমার, আজকে পুতুলের বিয়ে—

গিরিজার একটা নিঃশ্বাস পড়িল। ইহারা কেহই তাহার সে ইতিহাস শুনিতে চায় না। তার বয়স পঞ্চাশের কোঠা পার হইয়া গিয়াছে। এক অখ্যাত পাড়াগাঁয়ে আনন্দ ও অশ্রুজলে নিষিক্ত জীবনের কতকগুলি দিন

হেলা-ফেলায় ছড়াইয়া রাখিয়া আসিয়াছে। এখন বার্ধক্যের সীমায় আসিয়া মুখ ফিরাইয়া তাহাদের হয়তো মাঝে মাঝে দেখিতে ইচ্ছা করে। সত্যিই তো! তার নিজের ভালো লাগে বলিয়া যাহাদের সে বয়স নয় তাহাদের ভালো লাগিবে কেন? তার উপর কাহিনীটা একেবারেই ঘরে ঘরে যে রকম ঘটিয়া থাকে, তাই—

অর্থাৎ কচি ছেলে ও বিধবাকে রাখিয়া গিরিজার বাবা মারা গেলেন—দয়া করিয়া কোনো অবিবাহিতা মেয়ে রাখিয়া যান নাই। দেনায় ভিটা বিক্রি হইল। গিরিজার মা ছেলে লইয়া ভূষণডাঙায় ভাইয়ের বাড়ি উঠিলেন। ভাই সীতানাথবাবুর বাড়ি গোমস্তাগিরি করিতেন। সীতানাথ ঐ গ্রামেরই—গ্রাম সুবাদে ওঁদের সকলের দাদা। অবস্থা ভালো, মানে চার গোলা ধান, খেত খামার ও মোটা সুদে টাকা-দাদনের কারবার। গিরিজা মামার বাড়ি থাকিয়া দুই ক্রোশ দূরের নীলগঞ্জের বড় ইস্কুলে পড়িত। শীতকালে আসন্ন সন্ধ্যায় ইস্কুল হইতে ফিরিবার পথে খেজুরগাছের মাথায় চড়িয়া ভাঁড়ের মধ্যে পাকাটি দিয়া খেজুর-রস চুরি করিয়া খাইত। ইস্কুলের সেকেণ্ড-পণ্ডিত মহাশয় ব্যাকরণের একটা শব্দরূপ খাতায় পাচবার লিখিতে হুকুম দিয়া টেবিলে মাথা হেলাইয়া নাক ডাকা শুরু করিতেন, পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ঘণ্টার মধ্যে পাঁচবার লেখা সারা করিয়া কেহ যে তাঁহাকে দেখাইতে আসিবে এমন সম্ভাবনা ছিল না। অতএব নিদ্রাটা বেশ নিরুপদ্রবে ঘটিত। গিরিজা সেই ফাঁকে ইস্কুল পলাইয়া খাল পার হইয়া চরের খেতের মটরশুঁটি আনিয়া ইচ্ছামতো ভোগ-বিতরণ করিত। এমনি করিয়া তাহার বয়স বাড়িয়া চলিল, লেখাপড়া যে কতদূর বাড়িয়াছে তাহাতে প্রবীণেরা সন্দেহ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু একদা সমস্ত গ্রামটিকে সচকিত করিয়া সে পাশ করিয়া ফেলিল তৃতীয় বিভাগে।···

গিন্নি কাপড়-চোপড় পরিয়া বাহির হইবার মুখে আর-একবার হানা দিয়া গেলেন।—ওগো, ছেলেটা যখন ধরেছে, দিয়ে দাওগে—বুঝলে? বলিতে বলিতে নামিয়া গেলেন।

বেয়ারা আসিয়া সকালের ডাক রাখিয়া গেল। একখানা অমৃতবাজার পত্রিকা, খান দুই-তিন ক্যাটালগ ও একগাদা চিঠি। চিঠিগুলির উপরে নানা ফার্মের নাম ছাপানো আছে, অতএব ভিতরের বৃত্তান্ত না খুলিয়াও বলা চলে। কেবল একখানিতে সে-সব কিছু নাই। গিরিজা খুলিয়া দেখিয়া অবাক! মনোরমা লিখিয়াছে।

মেয়েলি হাতের গোটা গোটা অক্ষর, কাটাকুটি ও বানান-ভুলের অন্ত নাই! মুসাবিদা যাহারই হোক, হরফগুলি সেই মনোরমার আদি ও অকৃত্রিম। কিন্তু ইংরাজিতে বাহিরের ঠিকানা লিখিয়াছে বোধকরি নীলমণি—মনোরমার স্বামী।

অসংখ্য প্রণতিপুরঃসর নিবেদন করিয়াছে—

দাদা, এই গরিব ভগ্নীটিকে বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন। মনোরমা বলিয়া যদি চিনিতে না পারেন, ঘোষেদের পুঁটির কথা আশা করি মনে পড়িবে। আজ তিন বৎসর হইল পিতাঠাকুর মহাশয় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন—

এই মনোরমা ভূষণডাঙার সীতানাথবাবুর মেয়ে—গিরিজার মামা যাহার চাকরি করিতেন। সীতানাথ মারা গিয়াছেন। পাকা দাড়ি, মাথায় টাক—তিনি গিরিজাকে বড় ভালোবাসিতেন। পাশের খবর বাহির হইলে নিমন্ত্রণ করিয়া পুকুর হইতে মাছ ধরাইয়া কাতলা মাছের মস্ত মাথাটা তাহার পাতে দিয়াছিলেন। আর আদর-আপ্যায়ন যে কত, যেন ভূ-ভারতে এন্‌ট্রান্স পাশ আর কেহ করে নাই!

—পিতাঠাকুর মহাশয়ের মৃত্যুর পর হইতে যে কি দুর্দিন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা আর কি লিখিব। গত বৎসর বন্যায় চিতলমারির বাঁধাল ভাসিয়া যায়, ফলে ধানের এক চিটাও গোলায় উঠে নাই। আগের বৎসরের যাহা ছিল, তাহাতে কোনো গতিকে সংসার চলিতেছে। আপনার ভগ্নীপতিকে কতদিন হইতে সকলে মিলিয়া বলিতেছি যে ভদ্রলোকের ছেলের চাষবাস করিয়া পোষায় না, কলিকাতায় গিয়া চাকরি-বাকরি কর, কিন্তু এমন অবুঝ মানুষ কখন দেখি নাই। দুঃখের কথা আর কি লিখিব, মেজ খোকা ও ছোট খুকি আজ তিন মাসের বেশি ভুগিয়া ভুগিয়া অস্থিচর্মসার হইয়াছে, গঞ্জের ডাক্তার ডাকিয়া যে তাহাদের একবার দেখাইব এমন পয়সা নাই। অবশেষে উনি রাজি হইয়াছেন। জোত-জমি মোড়লদের সহিত ভাগ-বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া উনি আপনার কাছে যাইতেছেন। অতি সত্বর একটা চাকরি ঠিক করিয়া দিবেন, অন্যথা না হয়। শুনিলাম, আপনি খুব বড় একটা আপিসের বড়বাবু—সাহেবরা আপনার মুঠার মধ্যে। যেমন করিয়া পারেন, আপনার আপিসে ঢুকাইয়া লইবেন। ও বাড়ির সকলে কেমন আছেন তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

প্রণতা—শ্রীমনোরমা মিত্র

পুনশ্চ করিয়া লিখিয়াছে—

আগামী পরশ্ব সোমবার সকালেই উনি আপনার বাসায় পৌছিবেন। অবিলম্বে একটা চাকরি করিয়া না দিলে আমি তিনটি ছেলেমেয়ে লইয়া ভিটায় শুকাইয়া মরিব, আর উপায় নাই।

অর্থাৎ নীলমণির আগমন হইতেছে এবং যদি বাড়ি হইতে বাহির হইবার পথে হাঁচি-টিকটিকির কোন উপদ্রব না ঘটিয়া থাকে, মেজ খোকা ও ছোট খুকি নূতন কোনো গোলযোগ বাধাইয়া না বসে, তাহা হইলে মেলগাড়িতে সারারাত্রি জাগিয়া চোখ লাল ও গুঁড়া-কয়লায় সর্বাঙ্গ বোঝাই করিয়া এখনই এই বাড়িতে দর্শন দিবেন।

গিরিজার মনে পড়িয়া গেল, একটা সুযোগ আছে বটে। আজকালের মধ্যেই তার অফিসের হেড ক্লার্ক বাবু তিন মাসের লম্বা ছুটি লইয়া শরীর মেরামত করিতে পশ্চিমে যাইতেছেন। সেকেণ্ড ক্লার্ক তাঁর জায়গায় কাজ করিবেন। তাহা হইলে মাস তিনেকের জন্য আপাতত নীলমণিকে ঢুকাইয়া লওয়া যায়।

নীলমণির কপাল ভালো এবং গিরিজারও। কারণ, চাকরি না হইলে কতদিন যে এই বাসায় পড়িয়া অন্ন ধ্বংস করিত, বলা যায় না। পুঁটির স্বামীকে তো তাড়াইয়া দেওয়া যায় না!

পুঁটির নাম করিলেই কেন জানি না মনে আসে, কোথায় কবে সে একটা ছবি দেখিয়াছিল একটা লাউয়ের দুটা ঠ্যাং গজাইয়াছে—সেই ছবির কথা। লাউটি যেন গুটি-গুটি পা ফেলিয়া তাহার মামার নোটের খেতে শাক তুলিয়া বেড়াইত। কিন্তু আজ আর সে পুঁটি নাই– মনোরমা হইয়াছে এবং তিনটি ছেলেমেয়ের মা!

ঘরটা কেমন আঁধার-আঁধার ঠেকিতেছিল, গিরিজা উঠিয়া পুবের জানালাটা খুলিয়া দিল। সামনে একটা চারতলা বাড়ি দৃষ্টি আড়াল করিয়া খাড়া রহিয়াছে। বাড়ির পাশ দিয়া সরু গলি। গলির মাথায় একটুখানি ফাঁকা জমি, তাহাতে ক-টা নারিকেল গাছ। সকালের আলোয় গাছের পাতাগুলি ঝিলমিল করিয়া নড়িতেছে।

অনেকদিন—পুঁটির বিয়ের পর গিরিজা আর মামার বাড়ি যায় নাই। তারপর বয়স কতখানি ভাঁটাইয়া গিয়াছে—পুঁটিরও গিয়াছে। গিরিজা হালকা লোক নয়, ইদানীং কাজকর্ম করিয়াই সময় পায় না, কলিকাতার বাহিরে যে জীবজগৎ আছে এবং তাহার সঙ্গে ঐ জগতের একদিন যে নিবিড় পরিচয় ছিল, তাহা প্রায়ই ভুলিয়া বসিয়া থাকে। তবু পুঁটির সব কথা স্পষ্ট মনে পড়িল। সেই যে শ্যামল ছোট মেয়েটা রুক্ষ চুলের বোঝা কস্তাপেড়ে শাড়ির আঁচল এবং কালো ডাগর চোখ নাচাইয়া যেখানে সেখানে পাড়াময় ঘুরিয়া বেড়াইত–সে আজ গৃহিণী হইয়াছে, বড় কলসি কাঁখে করিয়া দীঘির ঘাটে জল আনিতে যায়, ধান ভানে, ছেলেমেয়ের খবরদারি করে, হয়তো বড়

জ্বালাতন হইলে ছেলে ঠেঙাইয়া আবার নিজেই কাঁদিতে বসে, কোন্দল করে, সারারাত জাগিয়া রোগা ছোট মেয়েটিকে বাতাস করে—এবং সেই পুঁটি আজ লিখিয়াছে, গিরিজা চাকরির যোগাড় করিয়া না দিলে তাহারা ভিটায় শুকাইয়া মরিবে।...

নিচে বাথরুমের কাছে অকস্মাৎ ভয়ানক রকমের বীররসের শুরু হইল, অর্থাৎ এতক্ষণে বড় ছেলের ঘুম ভাঙিয়াছে। আশ্চর্য নয়, রামায়ণে লেখা আছে—কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙিলে নাকি ত্রিভুবনসুদ্ধ কাঁপিত।

আর ভূষণডাঙায় এখন হয়তো গোবর-নিকানো কাঁচা দাওয়ার উপর চাটাই পাতিয়া বসিয়া মনোরমার ছেলে দুলিয়া দুলিয়া পড়া মুখস্থ করিতেছে, ঘুনশিতে বাঁধা গলার একরাশ নানা আকারের মাদুলি সঙ্গে সঙ্গে দুলিতেছে। মনোরমা খালের ঘাটে সেই বাঁকা তালগাছটার গুঁড়িতে বসিয়া মাজন দিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া কড়াই মাজিতেছে। তালগাছটা কি এতদিন বাঁচিয়া আছে? কবে উপড়াইয়া খালে পড়িয়া গিয়াছে, তার ঠিক নাই। একদিন কচি-তাল কাটিতে গিয়া ঐ গাছের বাগুড়ায় পা হড়কাইয়া গিরিজা পড়িয়া গিয়াছিল। খালের জলে পড়িয়াছিল বলিয়া লাগে নাই, কিন্তু পুঁটি বাড়িতে তার মাকে বলিয়া দিয়া মার খাওয়াইয়াছিল।...নীলমণিকে চাকরি করিয়া দিতেই হইবে। পুঁটি লিখিয়াছে, পুঁটি তার পর নয়। ঐ পুঁটির সঙ্গে একটা বড় সম্পর্ক ঘটিতে ঘটিতে বড় বাঁচিয়া গিয়াছে। সেটা গিরিজার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়।

গিরিজার পাশের খবর আসিল এবং সীতানাথ নিমন্ত্রণ করিয়া কাতলা মাছের মুড়া খাওয়াইলেন। সেই দিন সন্ধ্যায় মামা মায়ের সঙ্গে তার বিয়ের কথা বলিতেছেন। নিজের বিয়ের প্রসঙ্গ কে না শুনিতে চায়? গিরিজাও চুরি করিয়া শুনিল। সীতানাথবাবু বড় ধরিয়াছেন, তাঁহার ছেলে নাই, ভিটায় প্রদীপ জ্বলিবে না, সেই আশঙ্কায় পুঁটিকে গিরিজার হাতে সমর্পণ করিয়া তাকে ঘরজামাই করিয়া রাখিতে চান। মামা সীতানাথের নানাবিধ আয়ের বিস্তৃত ফিরিস্তি দিয়া গিরিজা যে কতদূর সুখে থাকিবে উৎফুল্ল মুখে তাহার পরিমাণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছিলেন। ম্লান দীপালোকে মায়ের মুখ-ভাবটা ঠিক ঠাহর হইতেছিল না, তিনিও বোধকরি বিমুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিলেন—কিন্তু সে ঘর-জামাই হইবে এবং পুঁটি তাহার বউ হইবে, কোনোটাই গিরিজার ভালো লাগিল না। আলো জ্বালাইয়া ঢোল ও সানাই বাজাইয়া পালকি চড়িয়া ক্রোশের পর ক্রোশ মাঠ বাঁওড় ধানখেত ও বাঁশবাগান পার হইয়া এক নূতন গ্রামে যাইবে, তারপর শুভদৃষ্টির সময়ে একখানি খাসা টুকটুকে মুখ দেখিবে যাহাকে সে আর কোনোদিন দেখে নাই। সে কেমন মজা! আর এই পুঁটি

লালচেলিতে সর্বাঙ্গ মুড়িয়া জবুথবু হইয়া তাহার পাশে দাঁড়াইবে একথা ভাবিতেই হাসি পায়।

পরদিন সকালবেলা রথখোলার গাছে চড়িয়া সে জামরুল খাইতেছিল, দেখিল পুঁটি চলিয়াছে। ডাকিল—এই দাঁড়া। পুঁটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল—না, দাঁড়াবার কি জো আছে, আজ যে আমার ছেলের সঙ্গে চারুর মেয়ের বিয়ে। কালা-দার কাছে যাচ্ছি, কলার খোলার পালকি করে দেবে বলেছে·· ও গিরি-দা, দুটো ভালো জামরুল ছুঁড়ে দাও না—

বলিয়া পুঁটি লোলুপ চোখে গাছটির দিকে চাহিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

গিরিজা ভাবী বধূর সঙ্গে প্রেম-সম্ভাষণ শুরু করিল—তোকে ছাই দেব মুখপুড়ি, দাঁড়াতে বললাম—তা নয় ফরফরিয়ে চললেন কালার কাছে। যাক না এই ক-টা মাস—আসুক অঘ্রান, তারপরে দেখে নেব। তখন কালার কাছে গেলে ধরব চুলের মুঠি—

পুঁটি রাগিয়া বলিল—সকালবেলা গাল-মন্দ কোরো না বলছি। জেঠাইমাকে যদি না বলে দিই—

গিরিজা নিরুদ্বেগ কণ্ঠে কহিল—বলগে যা। তাতে আর কিছু হচ্ছে না মণি। বাড়িতে শুনে দেখিস—তোর সঙ্গে আমার বিয়ে। আগে হয়ে যাক, মজাটা টের পাবি। তখন কথার উপর জবাব করলে পিঠের উপর তিন কিল—

বলিয়া গাছের উপর হইতেই উদ্দেশে শূন্যে মুষ্টি সঞ্চালন করিল।

এই নিদারুণ সম্ভাবনার কথা শুনিয়া পুঁটির মুখখানা কেমন হইয়া গেল, আর ঝগড়া করিতে জোর পাইল না। তবু অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মুখ ঘুরাইয়া বলিল—ধ্যেৎ!

—সত্যি কিনা বুঝতে পারবি তখন। নে—নে— আর দেমাক করে চলে যায় না, এই কটা নিয়ে যা। সে কয়েকটা জামরুল ছুঁড়িয়া দিল। কিন্তু পুঁটি লইল না।

গিরিজা ভাবিল, বিবাহ করিলে পুঁটিটাকে কিন্তু খুব জব্দ করা যায়। সেদিন ছিপ তৈরির সময় একটু ধরিয়া দিতে বলিয়াছিল, তা মুখের উপর না বলিয়া চলিয়া গেল। আর একদিন পুঁটির মার তাস চুরি করিয়া ঢেঁকিশালে বসিয়া কজনে খেলিতেছিল। একখানা পঞ্জা হয় হয়, আর সেই সময় কিনা পুঁটি মাকে ডাকিয়া আনিয়া বকুনি খাওয়াইয়া তাস কাড়িয়া লইয়া চলিয়া গেল! কিন্তু বউ হইলে এ সকল চলিবে না, তখন গিরিজা যা বলে তাই করিতে হইবে এবং যাহার কাছে নালিশ করুক গিরিজাই হইবে হাইকোর্ট। আর তখন পুঁটিদের

দক্ষিণের ঘরে তক্তাপোশের উপর বসিয়া সকলের সামনে শাশুড়ির ঐ তাস লইয়া সে বিন্তি খেলা করিবে তবে ছাড়িবে।

কিন্তু অগ্রহায়ণ মাসে সুপারি-কাটা হইতে আরম্ভ করিয়া কানের বাজু কণ্ঠমালা সমস্তই গড়ানো সারা, তবু বিবাহ হইল না। নূতন ঠাণ্ডা পড়িয়াছে, আগের দিন সীতানাথের স্ত্রী আসন্ন শুভকার্যের খরচের জন্ত অনেক রাত্রি অবধি চিঁড়া কুটিলেন। পরদিন আর উঠিতে পারিলেন না, বুকে বড় ব্যথা। এবং একুশ দিনের দিন পাড়ার সকলে তাঁহার মাথা ভরিয়া সিঁদুর ও দুই পায়ে আলতা পরাইয়া চিতায় তুলিয়া দিয়া আসিল। শুভকর্মে বাধা পড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে গিরিজা এক দূরসম্পর্কীয় পিসে মহাশয়ের সঙ্গে চাকরি করিতে কলিকাতায় গেল। মাস দুই উমেদারি করিয়া চাকরি জুটিল—এক মার্চেণ্ট অফিসে বিল-সরকারি। কয়েক মাস পরে ইহা ছাড়িয়া দিয়া কাঁকিনাড়ায় একটা পাটকলে ঢুকিল, কুলিদের হাজিরা লিখিবার কাজ। চাকরিটা ভালো—দু-চার পয়সা উপরি আছে। তাহার পর তিরিশ বছর উপরওয়ালার মন ভিজাইবার নানা কৌশল আয়ত্ত করিয়া আজ সেখানকার বড়বাবু হইয়াছে।

চাকরির প্রথম কয়েক বছর মা ভাইয়ের বাড়িতেই ছিলেন এবং গিরিজার ভূষণডাঙায় যাতায়াত ছিল। একবার পূজার সময় সীতানাথ তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—আর কেন বাবা পরের গোলামি করে শরীরের এই হাল করছ? আয়না ধরে দেখো তো কি দশা হয়েছে! আফিসের খাটনি কি সোজা? তুমি বরঞ্চ এই মরসুম থেকে খেতের কাজ দেখো। বুড়ো হয়েছি, আর পেরে উঠি নে। যা কিছু খুদ-কুঁড়ো আছে তোমরা বুঝে-সুজে নাও। গড়িমসি করে ক-বছর কেটে গেল, এবারে আর দুহাত এক না করে ছাড়ছি নে।

গিরিজা জবাব দেয় নাই, ঘাড় নিচু করিয়া হবু-জামাইদের যেমনটি হইতে হয়, তেমনি ভাবে চলিয়া গেল। কিন্তু ঐ যে ঠায় রৌদ্রে তেপান্তরের মাঠের মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়া খেতের মাটি উপযুক্তরূপ গুঁড়ানো হইল কি না এবং আরও কত বোঝা সার উহাতে ঢালিতে হইবে—এই সব তদারক করিয়া বেড়ানো মোটেই ভদ্রতাসঙ্গত বলিয়া ঠেকিল না।

একটু পরে সে রান্নাঘরের মধ্যে পুঁটিকে আবিষ্কার করিয়া বলিল—পুঁটি, একটু চা করে দে না লক্ষ্মীটি। পুঁটির বয়স বাড়িয়াছে, চোখের তারা একটু বেশি স্থির ও যেন বেশি কালো হইয়াছে। সে খাসা চা তৈয়ারি করে।

পুঁটি চা করিতে লাগিল। গিরিজা কলিকাতার গল্প শুরু করিল। শহরের গল্প শুনিতে পুঁটির বড় ভালো লাগে। সেখানে রেড়ির তেল দিয়া

প্রদীপ জ্বালাইতে হয় না, কল টিপিলেই আপনি জ্বলিয়া উঠে। আকাশে যে ঝিলিক মারে উহাকে সাহেবেরা তারের ভিতর পুরিয়া রাখিয়াছে, বড় বড় গাড়ি ঐ তার ছুঁইয়াছে কি গড়গড় করিয়া চলিতে থাকে। সকল কথা পুঁটি বিশ্বাস করে না। তবে চিড়িয়াখানা ও বায়োস্কোপ তাহার বড় দেখিতে ইচ্ছা করে। বর্ণ-পরিচয় যখন তাহার শেষ হইল তখন প্রথম পাতার নিচে বানান করিয়া দেখিল লেখা আছে কলিকাতা। তারপর সে পড়িয়াছে—শিশুশিক্ষা, পাক-প্রণালী, মহাভারত, কঙ্কাবতী, কুঞ্জলতার মনের কথা—কত বই! সব বইয়ে সেই এক জায়গার নাম দেখিয়াছে, কলিকাতা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বইওয়ালা কলিকাতায় বসিয়া বই তৈয়ারি করে। কলিকাতা শহরটা তার বড় দেখিতে ইচ্ছা করে। ফস করিয়া বলিল—আমাকে একবার নিয়ে যাবেন কলকাতায়?

গিরিজা তাহার দিকে একটুখানি চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল—যাবই তো। বাধা পড়ে গেল যে—নইলে এতদিন কোন কালে নিয়ে যেতাম—

গিরিজার হাসি দেখিয়া পুঁটির খেয়াল হইল। সে লজ্জায় মরিয়া গেল—আর কথা না কহিয়া চা করিয়া দিয়া ওঘরে চলিয়া গেল।

মাস কয়েক পরে সীতানাথ সদম্ভে একদিন চাটুজ্জের আটচালায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—খেপেছ দাদা, ঐ চটকলের কুলির হাতে মেয়ে দেব আমি? কাজ তো কুলির সর্দার, ইজ্জতের সীমা নেই! কুলিরা হপ্তাভোর খেটে যা রোজ পাবে, তার উপর ভাগ বসানো—ও চাকরি ক-দিন? যেদিন সাহেবেরা টের পাবে গলাধাক্কা দিয়ে দূর করে দেবে। আমি ঐ নীলমণির সঙ্গে কথা পাকা করলাম। খাসা ছেলে, মুখে কথাটি নেই। পাশ-টাশ নাই বা করেছে, পাশ করেই বা কে কি করছে—

তিন-চার দিনের মধ্যেই সীতানাথের উষ্মার হেতুটা সকলের কাছে প্রকাশ পাইয়া গেল। গিরিজা কাহাকেও কিছু না জানাইয়া বিবাহ করিয়া বসিয়াছে। কি করিয়া কবে যে সুমতির সঙ্গে এই বিবাহের আয়োজন শুরু, তাহা সে-ই বলিতে পারে। গিরিজা শুনিয়াছিল, সুমতি শহুরে মেয়ে, চালাক চতুর, আবার ইংরাজি পড়িয়াছে। তাহার প্রমাণ পাইতেও দেরি হইল না। ফুলশয্যার রাত্রিতে আর উৎকণ্ঠা দমন করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—সুমতি, তুমি ইংরাজি জান? সুমতি বলিল—না। গিরিজা দমিয়া গিয়া বলিল—সে কি? শুনলাম তুমি ন্যাড়াগির্জে মেয়েদের ইস্কুলে পড়েছ। সুমতি কহিল—ফার্স্ট-বুকের খানিকটা পড়েছিলাম, তা কিচ্ছু মনে নেই। গিরিজা বলিল—মনে নেই? কখ্খনো নয়, ও তোমার দুষ্টুমি। আচ্ছা বল তো দি র‍্যাম মানে

কি? সুমতি একটুখানি ভাবিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া চুপি-চুপি বলিল—বর।

শুভঙ্করের বাক্য, মিথ্যা হইল না। সুমতি যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিল, সেই প্রকারই ফলিয়া গিয়াছে। গিরিজার অবস্থা ভালো হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর বড়দরের আত্মীয়-স্বজন জুটিয়াছে। ঐ সবের সঙ্গে চলিবার কায়দা গিরিজা আজও দুরস্ত করিতে পারে নাই। কিন্তু সুমতি ভারি ভারি সিন্দুক ও আলমারির চাবিগুলি এবং ততোধিক ভারি আত্মীয় সম্প্রদায় মায় গিরিজাকে পর্যন্ত অক্লেশে বহিয়া বেড়ায়। আজ পঞ্চাশের পারে পৌছিয়া সংসারের রথচক্রের বিরাট বহর দেখিয়া গিরিজা ঘাবড়াইয়া যায় এবং ভাবে, ভাগ্যিস মেষশিশুর মতো হাবা নিতান্ত আনাড়ি ঐ মনোরমার সঙ্গে তার বিয়ে হয় নাই!

সীতানাথবাবু পাটোয়ারী ব্যক্তি, মনে যাহাই থাকুক বাহিরে কোনো কাজে কাহারও খুঁত ধরিবার সাধ্য নাই। নীলমণির সঙ্গে বিবাহ সাব্যস্ত হইলে যথাসময়ে গিরিজার কাছে পোস্টকার্ডের চিঠি আসিল যে মনোরমা তাহার বোনের সামিল, অতএব গিরিজাকেই খাটিয়া-খুটিয়া শুভকর্মটি সুসম্পন্ন করিতে হইবে। গিরিজা অফিসের ছুটি করিয়া পতিব্রতা-মার্কা সিঁদুরকৌটা এবং একজোড়া গিনি সোনার শাঁখা কিনিয়া যথাসময়ে ভুষণডাঙায় পৌছিল। মামি-ঠাকরুন আর অকারণ বিলম্ব করিলেন না, সীতানাথ যে তাহাকে চট-কলের কুলি বলিয়াছেন—পৌছিবামাত্রই যথাসম্ভব গুছাইয়া বর্ণনা করিলেন এবং মন্তব্য করিলেন—ঐ কৌটায় সিঁদুর ভরিয়া না দিয়া বাসি উনান হইতে বিনামূল্যের বস্তু-বিশেষ ভরতি করিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু গিরিজা খুব খাটিল, আগাগোড়া পরিবেশন করিল, চেঁচাইয়া গলা ভাঙিল, নীলমণির মাথায় দইয়ের হাঁড়ি উপুড় করিয়া মাঘের রাত্রিতে তাহাকে নাওয়াইয়া তবে ছাড়িল।

খাটিয়া-খুটিয়া সকলে বিয়ে-বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে শুইয়া পড়িয়াছে। ফরাসের উপর ঢালা বিছানা এবং গিরিজার ঠিক পাশেই তাহার মামা, তাঁহার বোধকরি একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। পাড়ার বউ-ঝিরা বিদায় লইয়াছেন, বাসরঘরে আর গণ্ডগোল নাই। বরের সঙ্গে পুঁটি কিরূপ প্রেমালাপ করিতেছে, সেটা গিরিজা একটু দেখিবার প্রয়োজন বোধ করিল। কিন্তু মামার নিদ্রাকে বিশ্বাস নাই। বুড়া বয়সে কাশির দোষ তো আছেই, তা ছাড়া রাত্রির মধ্যে অন্তত বার আষ্টেক তামাকের পিপাসা হয়। এখনই হয়তো টিকা ধরাইতে বসিবেন এবং পাশে গিরিজাকে না দেখিলে যতগুলি ভদ্রলোক এখানে ঘুমাইতেছেন সকলকে জাগাইয়া রীতিমত তদন্ত শুরু হইবে। গিরিজা মাথার বালিশটার

উপর পাশবালিশটা শোয়াইল এবং পাশবালিশের আগাগোড়া লেপমুড়ি দিয়া খাট হইতে নামিয়া আসিল। নিচে মেজের উপর কখন আসিয়া শুইয়াছে ও-বাড়ির ছোকরা চাকর বনমালী। গিরিজা তাহা জানে না, অন্ধকারে তাহার ঘাড়ের উপর পা চাপাইয়া দিতেই সে হাউমাউ করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মাতুল মহাশয়ের ঘুম ভাঙিল এবং আতঙ্কে কণ্টকিত হইয়া আরম্ভ করিলেন—কি! কি! কি! গিরিজা চট করিয়া মেজের উপর বসিয়া পড়িয়া বনমালীর মুখে হাত দিল। ব্যাপারটি বুঝিয়া ফেলিয়া বনমালী সামলাইয়া বলিল—কিছু নয়—একটা বেড়াল। হামাগুড়ি দিয়া গিরিজা বাহিরে আসিল। তারপর বাসরঘরের বেড়ার বাখারি ফাঁক করিয়া সমস্ত শীতের রাত্রি ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু পুঁটি চেলি জড়াইয়া ভৌগোলিক পৃথিবীর মতো গোলাকার হইয়া পড়িয়া ছিল। বেচারা নীলমণি চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। সোহাগ অভিমান ক্রোধ—মায় দোরের খিল খুলিয়া বাহির হইবার উপক্রম পর্যন্ত, কিন্তু তাহাতে অন্যপক্ষের চুড়িগাছি পর্যন্ত নড়িল না। হতোৎসাহ হইয়া অবশেষে নীলমণি নির্বিকল্প সমাধি অবলম্বন করিল। নীলমণির দুর্গতি দেখিয়া গিরিজা সেদিন খুব খুশি হইয়াছিল।

নিচে অরগ্যান বাজিয়া উঠিল, গানের মাস্টার আসিয়াছেন। তৎসহ সঙ্গীত, মিনার গলা—'রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি'। মিনারা তবে বেড়াইয়া ফিরিয়াছে! গিরিজা ভাবিল, ওখানে গিয়া বলিয়া আসে—বাপু হে, তোমরা ছাত্রী-শিক্ষকে মিলিয়া যে কাণ্ডটা করিতেছ ওটা কি ঠিক বাঁশির আওয়াজের মতো হইতেছে, না হৈ-রৈ শব্দে কাহাকেও বাঁশ লইয়া তাড়াইয়া যাওয়া? টেবিলে আর যে চিঠিগুলা পড়িয়া ছিল, গিরিজা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

প্রথমখানি চিঠি নহে—ওরিয়েন্টাল কিউরো শপের বিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রটি আবার কলারসিক। ঘর সাজাইবার জন্য তিনি একটি একহাতপ্রমাণ পাথরের নটরাজের মূর্তি কিনিয়াছেন। কণিষ্কের প্রপিতামহের আমলের মূর্তি—তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে—সে হিসাবে দাম খুব সস্তা, মোটে পঁচাত্তর টাকা। মূর্তিটির নাক নাই বলিয়া দাম কষিয়া বাদ দিয়া দাঁড়াইয়াছে একাত্তর টাকা পাঁচ আনা।

পরেরখানি জ্ঞানদায়িনী সভার সম্পাদক লিখিয়াছেন। চারি পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া অভিধানের প্রচুর জ্ঞান জাহির করিয়া গিরিজাকে বিবিধ বিশেষণে অভিহিত করণান্তর স্থূলকথাটি নিচে ব্যক্ত করিয়াছেন—কিঞ্চিৎ চাই।

তৃতীয়খানা নিতাইচাঁদ দাসের চিঠি। দাস মহাশয় বৈষ্ণব সজ্জন, ভাষাও

বিনীত। সবিনয়ে জানাইয়াছেন --শতকরা মাত্র আঠারো টাকা সুদ ধরিয়াও হ্যাণ্ডনোট সুদে-আসলে অনেক দাঁড়াইয়াছে। সকাল বিকাল বাসায় আসিয়াও নিতান্ত দুরদৃষ্টবশত গিরিজার ধরা পাওয়া যায় না। গিরিজার ন্যায় মহৎ ব্যক্তি তাহার মতো কীটাণুকীটের প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিয়া অক্লেশে এতদিন মিটাইয়া দিতে পারিতেন। তিন দিনের মধ্যে নিতান্তই যদি কোনো ব্যবস্থা না হয় তবে দাস মহাশয় অতীব দুঃখের সহিত আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিবেন।

তার পরেরখানির উপরে ছাপা—দি গ্রেট বেঙ্গল মোটর ওয়ার্কস। পেট্রোলের দাম বাকি।

তারপর, ছক্কড়লাল ক্ষেত্রি—

অতঃপর, পি. মুদেলিয়ার এণ্ড কোং—

অন্যান্যগুলি গিরিজা আর পড়িল না। এইসব চিঠি পড়িয়া ইদানীং তাহার আর উদ্বেগ-আশঙ্কা হয় না। আজ বছর পাঁচেক ধরিয়া দিনের পর দিন এমনই আসিয়া থাকে, তাহাতে নূতন কিছু নাই। চিঠিগুলি ব্লটিং-প্যাডের উপর হইতে ঠেলিয়া রাখিয়া মনোরমার চিঠিখানি সে আর-একবার পড়িল।

পড়িতে পড়িতে দুঃখ হইল, আজ সীতানাথবাবু যে বাঁচিয়া নাই! থাকিলে দেখিতে পাইতেন, চটকলের কুলি বলিয়া একদিন যাহাকে গালি দিয়াছিলেন, তাহার কাছে তাঁর মেয়ে কত করিয়া চিঠি দিয়াছে। ইচ্ছা করিলে সে অক্লেশে নীলমণির চাকরি করিয়া দিতে পারে। আর যদি তাহাকে তাড়াইয়া দেয়, তবে নীলমণি গ্রামের ভিটায় ফিরিয়া মনোরমার সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া অনাহারে শুকাইবে।

আবার সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হইল, সীতানাথ বাঁচিয়া থাকিলে অবশ্য চমৎকার হইত—কিন্তু তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে এবং আশঙ্কার বিষয় স্বর্গ হইতে নাকি সর্বত্র নজর চলে। এই যে চিঠির গোছা গিরিজা একপাশে ঠেলিয়া রাখিল—কলিকাতা শহরের কত লোকের সঙ্গে তাহার আনাগোনা, কেহই ইহার খবর রাখে না। কিন্তু এগুলি সেই স্বর্গীয় পাটোয়ারি ব্যক্তিটির নজর এড়াইতে পারিয়াছে তো?

গিরিজা তখন খুব ছোট, একদিন কি খেয়াল চাপিয়াছিল—তার ছোট রাঙা ছাতাটা মাথায় দিয়া হনহন করিয়া বড় রাস্তা দিয়া গঙ্গামুখো চলিয়াছিল। মা পিছন হইতে ডাকিতেছিলেন—ও খোকা, যাস নে—ফিরে আয়, ফিরে আয়। খোকা শুনিল না, এক-একবার পিছন ফিরিয়া মায়ের দিকে তাকায়, হাসে, আরো জোরে জোরে চলে। তারপর মা ছুটিয়া আসিয়া তাকে কোলে

করিয়া ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। ঘটনাটা কিছুই নয়, ভূষণডাঙার কথা ভাবিতে এমনই মনে পড়িয়া গেল যে তাহার মা বাঁচিয়া নাই।

সেই গ্রামটিকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করে। এখন যাহারা খালে ছিপ-বড়শিতে মাছ ধরিয়া বেড়ায়, কেহই গিরিজাকে চিনিতে পারিবে না। আর এই বুড়া বয়সে সে যদি তলতাবাঁশের ছিপ কাটিয়া খালের পাড়ে তাহাদের পাশে বসিতে যায়—কেবল হাস্যকর নহে, এখনই ছক্কড়লাল-নিমাইচাঁদ-সুমতি-কোম্পানি ব্যাপারটি রীতিমত মর্মান্তিক করিয়া তুলিবেন। গত বৎসর গিরিজার নিউমোনিয়া হইয়াছিল। বড় বড় ডাক্তার ডাকিয়া এবং বিস্তর তদ্বির করিয়া সুমতি ও পুত্রকন্যারা তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছিল—বোধ-করি তাহার অভাবে বাসাখরচের অসুবিধা ঘটিবে এই আশঙ্কায়। যমালয়ে পলাইয়াও যে স্বস্তি পাইবে সে পথ ইহারা মারিয়া রাখিয়াছে। মা বাঁচিয়া থাকিলে এবার একবার ভূষণডাঙায় বেড়াইয়া আসিত। মনোরমার বিয়ের পর আর ওদিকে যাওয়া ঘটে নাই।

মনোরমার বিয়ের পরদিন গিরিজা সকাল সকাল খাইয়া ট্রেন ধরিবার জন্য ছুটিতেছিল। বিলের প্রান্তে আমবাগানের সরু পথে আসিয়া পড়িয়াছে, এমন সময় পিছনে গ্রামের মধ্যে বাসি-বিয়ের সানাই বাজিয়া উঠিল। বিলের মধ্যে পড়িয়া আর শুনা গেল না। এই সমস্ত গিরিজা ভুলিয়া গিয়াছিল। আজ কত বৎসর পরে যৌবন পার হইয়া আসিয়া মনোরমার চিঠির সঙ্গে যেন সেই সানাইয়ের একটুখানি সুর কানের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। পুঁটির সঙ্গে যখন তার বিয়ের কথা চলিতেছিল, পুঁটি বলিয়াছিল—আমাকে নিয়ে যাবেন কলকাতায়? আর সে জবাব দিয়াছিল—যাবই তো। আজ যদি জীবনের সেই মোহনায় ফিরিয়া গিয়া পুঁটির সঙ্গে তার দেখা হয়, গিরিজা ঠিক বলিত—ওরে মুখপুড়ি, তোর এ দুর্বুদ্ধি কেন হইয়াছে? ঐ খালের ঘাট আউশধান ও পাটে ভরা হন্সের বিল, তকতকে নিকানো আঙিনাটুকুন—এসব ফেলিয়া কোথাও টিঁকিতে পারিবি, ভাবিয়াছিস?—এবং যদি সত্যই পুঁটির সঙ্গে তার বিয়ে হইয়া যাইত, অভাবের মধ্যে পুঁটি ঝগড়া করিত, কাঁদাকাটা করিত, তবে বড় অসহ্য হইলে ছাতা মাথায় সে পাটের খেতের ধারে গিয়া বসিত, তবু নীলমণির মতো এখানে ধরনা দিতে আসিত না।

নিচে হইতে সাড়া আসিল—গিরিজাবাবু আছেন? গলাটা নিতাইচাঁদের মতন। দরজার কাছে মিনাকে দেখা গেল, গিরিজা ডাকিয়া বলিল—যাও, বলে এসগে বাবা বাড়ি নেই। মিনা থোপা-থোপা চুল নাচাইয়া নিচে ছুটিল।

মিনা মেয়ে ভাল ; বয়স কম হইলে কি হয়, খাসা গুছাইয়া বলিতে শিখিয়াছে।

নিচে হইতে পুনশ্চ শোনা গেল—আচ্ছা খুকি, বাড়ির ভেতর বলগে ভূষণডাঙা থেকে এক বাবু এসেছেন, এখানেই থাকবেন।

অতএব নীলমণি আসিয়াছে, নিতাইচাঁদ নয়। গিরিজা নিচে নামিল। বলিল—এসেছ ? বেশ বেশ···থাকো দু-চার দিন। আর, চাকরির যা অবস্থা —সব অফিস থেকে লোক কমাচ্ছে। সন্ধান পেলে তোমাকে চিঠি লিখে জানাব। কিন্তু চাকরির লোভে এখনকার এই পাটের মরসুমটা যেন নষ্ট কোরো না ভায়া···

ন র বাঁ ধ

ছোটকাকার বিয়ের বরযাত্রী হইয়া চলিয়াছিলাম। তিন ক্রোশ পথ পায়ে হাঁটিয়া কানাইডাঙার ঘাটে নৌকা চাপিতে হইবে।

সে আজিকার কথা নয়, তখন বয়স আমার নয় কি দশ। এই উপলক্ষে বেগুনি রঙের ছিটের জামা এবং একজোড়া মোজাজুতা কেনা হইয়াছে। সেই নূতন জামা গায়ে দিয়া অতি সন্তর্পণে পথ চলিতেছি, ধূলা না লাগে। আর আর ছেলেরা যাইতেছিল, তাহাদের বেগুনি জামা নাই, অনুকম্পার সহিত মাঝে মাঝে তাহাদিগকে তাকাইয়া দেখিতেছি। মেঠো পথে খারাপ হইয়া যাইবার আশঙ্কায় জুতাজোড়া পরিতে মন সরে নাই, খবরের কাগজে জড়াইয়া বগলে লইয়াছি। বরের পাল্কি ও বাজনদার আগে আগে চলিয়া গিয়াছে, পিছনে পড়িয়া আমরা। ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল। ডোঙাঘাটা ছাড়াইলাম, তারপর সাগরদত্তকাটি গ্রামের খেজুরবন, তারপর ভাঙা-মসজিদ, সারি সারি তিনটা তেঁতুলগাছ, শেষে কুমোরপাড়ার বড় বাঁশবাগানটা পার হইয়া একেবারে ফাঁকা বিলের মধ্যে।

ধানের সময়। ধানবন ওপারের গাছপালার গোড়া অবধি চলিয়া গিয়াছে, ধানের গোছায় কোনখানে বিলের জল দেখিবার উপায় নাই। আর দেখিলাম, তেপান্তর ভেদ করিয়া উত্তর-দক্ষিণে সোজাসুজি সারবন্দি চলিয়া গিয়াছে বড় বড় শিরিষ গাছ। বিলের মধ্যে অমন করিয়া গাছ পুঁতিয়া রাখিয়াছে কে ? বড় আশ্চর্য লাগিল।

ধার্মিক দত্ত গ্রাম সম্পর্কে ঠাকুরদাদা, বুড়া লাঠি ঠক ঠক করিয়া পাশে পাশে

যাইতেছিলেন। কথাটা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন, শুধু কি গাছ? এইটুকু এগিয়ে আয়, দেখবি কত্তো বড় রাস্তা। বল্লভ রায়ের নাম শুনিস নি?

নামটা বরাবরই শুনিয়া থাকি, সেই রাস্তার উপর দিয়া তবে আজ যাইতে হইবে।

রাস্তার উপর গিয়া যখন উঠিলাম, বিস্তার দেখিয়া সত্যসত্যই তাক লাগিয়া গেল! দত্তবুড়াকে পুনরায় কি একটা প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু দেখি হাতের লাঠিটা ফেলিয়া একটা শিরিষগাছের গোড়ায় বসিয়া পড়িয়া ইতিমধ্যেই তিনি ভাবে গদগদ হইয়াছেন। বলিতে লাগিলেন, দেখেছ ভায়ারা, লক্ষ্মী ঠাকরুণের দয়াটা একবার দেখ। মরি মরি, যেন দুহাতে ঢেলেছেন।...এই পুঁটিমারির বিলে আমার লাখেরাজ ছিল আড়াই বিঘে। সে কি আজকের? রূপচাঁদ রায়ের দত্ত দেবোত্তর। নিবারণ চক্কোত্তি তাহা ফাঁকি দিয়ে নিলে! ওর ভাল হবে কখনো!

মন্মথচরণ কহিল,—আবার বসে পড়লেন কেন দত্তমশায়? চলুন—চলুন, জায়গা খারাপ, আঁধার না হতে এইটুকু পার হতে হবে।

দত্ত মহাশয় আঙুল দিয়া আর একটা গাছের গোড়া নির্দেশ করিয়া কহিলেন, ও মন্মথ, তুমিও একটুখানি বসে নাও না। ছোট ছোট ছেলেপিলে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, না জিরিয়ে নিলে ওদের হাঁপ ধরে যাবে যে।

বলিয়া বুড়া নিজেই প্রবল বেগে হাঁপাইতে লাগিলেন।

কিন্তু সকলে সমস্বরে না—না করিয়া দত্তের প্রস্তাবটা উড়াইয়া দিল।

সে কি করে হবে? নরবাঁধ পার না হয়ে বসাবসি নেই। লাখ টাকা দিলেও রাত্তিরবেলা অশ্বত্থতলা দিয়ে যাওয়া যাবে না। তাড়াতাড়ি হেঁটে চলুন মশাইরা সব। তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি—আরো।—

ফলে উলটা উৎপত্তি হইল। বিশ্রাম তো পড়িয়া মরুক, ইহার পর যে কাণ্ড আরম্ভ হইল, তাহাকে হাঁটিয়া যাওয়া কোনক্রমে বলা চলে না। ছোট বড় গুণতি করিয়া আমাদের দলে বরযাত্রী জন চল্লিশের কম হইবে না। এবার একা দ্বারিক দত্ত নয়, সকলেই দস্তুরমতো হাঁপাইতে লাগিল।

হরিজেঠা আসিয়া আমার হাত ধরিলেন। বলিলেন, শিবু, আর একটু—উই যে সামনে মস্ত উঁচুমাথা অশ্বত্থগাছ—ঐ ঐ, ঐখানে। নরবাঁধটা পার হয়ে তারপর আস্তে আস্তে চলব।

আমার কান্না পাইতেছিল। বলিলাম, আর কতদূর?

জেঠা বলিলেন, কানাইডাঙা? পথ আর বেশি নেই। নরবাঁধের পর বাঁয়ে একটা ভাঙাড়—সেইটা দিয়ে রসিটাক এগুলে গাঙ পড়বে।

সন্ধ্যার আগেই বড় একটা খালের ধারে পৌছান গেল। জেঠা বলিলেন, এই নরবাঁধ। এদিক ওদিক তাকাইয়া দেখি, বাঁধের চিহ্ন কোন দিকে কিছু নাই, কেবল খালটি মাত্র। লাখ টাকা দিলেও রাত্রিবেলা যে অশ্বত্থতলা দিয়া এই চল্লিশটা মানুষ একসঙ্গে যাইতে স্বীকার করিবে না, সেই গাছটি দেখিলাম। কেন যে সকলের এত ভয়, ডালপালা-মেলা সুপ্রাচীন গাছের চেহারা দেখিলে তৎক্ষণাৎ বোঝা যায়। আমার তো সেই দিনের বেলাতেই গা ছম-ছম করিতে লাগিল।

সকলে কাপড়-জামা খুলিয়া পুঁটুলি বাঁধিয়া লইল। আমি হরি জেঠার কাঁধে চড়িলাম এবং আমার কাঁধে কাগজে মোড়া সেই নূতন জুতাজোড়া। জিজ্ঞাসা করিলাম, জেঠা, বাঁধ কই?

দুইধারে বাঁশের খোঁটা পোতা, তাহার মধ্যে দিয়া জল ভাঙ্গিয়া সকলে চলিয়াছি। সেই বাঁশ দেখাইয়া জেঠা কহিলেন, বাঁধ ভেসে গেছে বর্ষার টানে, বাঁশগুলো আছে। আবার মাঘ মাসে জল কমলে চাষীরা নতুন করে বেঁধে দেবে।

কে-একজন পিছনে আসিতেছিল, তাহার নামটা মনে নাই, কহিল চাষা-বেটাদের বুদ্ধি দেখ না—ফি বছর এই রকম গতর ঘামিয়ে পয়সা খরচ করে বাঁধ-বাঁধবে, তার চেয়ে একবার এক পাঁজা ইট পুড়িয়ে যদি দুইধার পাকা করে বেঁধে দেয়, ব্যস।

দ্বারিক দত্ত কোথায় ছিলেন, হঠাৎ দেখি জলের মধ্যে লাঠি খোঁচাইতে খোঁচাইতে কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন। বলিলেন, কি বললেন, পাকা ইটের গাঁথনি হলেই বাঁধ টিকে থাকবে? সে আর হতে হয় না। বল্লভ রায়ের টাকা তো কম ছিল না বাপু, পারলেন না কেন? টাকায় এসব হয় না। একটা নরবলি দিয়ে এইটুকু চড়া পড়েছে, সহস্র নরবলি হলে তবে যদি মা-কালী খুশি হয়ে খাল ভরাট করে দেন—

ভয়ে সর্বদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। এইখানে মানুষ বলি হইয়াছিল নাকি? আবার হয়তো অনাগত দিবসে কে কবে আসিয়া সহস্র বলি দিয়া আগাগোড়া খাল ভরাট করিয়া দিবে। জল বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে হরি জেঠার বুক অবধি তলাইয়া গেল। আমি চুপটি করিয়া কাঁধের উপর বসিয়া আছি। দ্বারিক দত্তর উদ্দেশে প্রশ্ন করিলাম, ও বুড়ো দাদা, এখানে নরবলি হয়েছিল নাকি?

দ্বারিক দত্ত উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু হরি জেঠার বোধকরি মনে মনে ভয় হইয়াছিল। বিরক্তভাবে প্রশ্ন থামাইয়া দিলেন, বক বক কোরো না শিবু, শক্ত করে ধরে বোসো।

তখন হইল না, কিন্তু সেই দিনই রাত্রিবেলা গল্পটা শুনিয়াছিলাম। পানসিতে উঠিয়া বরযাত্রিদলের ভয় কাটিয়া মুখ আবার প্রসন্ন হইল। দুই জোড়া পাশা পড়িল এবং তাহার উৎসাহ ও চিৎকার উদ্দাম হইয়া ক্ষণে ক্ষণে নদীর বুক কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল। কেবল দ্বারিক দত্ত মহাশয় দল-ছাড়া! পাশাখেলা জানেন না, বৃথাই চুল পাকাইয়াছেন। একাকী গলুয়ের উপর বসিয়াছিলেন। আমি কাছে গিয়া চুপিচুপি বলিলাম, বুড়ো দাদা, গল্প বলো।

গল্প? কিসের গল্প শুনবি?

বলিলাম, ঐ নর-বাঁধের।

হাতে কাজ নাই, দ্বারিক দত্ত তখনই প্রস্তুত। আরম্ভ করিলেন, তবে শোন—

পুঁটিমারির বিল হইতে ক্রোশ সাতেক দক্ষিণে, এখন সেখানটা ভদ্রা নদী গ্রাস করিয়াছে, কতকগুলি অনেক কালের বড় বড় ঝাউগাছ নদীতীর আঁধার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঐখানে বল্লভ রায় মহাশয়ের বাড়ি ছিল। ঢাকার নবাব সরকারে চাকরি করিতেন, নবাবের ভারি বিশ্বাস তাঁহার উপর। দেউড়ির কাছে একখানা প্রকাণ্ড সেগুনকাঠ পড়িয়াছিল, তেমন কাঠ আজকালকার দিনে ভূভারতে কোথাও হয় না। বল্লভ একদিন কাঠখানা চাহিয়া বসিলেন।

নবাব ঐ পথে সর্বদা আসিতেন যাইতেন। কিন্তু নবাব-বাদশার তো নিচের দিকে তাকাইবার নিয়ম নাই, কাজেই খেয়াল ছিল না। প্রশ্ন করিলেন কিসের কাঠ? কত বড়?

বল্লভ দুই হাতে আন্দাজি আয়তন দেখাইলেন এবং বলিলেন, দেশে গিয়ে একখানা কুঁড়ে বাঁধবার ইচ্ছে করছি, সেই জন্য।

হুকুম হইয়া গেল। নবাবের বারো হাতী লাগাইয়া তবে সেই কাঠ গাঙে নামাইতে হয়। তারপর বড় ভাউলের সঙ্গে বাঁধিয়া ভাসাইয়া আনা হইয়াছিল। এ' এক কাঠে বল্লভের তিন মহল বাড়ির কড়ি-বরগা হইয়া গিয়াছিল। যাঁহারা রায় মহাশয়ের বড় অন্তরঙ্গ ছিলেন, তাঁহারা খুব গোপনে আর একটা কথা বলিতেন, বল্লভ নাকি বাযট্টিখানা সোনার ইট নবাবের তোষাখানা হইতে সরাইয়া ঐ ভাউলের খোলে পুরিয়া বাড়ি আনিয়াছিলেন। সত্য মিথ্যা সেই স্বর্গীয়েরাই জানিতেন, কিন্তু ইহার পর বল্লভ রায় আর ঢাকায় ফিরিয়া যান নাই।

ভদ্রার উভয় কূল দিয়া একেবারে ভৈরব অবধি জায়গা-জমি কিনিয়া ও

কাড়িয়া কুড়িয়া তিনি রাজ্য করিতে লাগিলেন। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে মাহিনা-করা ঢালির দল ঢাল-সড়কি লইয়া পাহারা দিত। সেই দলের সর্দারের নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয় দাস। অমন খেলোয়াড় আর হয় না। এখনো এ অঞ্চলের লাঠিয়ালেরা লাঠি ধরিবার আগে মৃত্যুঞ্জয়ের নামে মাটি হইতে ধূলা তুলিয়া মাথায় ও কপালে মাখিয়া থাকে।

শোনা যায়, মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ি ছিল পূর্ব অঞ্চলে পদ্মাপারে। যৌবনে খুন-ডাকাতি দাঙ্গা করিয়া খুব নাম কিনিয়াছিল, তারপর বয়স ভারি হইলে নিজেই ডাকাতের দল গড়িল। কিন্তু বউ মরিয়া যাইবার পর যেন কি হইল। আঁতুড় ঘরে বউ মরিয়াছিল, ছেলেটি বাঁচিয়া উঠিল। ক্রমে সে বছর পাঁচেকের হইল, সকলে কুড়োন বলিয়া ডাকিত। সেই কুড়োনকে লইয়া মৃত্যুঞ্জয় শান্ত ভালোমানুষ হইয়া ঘর পাতিল। বড় ছেলের নাম যাদব, তাহাকে ফিরাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু যাদবের নূতন বয়স, রক্ত গরম—বাপের কথা শুনিল না, দলে রহিয়া গেল।

কিন্তু ঘর করা কপালে ঘটে নাই।

বয়সকালে যাহাদের সহিত শত্রুতা সাধিয়া আসিয়াছে, এখন জো পাইয়া একদিন রাত্রে তাহারা চার-পাঁচশ লোকে বাড়ি ঘিরিয়া ফেলিল। জাগিয়া উঠিয়া মৃত্যুঞ্জয় দেখে, মশালের আলোকে চারিদিক আলো-আলোময়। যেন সিংহের বিক্রম বুকের মধ্যে আসিল। কুড়োনকে কাঁধে করিয়া লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে ব্যূহ ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া গেল, এতগুলি মরদের মধ্যে কাহারও এমন সাধ্য হইল না যে একটা হাত উঁচু করিয়া তোলে।

তারপর দেশ ছাড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া পড়িল বল্লভের সীমানার মধ্যে। বল্লভের তখন রাজ্য পত্তনের মুখ, এমন গুণী লোক পাইয়া বাঁচিয়া গেলেন।

মৃত্যুঞ্জয়কে করিতে চাহেন ঢালিদলের সর্দার। মৃত্যুঞ্জয় কিন্তু কিছুতেই রাজি নয়,—বলে, না রায়মশায়, এসব আর নয়। জীবন নিয়ে খেলা আর করব না, বউ মরবার সময় কিরে করেছি।

বল্লভ নাছোড়বান্দা! বলিলেন, দাঙ্গা-ফ্যাসাদে কোনদিন তোমায় পাঠাব না, তুমি কেবল আমার ঢালিদের খেলা শিখিও।

শেষ পর্যন্ত মৃত্যুঞ্জয় রাজি না হইয়া পারিল না। বলিল, বেশ, তাই হল। তোমার নুন যখন খাব, তোমার জন্ত জীবন দিতে পারব—কিন্তু কারো জীবন কখনো নেব না, এই চুক্তি।

তারপর কত বড় বড় দাঙ্গা হইয়াছে, মৃত্যুঞ্জয় সে সবের মধ্যে না যাইয়া

পারে নাই। কিন্তু এমন আশ্চর্য কায়দায় লাঠি চালাইত, যে তাহার হাতে আর একটা লোকও মরে নাই।

এ সব যে আমলের কথা তখন বল্লভের চুলে পাক ধরিয়াছে, তাঁহার মায়ের বয়স আশির উপর। গঙ্গাহীন দেশ, চাকদার এদিকে আর গঙ্গা নাই। মরণকালে বুড়া মায়ের গঙ্গালাভ হইবে না, এই আশঙ্কায় শেষের ক'টা দিনের জন্য মাকে চাকদায় পাঠান ঠিক হইল। রায় মহাশয়ের মা যাইতেছেন, সহজ কথা নয়। লাঠিয়াল-পাইক সাজিল, চাল-ডাল-ঘি লইয়া বিস্তর লোকজন আগে আগে ছুটিল, পথের মধ্যে মধ্যে জায়গা পরিষ্কার করিয়া পরম শুদ্ধাচারে হবিষ্যান্ন প্রস্তুত হইবে। তিন চারি দিনের পথ। ষোল বেহারা হুম হুম করিয়া বুড়িকে বহিয়া লইয়া চলিল।

জ্যোৎস্না রাত, সাত ক্রোশ বেশ কাটিল, একশ পাইক জকার দিতে দিতে চলিয়াছে, কিন্তু সাত ক্রোশের মাথায় গিয়া পড়িল ঐ দুরন্ত খাল। পাড় ভাঙিয়া ডাক ছাড়িয়া দুই পাশের ধানবন দলিয়া মথিয়া হু হু বেগে খাল ছুটিতেছে, টানের মুখে কুটাটি ফেলিলে দুই খণ্ড হইয়া যায়। জলে নামিয়া খাল পার হইবে, কাহার সাধ্য!

পাল্কি নামাইয়া সমস্ত রাত সেই খালের পাড়ে বসিয়া। তারপর সকালে অনেক কষ্টে একখানা ডিঙ্গা যোগাড় করিয়া খালে আনিয়া পাল্কি পার করিবার চেষ্টা হইল। কিন্তু এত লোকজন বোঠে বাহিয়া গলদ্ঘর্ম, ডিঙা কিছুতে খালে ঢুকিল না। দুইদিন সেখানে সেই অবস্থায় কাটাইয়া অবশেষে সকলে ফিরিয়া আসিল।

মা ফিরিয়াছেন শুনিয়া বল্লভ সকল কাজকর্ম ফেলিয়া তাড়াতাড়ি দেখা করিতে আসিলেন। কিন্তু মা কথা কহিলেন না। এত কান্নাকাটি, কিছুতেই না। তারপর অকস্মাৎ উচ্চৈঃস্বরে কান্না—সে কি ভয়ানক কান্না। নিজের পোড়া অদৃষ্টের কথা, মরিবার আগে গঙ্গাস্নানটাও হইল না—এই দুঃখ। বল্লভ রায়ের ভারি মনে লাগিল, কঠিন দিব্য করিলেন তিনমাসের মধ্যে ঐ খাল বাঁধিয়া একেবারে চাকদা পর্যন্ত সোজা রাস্তা তৈয়ারি করিয়া সেই রাস্তায় মাকে নিজে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবেন, তাহা না পারিলে তিনি অব্রাহ্মণ। পরদিন হইতে হাজার লোক কাজে লাগিল। বল্লভ রায়ের ঢালাও হুকুম খাল বাঁধিয়া চাকদা পর্যন্ত রাস্তা করিতেই হইবে, উহাতে সর্বস্ব খরচ করিয়া পথের ফকির হইতে হয়, সে-ও স্বীকার। এপারে ওপারে রাস্তা বাঁধিতে বেশি বেগ পাইতে হইল না, কিন্তু খাল লইয়াই বাধিল যত মুশকিল।

এখন আর খালের কি আছে? দুই কূল মজিয়া বিল হইয়াছে, মাঝ-

ঢুকিলেন। দেখিলেন, আলগা খড়ের উপর বল্লভের বিছানার পাশে কুড়োন বিভোর হইয়া ঘুমাইতেছে।……

মাঝে একটা দিন-রাত্রি, তারপর আরো একটা দিন কাটিয়া রাত্রি আসিল। শেষের রাত্রি। কাল সন্ধ্যার সময় ঠিক তিন মাস পূর্ণ হইয়া যাইবে। প্রতিজ্ঞা পণ্ড হইয়া গেলে তাহার পর খাল বাঁধা না-বাঁধা একই কথা। এই রাত্রির মধ্যেই ক্ষুধিত করালীর বলি চাই, নর-রক্তে খালের জল লাল হইলে তবে জলের বেগ কমিবে।

বল্লভ জানেন, একেবারে নিশ্চিত আছেন—যেমন করিয়া হোক, মৃত্যুঞ্জয় রাত্রির মধ্যে বলি লইয়া ফিরিয়া আসিবেই। সন্ধ্যার আগে সমস্ত লোকজন বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারা পাঁচক্রোশ দূরের গ্রামে চলিয়া গেল। নরবলির কথা ঘুণাক্ষরে কেহ জানে না। বাহিরে কেবলমাত্র প্রকাশ, কার্যসিদ্ধির জন্য রায়-মহাশয় ভয়ঙ্কর কালী-সাধনা করিতেছেন। আজ তার পূর্ণাহুতি। পরম সৌভাগ্যবান উৎসর্গিত বলির মানুষটি যখন আর্তনাদ করিবে, সে কণ্ঠ দেবতা ছাড়া যাহাতে বাহিরের কানে না পৌঁছায় বল্লভ সর্বরকমে তার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু সামান্য একটা খুঁত রহিয়া গেল—সে কুড়োন। কত লোভ দেখান হইল, কত বুঝান হইল—সে কিছুতেই গ্রামে গেল না। তাহার ভয় করে, আর কোথাও গিয়া থাকিতে পারে না। হতভাগা ছেলে চিনিয়া রাখিয়াছে কেবল বাবাকে আর রায়মহাশয়কে। দুইদিন বাবাকে দেখে নাই, ভারি মন কেমন করে, গোপনে গোপনে খুব কাঁদিয়া থাকে—কিন্তু বল্লভকে দেখিলে চোখ মুছিয়া হাসে, তাঁর সামনে কান্নাকাটি করা বড় লজ্জার ব্যাপার বলিয়া মনে করে।

কুড়োন তাই রহিয়া গিয়াছে। তা ঐ বালকের জন্য ভাবনা কিছু নাই। একবার ঘুমাইয়া পড়িলে ঢাক-ঢোল পিটাইয়া তার ঘুম ভাঙানো যায় না। নিশি-রাত্রির ব্যাপার সে জানিতে পারিবে না।

প্রহরের পর প্রহর নিঃশব্দে কাটিয়া যাইতেছে, মৃত্যুঞ্জয় এখনো ফিরিল না। কুড়োন ঘুমাইয়া পড়িলে বল্লভ অনেকক্ষণ ধরিয়া নূতন হাঁড়িতে ঘষিয়া ঘষিয়া খড়্গ শানাইয়াছেন, অন্ধকার তাঁবুর মধ্যে রক্তলোলুপ সেই শাণিতাস্ত্র ঝকমক করিতেছে। ক'দিন রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া চক্ষু আগুনের ভাঁটার মতো লাল। আজ আবার রক্তবর্ণের চেলি পরিয়াছেন, কপালে বাহুতে বড় বড় সিঁদুরের ফোঁটা। বাতাসে এক একবার ধানবন কাঁপিয়া উঠে, অশ্বত্থ-গাছের দু-চারিটা পাতা উড়িয়া তাঁবুর কাছে পড়ে, অমনি কাঁধের উপর খড়্গ তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়ান। শেষে আর তাঁবুর মধ্যে তিষ্ঠাইতে পারিলেন না, খড়্গ

কাঁধে বাহিরে আসিলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ, ভয়ঙ্কর অন্ধকার। কোনখান হইতে খালের আরম্ভ বুঝিবার উপায় নাই। জল-স্থল একাকার হইয়া গিয়াছে। বাতাসও বন্ধ হইয়া গিয়াছে, গাছের পাতাটি নড়ে না। বল্লভের মনে হইল, বুঝি এইমাত্র মহাপ্রলয় হইয়া গেল, শব্দময় প্রাণপ্রবাহ স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে, জীবজগৎ নাই, জন্ম-মৃত্যু সমস্তই একাকার,......তিনিও এইবার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া পড়িয়া যাইবেন। নিঃশব্দতা পাথর হইয়া বুক চাপিয়া রহিয়াছে, প্রতি মুহূর্তেই চাপ বাড়িতেছে। অসহ্য মনে হইল। চিৎকার করিয়া উঠিলেন—জয় মা চণ্ডিকে! সেই চিৎকারে নিজেরই সর্বদেহ শিহরিয়া উঠিল। দেবী চণ্ডী উপবাসী!—বল্লভের মনে হইল রক্ত-বুভুক্ষু মুণ্ডমালিনী তাঁর ঠিক সামনেই অতল অন্ধকারের মধ্যে কৃপাণ মেলিয়া নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতেছেন। মাথার মধ্যে রক্ত চড়িয়া উঠিল। মনে হইল, অশ্বত্থগাছের তলা হইতে দ্রুতপদে কাহারা বাহির হইয়া আসিতেছে—এক—দুই—তিন—চার—... অনন্ত। ডাকিলেন—কে। কারা? উত্তর নাই। খুব জোরে আবার ডাকিলেন—কে? কে? কে? গাছের তলায় গিয়া দেখিতে লাগিলেন। এক হাতে শক্ত মুঠায় খড়্গ ধরিয়া আর এক হাত বাড়াইয়া অসমান গুঁড়ির চারিদিক হাতড়াইতে লাগিলেন। উপরে তাকাইয়া দেখিলেন। বোধ হইল, ডালপালার ভিতরে প্রকাণ্ড ঢালের মতো একটা লেলিহান জিহ্বা লকলক করিয়া দুলিতেছে এবং জিহ্বার দুই পাশ দিয়া দেহহীন, চক্ষুর আশ্রয়হীন কেবলমাত্র দুইটি দৃষ্টি হাউইবাজির মতো আগুন ছড়াইতে ছড়াইতে তাঁহার দিকে অতি দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। খড়্গ উঁচু করিয়া তুলিয়া দেখেন, লোহার উপরে যে চক্ষুটি অঙ্কিত ছিল, তাহাও আগুন হইয়া জ্বলিয়া একেবারে জ্বলিয়া একেবারে চোখাচোখি তাকাইয়া যেন টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। তাঁবুর চারিপাশে খালের পাড়ে অশ্বত্থতলার নূতন-বাঁধা রাস্তার উপর দিয়া বল্লভ দুমদুম করিয়া পা ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ছিন্নমস্তার মতো নিজের মাথা নিজেরই কাটিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইল। অন্ধকার তরল হইয়া আসিতেছে। পূর্বাকাশে রক্তিমাভা। রাত্রি পোহাইতে আর দেরি নাই। বল্লভ রায় পাগল হইয়া উঠিলেন। মৃত্যুঞ্জয় এখনো ফিরিল না; সে বিশ্বাসঘাতক। ঠিক বুঝিলেন, বড় অনিচ্ছার সহিত গিয়াছিল,—এখন চক্রান্ত করিয়া কোন দেশে পলাইয়া বসিয়া আছে। কাল বল্লভ সর্বরকমে অপদস্থ হইলে তারপর হয়তো ফিরিয়া আসিবে। প্রান্তর কাঁপাইয়া প্রবল হুঙ্কার দিলেন—জয় মা চণ্ডিকে! খড়্গ লইয়া তাঁবুর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

কুড়োন জাগে নাই, বিভোর হইয়া ঘুমাইতেছিল, একবার ঘুমাইলে কিছুতে ঘুম ভাঙে না। বল্লভ আর একবার চিৎকার করিলেন—জয় মা!

কুড়োন জাগিল না।

ভালো করিয়া ফর্সা না হইতেই মৃত্যুঞ্জয় ফিরিয়া আসিল। দু'দিনে সে অনেক দূর গিয়াছিল, অবশেষে রাত্রিবেলা এক সুকুমার ব্রাহ্মণ শিশুকে ঘুমন্ত অবস্থায় চুরিও করিয়াছিল। মুখ বাঁধিয়া কাঁধের উপর ফেলিয়া ক্রোশ পাঁচ-ছয় ছুটিয়া আসিয়াছে, এমন সময় গুড় গুড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ চমকাইল। মাঠের মধ্যে তাহার আলো পড়িল বালকের মুখের উপর। চাহিয়া দেখে, ছেলেটি জাগিয়াছে—ভীতি-বিহ্বল অসহায় দৃষ্টি, মুখ বাঁধা বলিয়াই শব্দ করিতে পারিতেছে না, এক একবার গলার মধ্যে ঘড় ঘড় আওয়াজ উঠিতেছে। কে যেন মৃত্যুঞ্জয়ের পা দুখানা ঐখানে আটকাইয়া ফেলিল! তাকাইয়া তাকাইয়া বারবার ছেলেটির মুখ দেখিতে লাগিল। হঠাৎ মনে হইল, সে যেন কুড়োনের মুখ বাঁধিয়া হাড়িকাঠের মধ্যে লইয়া যাইতেছে। মাঠ পার হইয়াই এক গৃহস্থ বাড়ি। তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপে ছেলেটিকে নামাইয়া রাখিয়া মৃত্যুঞ্জয় ছুটিয়া পলাইল। বিল ভাঙিয়া সোজাসুজি দৌড়িয়া আসিয়াছে, ধানবনের মরমর ধ্বনিতে পিছল পথে অনবরত পিছন হইতে মুখ-বাঁধা বালকের ঘড়ঘড়ানি গলার আওয়াজ শুনিতে শুনিতে আসিয়াছে। খালের ধারে আসিয়া বল্লভকে দেখিতে পাইল। জলের কাছে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া তিনি গভীর মনোযোগের সহিত নিচের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন।

বল্লভের সম্বিৎ নাই। দেখিতেছেন, গভীর নিম্নদেশে জমা রক্তের চাপ গুলিয়া গিয়া ক্রমশ সমস্ত খালের জল রাঙা হইয়া উঠিতেছে, একটু একটু করিয়া জলের বেগ কমিতেছে, এক একবার মাটির চাঁই জলে ফেলিয়া পরীক্ষা করিতেছেন। না, আর তেমন আগের মতো পাক খাইয়া মাটি ভাসাইয়া লইয়া যায় না। এইবার—এখনি—আর একটু পরে, জল স্থির হইয়া দাঁড়াইবে। মৃত্যুঞ্জয় অনেকক্ষণ পিছনে বসিয়া রহিল। রায়মহাশয়ের এ-ভাব সে আর কখনও দেখে নাই। ডাকিতে সাহস হইল না। শেষকালে উঠিয়া গিয়া বল্লভের তাঁবুর মধ্যে ঢুকিল। তাঁবুর মধ্যে কুড়োন নাই। এক পাশের অনেকগুলি খড় তুলিয়া ফেলা হইয়াছে, নিচের শুকনা ঘাস বাহির হইয়া পড়িয়াছে, আর আশেপাশের খড়ের উপর তাজা রক্তের ছিটা। যে মৃত্যুঞ্জয় সমস্ত যৌবনকাল হাতে পায়ে রক্ত মাখিয়া নাচিয়া বেড়াইয়াছে, বুড়ো বয়সে ক'ফোঁটা রক্ত দেখিয়া তাহার সর্বদেহ কাঁপিয়া উঠিল। বল্লভকে গিয়া বলিল, রায় মশায়, আমার কুড়োন কোথায়?

বল্লভ তার দিকে তাকাইলেন, সে দৃষ্টির কোন অর্থ হয় না।

মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার হাত ধরিয়া প্রচণ্ড ঝাঁকি দিয়া বলিল, শুনছ? শুনছ? তোমার কাছে রেখে গেলাম, আমার কুড়োন কোথায় গেল? বলে দাও, সে কোথায় গেল?

উদ্‌ভ্রান্তের মতো মৃত্যুঞ্জয় চলিয়া গেল, একফোঁটা চোখের জল পড়িল না। পরদিন সমস্ত দিনমান কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইল, কেহ বলিতে পারে না। এদিকে চাটগাঁর দিকে যে কারকুন গিয়াছিল, এমনি দৈবচক্র, সকালবেলাতেই বিস্তর লোক লইয়া সে আসিয়া পড়িল। সন্ধ্যার মধ্যেই খাল বাঁধা শেষ।

বল্লভের প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল, কিন্তু তিনি আর শান্তি পাইলেন না।

সেদিন নিশীথরাত্রে বল্লভ জাগিয়া ছিলেন। হঠাৎ সদ্য-সমাপ্ত বাঁধের উপর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে মৃত্যুঞ্জয় আসিয়া বল্লভের হাত ধরিয়া আগের দিনের মতো প্রশ্ন করিল: আমার কুড়োন কোথায় গেল? তাকে কোথায় রেখেছ? বলে দাও, বলে দাও।

বল্লভ কেবল হতভম্বের মতো তাকাইয়া দেখিলেন। আবার মৃত্যুঞ্জয় চলিয়া গেল।

ইহার পরে বল্লভের যে কি হইল, তিনি আর বাড়িঘরে ফিরিলেন না। দিনরাত খালের ধারে তাঁবুর মধ্যে চুপ করিয়া কাটাইতেন। মৃত্যুঞ্জয়ের বড় ছেলে যাদবকে খবর দিয়া আনা হইল। বিস্তর জমিজমা দিয়া তাহাকে বসত করাইলেন। লোকে বলে, মৃত্যুঞ্জয় নাকি প্রতি রাত্রেই আসিত। দিগন্তবিসারী জনহীন প্রান্তরের মধ্যে নিস্তব্ধ নিশীথে প্রভু-ভৃত্যে কথাবার্তা হইত, বল্লভের কোন কোন কর্মচারী তাহা স্বকর্ণে শুনিয়াছে।

মৃত্যুঞ্জয় বলিত, রায় মশায়, আমি জীবন দেবো, জীবন নেবো না কখনো।

বল্লভ বলিতেন, সে আমি জানি। জানি, তুই কক্ষনো জীবন নিবিনে—

তবু বল্লভ রায়ের জীবন গেল। মাস দেড়েক পরের কথা, পরিষ্কার পূর্ণিমা রাত, ভাদ্রমাসের শেষ কোটাল। বাঁধের গায়ে প্রবলবেগে জোয়ারের জল ধাক্কা দিতেছে। হঠাৎ তুমুল কলকল্লোল শুনিয়া বল্লভ রায় ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন, বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে, হু হু করিয়া খালের মধ্যে জল ঢুকিতেছে। দেখিতে দেখিতে সমস্ত বাঁধের আর চিহ্নমাত্র রহিল না। তারপর দেখিলেন, ওপারে জ্যোৎস্নার মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়াইয়া আছে। ঠিক এই সময় রোজই সে মনিবের কাছে আসিত। বাঁধ ভাঙিয়া যাওয়ায় আজ তাঁর কাছে আসিতে পারিতেছে না। মৃত্যুঞ্জয় ডাকিতে লাগিল: রায় মশায়, রায় মশায়,—

বল্লভ বলিলেন, কি করে যাই? দেখছিস জলের টান?

সে বলিল, চলে এসো, মোটে হাঁটুজল। ওপার হইতে মৃত্যুঞ্জয় নামিয়া আগাইয়া আসিতে লাগিল, হাঁটুজলও নয়। এপারে বল্লভ নামিলেন। কিন্তু এপারে জল বেশি, বুকজল ক্রমে গলাজল হইয়া দাঁড়াইল।

বল্লভ ডাকিয়া বলিলেন, তুই এগিয়ে আয় মৃত্যুঞ্জয়, আমি আর পারছিনে।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, আর একটু রায়মশায়, আর একটু। এইবার জল কমবে।

জলের টানে ঘুমন্ত অবোধ বালকের চাপাকান্নার মতো শোনা যাইতে লাগিল। মাথার উপর মেঘ-নির্মুক্ত পূর্ণিমার চাঁদ। মাঝখানে আসিয়া দুজনে প্রবল আকর্ষণে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল। তারপর জোয়ারের বেগে কে কোথায় ভাসিয়া গেল, তাহা কেহ জানে না।

দ্বারিক দত্ত আর কি কি বলিয়াছিলেন, পনের বছর পরে এখন তাহা মনে নাই। তবে এটা মনে পড়ে, সেদিন সন্ধ্যায় ভাঁটা সরিয়া গিয়া ঈষন্নিম্ন সমতল নদীগর্ভ অনেকখানি অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছিল এবং চাঁদের আলোয় বালুকারাশি চিকচিক করিতেছিল। গল্প শুনিতে শুনিতে একটু পরেই চোখ বুজিয়া জড়সড় হইয়া পড়িলাম, ভয়ে রাতের মধ্যে চোখ আর মেলি নাই।

পরদিন গোধূলিলগ্নে নির্বিঘ্নে ছোটকাকার বিবাহ হইয়াছিল, বরযাত্রীরাও আকণ্ঠ মিষ্টান্ন ভর্তি করিয়াছিলেন। সেই ছোট কাকী এখন পাঁচটি ছেলেমেয়ের মা। দেখিতে দেখিতে পনেরটা বছর কালসমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে শেষের বছর দশেক আমরা একদম দেশছাড়া। বাড়িসুদ্ধ সকলে কাশীতে আছি; সেখানে বাবা কাঠের ব্যবসা দিব্য জমাইয়া বসিয়াছেন। অবস্থা ফিরিয়াছে। কেবল ফি-বছর বাবা স্বয়ং একবার করিয়া দেশে যান। স্বদেশপ্রেম বশত নয়। পুঁটিমারির বিলে সুবিধামতো অনেক জায়গা জমি কেনা হইয়াছে বলিয়া। যদিও দক্ষ নায়েব একজন আছে, তবু নিজে গিয়া এক একবার দেখিয়া আসিতে হয়।

এদিকে আমি আইন পাস করিয়া একরকম নিরুপদ্রব হইয়া আবার কাশীর বাড়িতে অধিষ্ঠান করিয়াছি। বাবা জানেন, আমিও জানি, ঐ পাসের বেশি আমার দ্বারা আর কিছু হইবে না। সুতরাং কোর্টে যাইবার জন্য কোন পীড়াপীড়ি নাই। যেদিন বীণার সঙ্গে ঝগড়া হইয়া যায়, ভারি রাগ করিয়া গায়ের উপর চোগা চাপকান চাপাইতে লাগিয়া যাই, আবার হাসিয়া যখন সে দুয়ার আটকাইয়া দাঁড়ায়, ঐ বোঝা নামাইয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত আরামে শুইয়া পড়ি।

এমনি চলিতেছিল। ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি একদিন হঠাৎ বাবা ডাকিয়া বলিলেন, একবার দেশে যাও, কাল-পরশুর মধ্যে—

অবাক হইয়া গেলাম। দশ বছরের অভ্যাসক্রমে বাংলা মুলুকের সেই সুদুর্গম গ্রামটি মন হইতে ক্রমাগত দূরে সরিতে সরিতে প্রায় আন্দামান দ্বীপের সমান তফাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাপ হইয়া এমন বিভ্রাট বাধাইতে চান কেন?

কহিলাম, কেন, আপনি?

বাবা কহিলেন, আমি হপ্তাখানেকের মতো নাগপুরে যাচ্ছি কাঠের চালান আনতে। সে তো তুমি পারবে না।

না, তাহাও পারিব না। অতএব, চুপ করিয়া রহিলাম।

বাবা বলিতে লাগিলেন, পুঁটিমারির জমি নিয়ে প্রজাদের সঙ্গে গণ্ডগোল বেধে উঠেছে—ঘনশ্যাম চিঠি লিখেছে। আবার মামলা-টামলা যদি হয়, ও-বেটা রাঘববোয়াল টাকাকড়ি হাতে যা পাবে নিজেই গিলবে, কাজকর্ম পণ্ড করে দেবে। তুমি গিয়ে কিস্তির মুখটা কাটিয়ে সব মিটমাট করে দিয়ে এসোগে। লেখাপড়া শিখেছ, আইন পাস করলে, অন্তত নিজেদের এস্টেটপত্তোরগুলো দেখাশুনো কর।

হায়, কি কুক্ষণেই আইন পাস করিয়াছিলাম!

দিন চার পাঁচ পরে একটা স্যুটকেস হাতে করিয়া রাত্রির মেলে মধুগঞ্জ স্টেশনে নামিলাম। প্রায় দশ বছর আগে আর একদিন রাত্রে এখান হইতে গাড়ি চাপিয়াছিলাম, সে সব দিনের কথা ভাল মনে নাই। তবু মনে হইল, স্টেশনটি প্রায় এক রকমই আছে। রাত্রি আর বেশি নাই, খোলা ওয়েটিং রুম দিয়া প্লাটফরম অবধি মাঠের জোলো হাওয়া আসিতেছে। এ সময়ে যাহার নিতান্ত গরজ, তেমন লোক ছাড়া আর কাহারো জাগিয়া থাকার কথা নয়।

কিন্তু ট্রেনের মধ্যে থাকিতেই তুমুল গণ্ডগোল কানে আসিতেছিল। ওয়েটিং-রুমে দাঙ্গা বাধিয়াছে নাকি? যেই সেখানে পা দিয়াছি, আর যাইবে কোথায়, জন পঁচিশেক মানুষ চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া যেন ছাঁকিয়া ধরিল। সকলেই জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাবেন? কোথায় যাবেন? সাঁতার না জানা মানুষ গভীর জলের মধ্যে পড়িলে যেমন হয়, আমার দশা সেই প্রকার। কোন দিকে কূল কিনারা দেখি না, পালাইবার পথ নাই।

উত্তর না দিলে কেহ পথ ছাড়িবে না, কাজেই বলিয়া ফেলিলাম, যাব সাগরগোপ।

যেইমাত্র বলা, অমনি একজনে ডানহাতের স্যুটকেসটি ছিনাইয়া লইয়া দৌড়। পলক ফিরাইয়া দেখি, অন্য সকলে ঐ সঙ্গে অন্তর্ধান করিয়াছে। কিঞ্চিৎ দূরে আর একজন হতভাগ্য যাত্রীরও আমার দশা। সে দিকে আর না গিয়া পাশ কাটাইয়া সরিয়া আসিলাম।

তা তো হইল, এখন আমার উপায়? স্যুটকেসের মধ্যে আমার সমুদয় কাপড়চোপড় এবং কুড়িখানি দশ টাকার নোট রাখিয়াছিলাম। মধুগঞ্জে যে সদর-জায়গায় দল বাঁধিয়া আজকাল এমন রাহাজানি শুরু করিয়াছে, তাহা জানিতাম না। মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তায় মাইল অন্তর কেরোসিনের আলোর ব্যবস্থা আছে, কালিতে কালিতে রাত্রিশেষে আলোগুলি এমন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে যে সে আলোকে চোর চিনিয়া ধরা দূরের কথা, নিজের হাত-পাগুলি চিনিয়া লওয়াই মুশকিল।

সামনের রাস্তায় নামিয়াছি, ভক করিয়া পিছনে আওয়াজ। তাকাইয়া দেখি, সর্বনাশ, প্রায় ঘাড়ের উপরে একখানা বাস আসিয়া পড়িয়াছে। একদৌড়ে আগে গিয়া প্রাণটা বাঁচাইলাম। তারপর ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি, কেবল একখানা নহে সারি সারি ঐ রকম বিশ-ত্রিশখানি। সকলেই স্টার্ট দিয়াছে, একবার আগাইতেছে, একবার পিছাইতেছে, এবং তারস্বরে কে কোথায় যাইবে তাহা ঘোষণা করিতেছে। চিৎকারের যেন প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। ঠিক সামনে যে গাড়িখানি ছিল, তাহার ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বলতে পার আমার স্যুটকেস নিয়ে এইদিক দিয়ে কে পালাল?

ড্রাইভার হাসিয়া বলিল, আজ্ঞে, আসুন—এই যে। আপনি সাগরগোপ যাবেন তো? উঠে পড়ুন, এই নিন আপনার জিনিষ।

নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। ভয় ধরাইয়া দিয়াছিল। ঝাঁজের সহিত কহিলাম, তুমি বেশ লোক তো বাপু, না বলেকয়ে স্যুটকেস নিয়ে চম্পট—

ড্রাইভার সবিনয়ে বলিল, আজ্ঞে, আপনারই সুবিধের জন্যে। ভারী জিনিষ বয়ে আনতে অসুবিধে হচ্ছিল, তাই দেখে—

বলিয়া কথা শেষ না করিয়াই আরো দুইটি লোক প্লাটফরম পার হইয়া হইয়া আসিতেছিল, তাহাদের পাকড়াও করিতে ছুটিয়া গেল।

সুস্থির হইয়া বসিয়া চারদিক তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিয়া মনে সম্ভ্রমের উদয় হইল। লোকে সভ্য হইয়া উঠিতেছে বটে, মফস্বল শহরেও তাহার ব্যতিক্রম নাই। সামনেই হিন্দু চায়ের দোকান। সাইনবোর্ডে বড় বড় করিয়া লেখা: এই যে, গরম চা, আসুন, সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের দ্বারা প্রস্তুত। ট্রেন হইতে নামিয়া ইতরভদ্র দলে দলে গিয়া সাত্ত্বিক চা খাইতে বসিয়াছে। নূতন বায়োস্কোপ খুলিয়াছে, স্টেশনের দেয়াল জুড়িয়া তার বিজ্ঞাপন······ ভ্রাম্যমান সাড়েবত্রিশভাজাওয়ালার ঠুন ঠুন ঘণ্টা-বাজনা······ডাক্তারখানার লাল নীল আলো······দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল, শিয়ালদহের মোড়ের খানিকটা যেন এখানে আনিয়া বসাইয়া দিয়াছে।

ড্রাইভার ফিরিয়া আসিয়া নিজের জায়গায় বসিল। যাত্রী এত ভর্তি হইয়া গিয়াছে যে একরূপ অখণ্ড মণ্ডলাকার অবস্থা। তা ছাড়া এতগুলি মানুষ নিতান্ত মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া বসিয়া নাই। গাড়ি ছাড়িলে নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসিলাম। হুস হুস করিয়া শেষ রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগিতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, এগাড়ি যাবে কতদূর অবধি?

ড্রাইভার কহিল, আপনি ত নামবেন সাগরগোপ। তারপর বাঁকাবড়শি মাদারডাঙা ছাড়িয়ে চলে যাবে সেই কাটাখালির কাছ বরাবর।

নরবাঁধ পার হবে কি করে?

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সে আমার দিকে তাকাইল। বলিল, দেশে থাকেন না বুঝি? সেখানে গেল-বছর মস্ত পুল হয়ে গেছে। টার্নার-ব্রিজ টার্নার সাহেবের আমলের কিনা! দেশের আর কি সেদিন আছে!

মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, সত্যই সেদিন আর নাই। বারো-চৌদ্দ বছর আগে একবার এই শহরে আসিয়া বাবার সঙ্গে তিন দিন ছিলাম। তখন এখানে এক ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আর এক পুলিস সাহেবের মাত্র এই দু-খানি মোটরগাড়ি ছিল। বিকালে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নিজে গাড়ি চালাইয়া চৌরাস্তার পথে বেড়াইতে যান, কথাটা শুনিবার পর পাকা তিন ঘণ্টা রাস্তার পাশে তীর্থকাকের মতো ধর্ণা দিয়া তবে হাওয়াগাড়ি দেখিতে পাইয়াছিলাম। সেই জীবনের প্রথম মোটর দেখা।

ড্রাইভার লোকটির উৎসাহ কিছুতেই খর্ব হইতে ছিল না। বোধকরি, সে ইস্কুল-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়টি ভাল করিয়া পাঠ করিয়া থাকিবে। আবার আরম্ভ করিল, যাই বলুন মশাই, আপনাদের স্বরাজ-টরাজ ফক্কিকার, এমন কোম্পানির রাজার মতো কেউ হবে না। রাস্তাঘাট রেল-ষ্টিমার ট্যাক্সি-বাস—আর কি চাই? করুক দেখি কোন্ বেটা পারে?

খাড়া বসিয়া থাকিয়াও ঘুমানো যায়, আগে জানিতাম না। সকলেই ঘুমাইতেছে, আমিও চোখ বুজিয়া আছি। সেই অবস্থায় নবনির্মিত টার্নার-ব্রিজ কোন সময়ে পার হইয়া আসিয়াছি, বুঝিতে পারি নাই। সাগরগোপের ইস্কুলঘরের কাছে নামিলাম, তখন বেশ বেলা হইয়াছে। এখান হইতে মাইলটাক হাঁটিয়া বাড়ি যাইতে হয়। ডাহিনে দেখিলাম, পুঁটিমারির বিলে জল চক-চক করিতেছে। চমক লাগিল, কাণ্ডখানা কি? দশ বছর আগেকার কথা সঠিক মনে নাই। তবু আবছা স্বপ্নের মতো মনে পড়ে, এই সময়ে ঘন সতেজ সবুজ ধানে এই বিল ভরিয়া থাকিত। লক্ষ্মী ঠাকরুণ তাঁর সকল সম্পদ যেন উজাড়

করিয়া চালিতেন এখানে। যতদিন দেশে ছিলাম, কখনও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। পাঁচু মোড়ল, বিশে মোড়ল, রাইচরণ দাস, সর্দারেরা দুই ভাই কান্তরাম শান্তরাম, ইহারা ফি বছর এক একটা গোলা বাঁধিত। গোলা তৈয়ারি করা এ অঞ্চলের মানুষের যেন নেশার মতো হইয়া গিয়াছিল। তেঁতুলতলায় মুচিরা রান্না করিত, চপ চপ করিয়া কুড়ালের উপর মুগুরের ঘা দিয়া বাঁশ ফাটাইত, সর্দারদের মজাপুকুরে আঁটি বাঁধিয়া বাখারি পচাইতে দিত, সমস্ত কথা মনে পড়িতে লাগিল।

রাস্তার পাশে একজন লোক একমনে বসিয়া মাছ-ধরা দোয়াড়ি বুনিতেছিল। কহিলাম, মাছ পড়ছে খুব?

লোকটি উত্তর করিল না, তাকাইয়াও দেখিল না।

সেটা বটতলা। শিকড়ের উপর দাঁড়াইয়া তরঙ্গাকুল সীমাহীন জলরাশি দেখিতে বেশ লাগিতেছিল। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলাম, ও মোড়লের পো, বিল যে এবার একদম ওঠেনি। বড্ড বর্ষা হয়েছিল নাকি?

এবার লোকটি চাহিয়া দেখিল। হাতের কাছের একখণ্ড বাঁশ আগাইয়া দিয়া কহিল, বসুন।

আমি বলিলাম, না, বসবো না আর। তোমাদের বাড়ি বুঝি ঐ গাঁয়ে? ঘরগুলো বেশ দেখাচ্ছে, সুন্দর এক একটা দ্বীপের মতো। দ্বীপ কাহাকে বলে লোকটার জানা নাই, অতএব দ্বীপের সৌন্দর্য বুঝিতে পারিল না। মোটে সেদিক দিয়াই গেল না। কহিল, বাবু, আমরা মহারাণীর কাছে দরখাস্ত করব—

কিসের দরখাস্ত?

নরবাঁধ বেঁধে ছোট করে পোল দিয়েছে, মহারাণী এসে পোল ভেঙে দিয়ে যান। পোলে কাজ নেই আমাদের, যেমন ছিলাম তেমনি থাকি। এত বড় বিলের জল এই ফাঁকটুকুতে বেরোয় কখনো? তিনি নিজের চোখে একবার দেখে যান না—

ভারি বিরক্ত হইলাম। যত ভাল কাজই গভর্ণমেণ্ট করুক না কেন, দেশের লোকের খুঁত ধরা কেমন স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুদূর পাড়াগাঁয়েও সে বিষ ঢুকিতে বাকি নাই। বলিলাম, টাকাকড়ি খরচ করে পোল দিয়েছে—বড্ড অপরাধের কাজ করেছে। আগে এখানে বুকজল হত, লোকে পার হত গামছা পরে। আর আজকে এখানে দিব্যি মোটরে করে চলে এলাম, একফোঁটা জলকাদা গায়ে লাগল না। কত বড় সুবিধে বল দিকি।

লোকটি তাতিয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, ছাই হয়েছে, ঘরদোর জায়গা-

জমি জলে ডুবে রয়েছে। হঠাৎ গলার স্বর ভারি হইয়া উঠিল। বলিতে লাগিল, এ কি রকম জুলুমবাজি! গোলায় এক চিটে ধান নেই, ঘরের মধ্যে ভাসা বাদার সাপ উঠেছে, খুঁটির গোড়ার মাটি জলে ধুয়ে যাচ্ছে, কোন দিন ঘরখানাই বা ধসে যায়! তোমরা তো বাপু মোটরে চড়ে ফুর্তি করে বেড়াও, সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে ছেলেপুলের হাত ধরে আমরা কোথায় যাই বলো তো?

বলিতে বলিতে লোকটি চুপ করিল। বোধকরি বা কান্না সামলাইল। পুরুষ মানুষের কাঁদিতে নাই কিনা।

একটু স্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল, বুঝিয়ে সুঝিয়ে লিখলে মহারাণীর ঠিক দয়া হবে, কি বল বাবু? তুমি যাচ্ছ কোন গাঁয়ে?

ওই তো সামনেই—ইন্দির ঘোষ মশায়ের বাড়ি। আমি তাঁর ছেলে, এখন বাড়িঘরে থাকিনে।

লোকটি কপালে হাত ঠেকাইয়া সেলাম করিল। কহিল, চিনলাম। তোমার বাড়িতে আমরা যাব, একখানা দরখাস্ত লিখিয়ে নিতে। এই আমাদের যত দুঃখ ধান্দার কথা ভাল করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ভাল করে লিখলে মহারাণী ঠিক শুনবে, একটা ভাল জলপথ করে দিয়ে যাবে। যাবে না? আমরা ঠিক করেছি সব চাষা মিলে দরখাস্ত ছাড়ব।

নিরক্ষর গ্রাম্য চাষী আমাকে হয়তো মহারাণীর জ্ঞাতিগোত্র ঠাওরাইয়াছে। যে যাহা ভাবুক, আমার ক্ষমতার দৌড় আমি তো বুঝি—হ্যাঁ না কিছুই না বলিয়া কেবলমাত্র ঘাড় নাড়িয়া হাঁটিতে শুরু করিলাম। পিছন হইতে শুনিলাম, লোকটি বলিতেছে, যদি দরখাস্ত না শোনে, জোর করে ঐ পোল ভাঙব, তারপর জেল ফাঁস যা হয় হোক। মরছিই তো, ঐ ভাবে মরি।

দশ বছর পরে বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া সে বাড়ি আর চিনিতে পারি না। উত্তর-দালানের ছাত খসিয়া পড়িয়াছে, সিঁড়ির ঘরের মাথায় প্রকাণ্ড আকাশ-ভেদী অশ্বত্থগাছ, ভিতরের উঠানে একহাঁটু উঁচু ঘাস। ঘনশ্যাম গাঙ্গুলি দাখিলা লিখিতেছিল—হিসাব ফেলিয়া হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল: ওদিকে যাবেন না, ওদিক যাবেন না। পরশু ঐ ঘাসের মধ্যে কেউটে সাপের খোলস পাওয়া গেছে। সঙ্গের মুটেটাকে ডাকিয়া কহিল, হাঁ করে দেখছিস কি বেটা? এ চামড়ার বাক্সটাক্স কাছারিঘরে এনে রাখ—

কাছারি ঘরখানির অবস্থা ভালই বলিতে হয়।

বাঁশের খুঁটি, চাঁচের বেড়া। সারি সারি তিনখানা তক্তপোশ, তার উপর সতরঞ্চি পাতিয়া ফরাস করা হইয়াছে। ডাবাহুঁকা হুঁকাদান—ত্রুটি কিছুই

নাই। পাশে রান্নাঘর। পিছনে জঙ্গলে-ভরা বৃহৎ বাড়িটার সহিত সদরের কাছারীবাড়ির কোন সম্পর্ক নাই।

ঘনশ্যাম অর্থটা সমঝাইয়া দিল। বলিল, দরকার কি? অত বড় বাড়ি মেরামতি অবস্থায় রাখা আর ঐরাবতহাতী পোষা এক কথা। ও বছর কর্তাবাবু এসে মেরামতের কথা বললেন, আমি বল্লাম এখন কাজ নেই, আপনারা যদি কখনো দেশে-ভুঁয়ে আসেন, তখন সে সব। ঘোড়া হলে চাবুকের জন্ত আটকাবে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কেমন আছ নায়েব মশায়?

ঘনশ্যাম বলিল, আছি ভাল আপনাদের দয়ায়। মাছটা খুব মিলছে আজকাল, জিনিসপত্তোরেরও সুবিধে। জনমজুর ভারি সস্তা, দু-আনায় সমস্ত দিন খাটছে। আগে পোশামোদ করতে করতে প্রাণ যেত—এখন বাবা, পায়ে ধর আর কাজে লাগ। কোন বেটার ঘরে কিছু নেই।

বিলে চাষ বন্ধ বলে বুঝি?

ঘনশ্যাম বলিল, তা ছাড়া আর কি! বেঁচেছি মশায়, ছোটলোকের ঘরে পয়সা হলে রক্ষে আছে? বিল যে আর ইহজন্মে উঠবে তার কোন ভরসা নেই।

বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

বলিলাম তা হলে ওদের চলবে কি করে?

না চলে, উঠে যাক। যাচ্ছেও। অত বড় পুবপাড়ার মধ্যে একলা রাইচরণ আর তার দুটো ভাইপো টিম টিম করছে। ওরাও যাবে শিগগির—ভিটেয় থেকে কি নোনাজল খেয়ে থাকবে? সেবার পঁচিশ শ'টাকা গুণে দিয়ে আমাদের এস্টেটে পঁচিশ বিঘা জমি মৌরুসী নিয়েছিল মশায়, আষাঢ়মাসে এসে বলে নায়েবমশায়, খাওয়া জুটছে না। ছেলেপিলেগুলো শুকিয়ে মরছে, চোখের উপর আর দেখতে পারি নে। মনটা আমার বড্ড নরম, শুনে কষ্ট হল। বললাম, এক কাজ কর রাইচরণ, এই পঁচিশ বিঘে বরং বাবুদের এস্টেটে ফের বেচে ফেল্ দশ টাকা হিসেবে বিঘে, আড়াই শ' টাকা পাবি।

আশ্চর্য হইয়া কহিলাম, আড়াই হাজারে কিনে আড়াই শ' টাকায় বিক্রি—রাজি হল?

নায়েব অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল, না, হয় নি। উল্টে আবার দল পাকাচ্ছে। কিন্তু তাই বা দেয় কে? জলে ডোবা জমির দাম আছে কিছু? ওদের এখন ঘরপোড়া ছাই—যা পাবে তাই লাভ। তবু তো বুঝতে চায় না বেটারা।

কিন্তু আমাদেরই বা ঐ জমি কিনে কি হবে?

ঘনশ্যাম আমার অজ্ঞতায় অবাক হইয়া খানিকক্ষণ কথাই বলিতে পারিল না। শেষে বলিল, লাভ নয়—বলেন কি? এই তো চাই আমরা। সমস্ত চক এমনি করে আস্তে আস্তে খাস করে নেব। তারপর গোটা বিলটা জেলেদের কাছে বিলি হবে। জলকরে সুবিধে কত মশাই? প্রজা বেটাদের নানান আবদার—আজ বাঁধ ভাঙল, কাল নোনা লেগেছে—হেনো কর তেনো কর। এখন কিছু হাঙ্গামা নেই। বছর অন্তর জেলের কাছ থেকে করকরে টাকা একসঙ্গে গুণে নেও, তারা জাল ফেলুক, মাছ ধরুক, ব্যস! ধানে আমাদের গরজটা কি? টাকা হলেই হল।

চুপ করিয়া রহিলাম। বুঝিলাম, পুঁটিমারি বিল ডুবি হওয়ায় জমিদারের লোকসান নাই। মরিতে মরিবে অভাগা প্রজারা। সাতপুরুষের ভিটে ছাড়িয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে দেশান্তরে চলিয়া যাইবে।

ঘনশ্যামের কৃতিত্বের কাহিনী তখনো শেষ হয় নাই। বলিতে লাগিল, শুনি, ঐ রাইচরণ নাকি গোপনে দল পাকাচ্ছে। ওরা ভাবে, আমরা চেষ্টা করলে বিলের জলপথটা বড় করে দিতে পারি। আরে বাপু, পারি তো পারি—আমরা তা করতে যাব কেন? যা আছে তাতে আমাদের গরলাভটা কি? দল পাকানো হচ্ছে, কোন জেলেকে বিলের মধ্যে জাল নামাতে দেবে না, দাঙ্গা ফ্যাসাদ বাধাবে। তা হলে নাকি আমাদের গরজ হবে।

বলিয়া হা-হা করিয়া আর এক দফা হাসিয়া লইল। বলে, জমিদারীর কাজে চুল পাকিয়ে ফেললাম, দাঙ্গাহাঙ্গামায় কি পিছপাও? বোঝে না বেটারা—

আমি বলিলাম, না, কোন হাঙ্গামা না বাধলেই ভাল।

ঘনশ্যাম কহিল, কিছু ভাববেন না, আপনি কেবল চুপ করে বসে বসে দেখুন না। এখনো জানে না, ঘনশ্যাম গাঙ্গুলি লোকটা কে। ঐ রাইচরণের গুষ্টিসুদ্ধ দেশছাড়া করব না? টিঁকবে ক'দিন? দেখুন গিয়ে, আপনার রজনী পাইক এখনও ঠিক ওর উঠোনে গিয়ে বসে রয়েছে—

বলিয়া একটুখানি থামিল। আবার দম লইয়া বলিতে লাগিল, এদিকে বেটা আবার বলে, আমরা মানী ঘর—মান রেখে কথাবার্তা না বললে চলবে না। না যদি চলে—বেশ তো, বাস ওঠাও। সোজা পথ দেখা যাচ্ছে। থাকবার জন্যে পায়ে ধরে খোশামোদ কে করছে বাপু? আমরাও তো তাই চাই। পরশু দুপুরে হয়েছে কি মশায়, রজনী ওর দাওয়ায় চেপে বসেছে—রাইচরণ বাড়ি নেই, ছেলে দুটো টঁ্যা টঁ্যা করছে। বোঝা গেল, চাল বাড়ন্ত। ভারি রসিক আপনার কাছারির পাইক এই রজনী। জানে সব, তবু বলে খাজনার টাকা দাও, নইলে উঠছি নে। আর নয় তো নতুন হাঁড়ি বের কর,

চাল আন, ডাল আন, সিধে সাজাও—যে ক'দিন টাকা না পাব তোমাদের বাড়ি অতিথ হয়ে থাব। তিনটে গোলা আছে তিন বেলা তিন গোলার ধানের চাল। চাষা লোকের মেয়ে হলে কি হয়, রাইচরণের বউটার বুদ্ধি খুব। খোঁটাটা বুঝতে পারল, চোখ দিয়ে তার টপ-টপ করে জল পড়তে লাগল।

দিন পাঁচ-সাত কাটিয়া গেল। ভালই কাটল, নায়েব মশায়ের আয়োজনের ক্রটি নাই। পুঁটিমারির বিল হইতে সকালে বিকালে ঝুড়ি ঝুড়ি টাটকা মাছ আসিতেছে, গঞ্জ হইতে দাদখানি চাউল। দুধেরও অপ্রাচুর্য নাই। দুপুরে খাইতে বসিয়াছি, ঘনশ্যাম লোনা ও মিঠা জলের মাছের আস্বাদের তুলনা করিতেছে, হঠাৎ বিশ-ত্রিশ জন লোক ভয়ঙ্কর চিৎকার করিতে করিতে কাছারিবাড়ির উঠানে দৌড়িয়া আসিল।

খুন! খুন! খুন!

খাওয়া ঐ পর্যন্ত। দেখিলাম, বড় বিপদের মধ্যেও ঘনশ্যাম বিচলিত হয় না।

খুন কি রে? কে কাকে খুন করল?

রজনীকে। রাস্তায় লাস পড়ে আছে—রাইচরণ আর তার ভাইপোরা সড়কি মেরেছে। কাছারি নাকি লুঠ করতে আসছে।

ঘনশ্যাম তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, আসুকগে। বেটাদের বড় বাড় হয়েছে। আচ্ছা! আমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, কিছু ভাববেন না, বিছানা পাতা আছে—বিশ্রাম করুন গিয়ে। আমি লাসটা নিয়ে আসি। দেখি, কতদূর কি গড়াল।

জনকয়েক ধরাধরি করিয়া রজনীকে লইয়া আসিল। চক্ষু মুদ্রিত। তাজা রক্তে কাপড় চোপড় ও সর্বাঙ্গ ভাসিয়া গিয়াছে, এক এক জায়গায় রক্ত চাপ বাঁধিয়া লাগিয়া রহিয়াছে। হাঁটুর নিচে হইতে তখনও রক্ত গড়াইয়া গড়াইয়া কাছারিঘরের দাওয়ার উপর পড়িতে লাগিল। ঘনশ্যাম খানিকটা পিছনে, ক'জনের নিকট হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর লইতে আসিতেছে। এমন দৃশ্য আর দেখি নাই। আপাদমস্তক হিম হইয়া গেল, মনে হইল মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইব।

হঠাৎ দেখিলাম, লাসটি কথা কহিতে কহিতে দিব্য উঠিয়া বসিল। যাক মরে নাই তাহা হইলে।

ঘনশ্যাম কহিল, তবু ভালো যে মরিস নি, তা হলে সাক্ষী পাওয়া মুশকিল হত—

রজনী হাত দিয়া ক্ষতমুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল, ওরা তাক করতে পারেনি। পায়ে সড়কি মারলে কখনো সাবাড় হয়? দিতে পারত আর খানিক উঁচুতে তলপেটে বসিয়ে! আমি নিজেই হয়তো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে একরকম চলে আসতে পারতাম নায়েব মশায়, কিন্তু চোখ বুজে পড়ে রইলাম। লোকের হৈ-চৈ শুনে কেমন ভয় ধরে গেল।

নানা রকম গাছগাছড়া শিলে বাটিয়া ক্ষতমুখে লাগাইয়া দেওয়া হইল। এমনি ঘণ্টা খানেক চলিল। রক্ত বন্ধ হইল। রজনীর ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, এত কম আঘাতে উহারা কাবু হয় না। আর এ রকম ব্যাপার উহার জীবনে অনেকবারই ঘটিয়াছে।

অতঃপর ঘনশ্যামের মোকর্দমা সাজাইবার পালা। জিজ্ঞাসা করিল, ঘটনাটা কি রে?

রজনী কহিল, এমন কিছু নয়। আপনার হুকুমমতো গিয়ে বললাম, আজ যদি কাছারি না যাস রাইচরণ, কান ধরে ঘোড়দৌড় করিয়ে নিয়ে যাবার হুকুম। রাইচরণ বলল, তুমি একটু দাঁড়াও, কাপড়খানা ছেড়ে দুটো টাকা গাঁটে নিয়ে আসি। কাছারিতে ছোট বাবু এসেছেন, শুধু-হাতে যাওয়া যায় না। তাঁর নজরানা। আমি গাছতলায় দাঁড়িয়ে তামাক খাচ্ছি, হঠাৎ পেছন থেকে সড়কি বসিয়ে দিল—

সমস্ত বিকাল ধরিয়া কত লোক যে আসাযাওয়া করিতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি নির্লিপ্তের মতো একদিকে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। ঘনশ্যাম পরামর্শ আঁটিতে লাগিল, সাক্ষী সাজাইতে লাগিল, আবার জেরা করিয়া তাহাদের ভুল ধরাইয়া দিতে লাগিল। মুখের প্রসন্নতা দেখিয়া সন্দেহ রহিল না, রাইচরণকে লইয়া অনতিবিলম্বে ভয়ঙ্কর কাণ্ড শুরু হইবে। সন্ধ্যার আগে ঘনশ্যাম কহিল, এইবার ব্রহ্মাস্ত্র তৈরি হয়ে গেল, আমি থানায় চললাম। খবর পাচ্ছি, বেটারা ভয়ানক ক্ষেপে গিয়েছে, রাত্রিবেলা কাছারি এসে খানিক হৈ চৈ করতে পারে। আপনি একটু সাবধান হয়ে থাকবেন মশায়, রাগটা মনিব-চাকর সকলের উপর গিয়ে পড়ছে কিনা। তাহলেও ভয়ের কিছু নেই, করতে পারবে না কিছু।

পাহারার জন্য ঘনশ্যাম গোপন ব্যবস্থা যদি কিছু করিয়া গিয়া থাকে, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু প্রকাশ্যত ফরাসের উপর বসিয়া রহিলাম কেবল মাত্র আমি, এবং নিচে খোঁড়া পা লইয়া রজনী পাইক। সন্ধ্যার পরেই কেবল কাছারি-বাড়িতে নয়, সমস্ত গ্রামের মধ্যে মানুষের সাড়া একদম বন্ধ হইয়া গেল। দুপুরে তাজা নররক্তের যে প্রবাহ দেখিয়াছি, অন্ধকারের মধ্যে যেন তাহার

বিভীষিকা দেখিতে লাগিলাম। ঘরের সামনেই আম-কাঁঠালের ঘন বাগান। এক একবার মনে হইতে লাগিল, সড়কি-বল্লম লইয়া কাহারা যেন পা টিপিয়া টিপিয়া উহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া নিঃশব্দে আমার ঘরের কানাচের দিকে আসিতেছে। হেরিকেনটা সত্যসত্যই একবার উঁচু করিয়া দেখিয়া লইলাম। দুয়ার খোলা, রজনী নিকটেই বসিয়াছিল। দুয়ারটা ভেজাইয়া দিতে বলিলাম। রজনী খোঁড়া পায়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া খিল আঁটিয়া দিল, কারণ জিজ্ঞাসা করিল না। বোঝা গেল, ভয় কেবল আমার একার নহে। মেঘ জমিয়া চারিদিক এত আঁধার করিয়াছে যে এরূপ ভাব আমার জন্মে দেখি নাই। এই অন্ধকার রাত্রিতে বিদ্রোহী রাইচরণের দল নিশ্চয় চুপ করিয়া বসিয়া নাই, এমনি আশঙ্কায় গা ছমছম করিতে লাগিল। ঘনশ্যাম সেই যে থানায় গিয়াছে, এখনো ফেরে নাই। রান্নাঘরে আলো নিবানো। যে লোকটা রান্না করিয়া থাকে সে এই দুর্যোগে হয়ত আসে নাই, কিংবা আসিয়া থাকে ত ইতিমধ্যে কোন গতিকে কাজ সারিয়া খিল আঁটিয়া দিয়াছে। রজনী তামাক সাজিয়া আপন মনে টানিতে লাগিল। যা হোক কিছু কথাবার্তা কহিবার জন্য বলিলাম, ও রজনী, রাইচরণের পশ্চিমঘরের কানাচে যে রাস্তা, কাণ্ডটা ঘটল বুঝি সেইখানে?

রজনী উত্তর করিল না, যেন শুনিতেই পাইল না।

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, রাইচরণ কি বলছিল? কাছারিতে ছোটবাবু এসেছেন, তাঁর নজরানা নিয়ে যাচ্ছি—এই না?

রজনী মুখ ফিরাইয়া বাহিরের দিকে ইসারা করিয়া চুপি চুপি কহিল, ওসব কথা থাকগে এখন বাবু, রাতবিরেতে দরকার কি? কে কোথায় ওত পেতে বসে আছে, তার ঠিক নেই—

কথা শুনিয়া সর্বদেহে কাঁটা দিয়া উঠিল। ইহা সম্ভব বটে। আমি যেখানে বসিয়া আছি তাহার পাশে একটি চাঁচের বেড়ার ব্যবধানে হাত দুয়েকের মধ্যে হয়ত সেই খুনে লোকেরা ঢাল-সড়কি লইয়া দল বাঁধিয়া নজরানা দিতে বসিয়া আছে। দশ বছর পরে পাড়াগাঁয়ে পা দিয়াছি, দশ বছর আগেকার যে সব দিনের অস্পষ্ট স্মৃতি এখনও মনের মধ্যে আছে, সে সময়ে মানুষ এমন করিয়া মানুষের রক্তপাত করিত না। তখন দেখিতে পাইতাম, ক্ষেত চষিবার ও গোলা বাঁধিবার ভীষণ প্রতিযোগিতা। পেটে খাইতে যে পয়সা খরচ হয়, এ বোধ কাহারও ছিল না। আমাদের বাড়িতেই দেখিয়াছি, উনুনে সমস্ত দিন অনির্বাণ রাবণের-চিতা জ্বলিতেছে। সেজজেঠাকে কালোয়াতি রোগে ধরিয়াছিল, পাখোয়াজ ঘাড়ে করিয়া ক্রোশ দুই দূরে মাদারডাঙায় চলিয়া যাইতেন। রাত্রি দুপুর হইয়া

যাইত। কোনদিন মোটে ফিরিতেন না। আবার কোন কোন দিন একেবারে জন পাঁচ-সাত সঙ্গী লইয়া হানা দিতেন। তখন হয়ত ঠাকুরমা, ন-পিসি, জেঠাইমারা সকলে শুইয়া পড়িয়াছেন। আবার উঠিয়া ভাত চাপাইতে হইত, মুখে একটু বিরক্তভাব কখনও দেখি নাই। বাড়িতে লোক আসিয়াছে, রাঁধিয়া-বাড়িয়া খাওয়ানো, ইহা ত মস্ত আনন্দের কথা। এখনকার রীতিনীতি দেখিয়া অনেক সময় সন্দেহ হয়, হয়ত উহা কবে একদিন ছেলেবেলায় স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম—উহার কোন সত্য অস্তিত্ব নাই। পরক্ষণে আবার তাকাইয়া তাকাইয়া দেখি, কান্তরামের বড় ছেলের কুঁড়েঘরের পাশটিতে জঙ্গল-ভরা সারি সারি পাঁচটি খোলার ভিটা নিবন্ত পঞ্চপ্রদীপের মতো এখনও পড়িয়া আছে। তখন মনে হয়—না, মিথ্যা নয়—স্বপ্ন নয়—উহা সত্য, সত্য।

বেড়ার ফাঁকে নজর পড়িল, রাস্তার উপর একটি আলো।

কে? ও কে? কথা বল না কেন?

কেবলই প্রশ্ন করিতেছি, কিন্তু উত্তর দিতে যেটুকু অবকাশের প্রয়োজন তাহা দিতেছি না। রজনীও উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমার সহিত সমস্বরে প্রশ্ন শুরু করিল। আলো নিরুত্তরে আসিয়া কাছারির দাওয়ায় উঠিল; তারপর বলিল, রজনী দুয়ার খোল্।

ঘনশ্যামের কণ্ঠস্বর। যাক, রক্ষা পাইলাম।

সঙ্গে আর কাহারা আসিতেছিল। তাহাদের উদ্দেশ্যে ঘনশ্যাম বলিল, তোরা বাপু বাড়ি যা, আর দরকার নেই। তারপর গলা নামাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, অত চেঁচামেচি করছিলেন কেন? রাহাজানি করতে আসে কি হেরিকেন জ্বেলে সন্ধ্যাবেলায়?

তা বটে। ভাবে বোঝা গেল, বেশ জোর পায়েই ঘনশ্যাম চলিয়া আসিয়াছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া জিরাইয়া লইল, তারপর রজনীর দিকে চাহিয়া কহিল, তুই বেটা এরি মধ্যে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিস যে! মোকর্দমার অসুবিধে হবে। হাসপাতালে শুয়ে থাকতে হবে নিদেনপক্ষে তিনটি মাস। সেইরকম এজাহার লিখিয়ে দিয়ে এলাম। বলিয়া হঠাৎ যেন কি মনে পড়িয়া গেল—রজনী, একটু বাইরের দিকে গিয়ে বোস—

হুকুম ত হইয়া গেল, কিন্তু আজিকার রাত্রে বাহিরে গিয়া বসা যে সে কর্ম নয়। একবার সড়কির ডাক ফস্কাইয়া পায়ে আসিয়া বিঁধিয়াছে, বারান্তরে উহারা ভুল সংশোধন করিয়া লইবে না তাহার নিশ্চয়তা কি? অথচ মুশকিল এই, এতবড় কাছারির পাইকের পক্ষে ভয়ের কথাটা মুখ ফুটিয়া বলা চলে না। রজনী যেমন বসিয়াছিল, তেমনি রহিল।

ঘনশ্যাম হুঙ্কার দিয়া বলিল, বেটা শুনতে পাস নে? বলছি, একটা গোপন কথা আছে—

নিতান্ত মরিয়া হইয়া রজনী ডানহাতে লইল একখানা লাঠি, তারপর অতি সন্তর্পণে এদিক ওদিক তাকাইয়া দাওয়ার কোণে গিয়া বসিল।

ঘনশ্যাম ফিসফিস করিয়া কহিল, এই ইয়ে, টাকাকড়ি যা আছে একটা থলিতে ভরে কোমরে বেঁধে ফেলুন, গতিক বড় সুবিধের নয় বুঝলেন? কাগজপত্তোর যা কিছু, গোলমাল দেখে অনেকদিন আগেই সরিয়ে ফেলেছি।

তারপর ধাঁ করিয়া তাহার গলা একেবার সপ্তমে চড়িল। থানায় গিয়ে দেখি ভোঁ-ভোঁ—ছোট দারোগা বড দারোগা দু জনেরই পাত্তা নেই সকাল থেকে। শেষকালে এলেন অবিশ্যি। কাজ বাগিযে নিয়ে চলে এলাম। তাইতে দেরি হয়ে গেল। টুনেঘরা ডাকাতির কেসে গিয়েছিলেন। দিল ডুবি হয়ে বেটারা যেন সিংহীর পাঁচ পা দেখেছে—কেবল খুনজখম, চুরি-ডাকাতি। টের পাবে, টের পাবে—'পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে'—

কবিতার এক চরণ আবৃত্তি করিয়াই চুপ করিল। একটু পরে নিশ্বাস ফেলিয়া আমি কহিলাম, রাত অনেক হয়েছে, খেয়েদেয়ে এবার শোবার ব্যবস্থা হোক, ঘুম পাচ্ছে –

ঘনশ্যাম তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিল- ঠিক কথা, সকাল থেকে আবার খাটুনি শুরু। একসঙ্গে একেবারে বিশখানা ওয়ারেণ্ট বের করে এসেছি। রাত না পোয়াতেই বন্দুক-টন্দুক নিয়ে পুলিস আসবে। তখন এক এক বাড়ি ঘেরাও কর, আর মেয়েমর্দ ধরে ধরে চালান দেও। সড়কি মারা বের করে দিচ্ছি। ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ দেখেন নি।

চোখ টিপিয়া ইসারায় আমাকে বলিল. আশে পাশে যদি কেউ থাকে ত শুনে যাক, ভয়ে হাত পা পেটের ভিতর সেঁদিযে যাবে।

রজনী আসিয়া ঘরে ঢুকিল, তাহার মুখ পাংশু। অন্ধকারের দিকে আঙুল বাড়াইয়া বলিল, নায়েব মশায়, মানুষ আশশ্যাওড়ার বন ভেঙে মড়মড় করে চলে গেল!

আমি কহিলাম, শেয়াল-টেয়াল হবে, তোমার ভয় লেগেছে রজনী, তাই ঐ রকম ভাবছ। তুমি ঘরের মধ্যে এসে বসো।

ঘনশ্যাম মৃদুস্বরে বলিল, যাই হোক, এখন আর রান্নাঘরে গিয়ে কাজ নেই। ঘরের বেড়াটা তেমন সুবিধের নয়। এক রাত না খেলে কেউ মরে যায় না মশায়। গেল বছর কি হল—সাতবেড়ে কাছারিতে ম্যানেজার কালীচরণ শিকদার এলেন তদারক করতে। ভদ্রলোক কেবল মাছের ঝোলের বাটি টেনে

নিয়ে বসেছেন—গুড়ুম করে এক গুলি। দিন দুপুরে এতবড় কাণ্ড, অথচ খুনের মোটে আস্কারাই হল না। সমস্ত প্রজা একজোট কিনা।

শুনিয়া আর ক্ষুধা রহিল না। বলা ত যায় না, রান্নাঘরে যদি রাইচরণ নজরানা লইয়া দেখা করিতে আসে। এদিকে কোথাও কিছু নয়, লোকজন কাহাকেও দেখিতেছি না, ঘনশ্যাম আরম্ভ করিল বিষম চেঁচামেচি—

ওরে বেটা উজবুক, হাঁ করে রইলি যে! সমস্ত রাত এইরকম কাটবে নাকি? তুই না পারিস, আর কাউকে বল্। ফরাসের উপর দুটো তোষক পেতে দিক। আলনার পরে চাদর আছে, বাবুর বিছানায় পেতে দে। আমার লাগবে না। আর দুটো কাঁথা দিস, রাত্তিরে বৃষ্টি হলে শীত লাগতে পারে।

বলিয়া কিন্তু কাহারও অপেক্ষা না করিয়া ঘনশ্যাম নিজেই চটপট সমস্ত পাতিয়া লইল। দুইজনে শুইয়া পড়িলাম। পরক্ষণেই আবার উঠিয়া আলো নিভাইয়া দিল।

বলিলাম, আলো জ্বালা থাকলেই ভাল হত।

ঘনশ্যাম কহিল, না, মিছে তেল পুড়িয়ে লাভ কি। বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

ইহার পর বোধকরি ঘন্টাদেড়েক কাটিয়া থাকিবে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুম বেশ জমিয়া আসিয়াছিল। হঠাৎ গলার উপর মানুষের হাতের শীতল স্পর্শ। একমুহূর্তে ঘুমের মধ্যেও সারাদিনের আতঙ্ক মাথা খাড়া করিয়া উঠিল। রাইচরণের দল ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গলা কাটিতে আসে নাই ত? চিৎকার করিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় ঘনশ্যাম আমার মুখের উপর হাত চাপিয়া চুপি চুপি কহিল, আমি—আমি—ভয় পাবেন না। উঠুন ত।

উঠিয়া বসিলাম। অন্ধকারে তাহার চোখ দুটো যেন জ্বলিতেছে, হাতে লম্বা সড়কি। বলিল, এখানে শোয়া হবে না। বেটারা হন্তে কুকুরের মতো ক্ষেপে গেছে, রাত্রে কি করে বসে তার ঠিক নেই। চলুন—

আবার চলিতে হইবে, বলে কি! ঘুম উড়িয়া গেল। ভগবান, কাহার মুখ দেখিয়া যে এই জংলি পাড়াগাঁয়ে মরিতে আসিয়াছিলাম। এই ঘনান্ধকার বর্ষারাত্রে না-জানি কোথায় যাইতে হইবে!

ঘনশ্যাম বলিতে লাগিল, উঠুন, অসুবিধে কিছু নেই—বেশ ভাল জায়গা দেখা আছে। এ-গ্রামে কাউকে বিশ্বাস করিনে, পেটে ক্ষিধে তো সকলের। ক্ষিধের চোটে দু-চারটে ছিটকে এসেছে আমাদের দলে, খবরাখবর দেয়, দল ভাঙাভাঙি করে। কিন্তু কোন্ বেটার মনে কি আছে, কে জানে?

যাচ্ছি কোথায় তা হলে?

বাঁকাবড়শি নীলাম্বর বিশ্বাসের বাড়ি। আবার ঘোর থাকতে ফিরে এসে শোব—কাকপক্ষীতে টের পাবে না।

বাঁকাবড়শি গ্রাম আমার চেনা, অনেক বৈঁচির জঙ্গল আছে। ছোটবেলায় বৈঁচিফল খাইতে খাইতে একদিন ততদূর অবধি চলিয়া গিয়াছিলাম। বলিলাম, সে তো অনেক দূর—

ঘনশ্যাম বলিল, কোথায় দূর! মোটে আধক্রোশ পথ। খাল পার হতে হবে, তা মজবুত সাঁকো বাঁধা আছে। অসুবিধে কিছু নেই—

না থাকিলেই ভাল। আর সে বিবেচনা করিবার অবসরই বা দিল কোথায়? জুতা পায়ে দিতেও ঘনশ্যামের আপত্তি, বলিল, উঁহু, শব্দ হবে। কে কোথায় ওত পেতে বসে আছে, কাজ কি। দাঁড়ান—

বলিয়া একটা পাশের বালিশ আমার শিয়রের বালিশের উপর শোয়াইল, সযত্নে তাহার উপর কাঁথা চাপা দিল। অন্ধকারে দেখিতে পাইতেছিলাম না, কিন্তু বিছানার ঠিক পাশে বসিয়াছিলাম বলিয়া সমস্ত টের পাইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ আবার কি ঘনশ্যাম?

ঘনশ্যাম কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিল, এ মতলব থানা থেকে আসবার পথেই ভেবে রেখেছি। ঐ যে হৈ চৈ করে আপনার জন্য বিছানা করতে বললাম, সব তার মানে আছে মশায়। আশেপাশে চর টর যারা আছে, শুনে গিয়ে খবর দিক। কাঁথা-চাপা পাশবালিশ রইল, রাত্রে ঘরে ঢুকে আপনি শুয়ে আছেন মনে করে কোন বেটা যদি কোপ-টোপ ঝাড়ে কি বেকুব হবে বলুন ত! কালকে এসে হয়ত দেখব, বালিশটা দুইখণ্ড হয়ে আছে।

স্বর শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, শত্রুর সম্ভাবিত বেকুবিতে ঘনশ্যাম ভারি খুশি হইয়াছে।

নিঃশব্দে সে দরজা খুলিল, আমি পিছনে পিছনে চোরের মতো বাহির হইয়া আসিয়া দরজায় শিকল লাগাইলাম। টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে শুরু হইয়াছে। কোথাও হাঁটু অবধি কাদা, জায়গায় জায়গায় জল বাধিয়া রহিয়াছে, জল ছিটকাইয়া একেবারে মাথা অবধি উঠিতেছে। সে যে কি দুঃখের যাত্রা, মনে করিলে এখনও কান্না পায়। খালি পা, অন্ধকারে ছাতা খুঁজিয়া পাই নাই। তার উপর ঘনশ্যাম ফাঁকা রাস্তা দিয়া চলিতে দিবে না, তাতে আততায়ীর নজরে পড়িবার সম্ভাবনা। বনজঙ্গল ভাঙিয়া অতি সন্তর্পণে চলিতে লাগিলাম। রক্তার মধ্যে অন্ধকারে ক্রমে ক্রমে দৃষ্টি খুলিয়া গিয়া ঘনশ্যামের অস্পষ্ট মূর্তি দেখিতে পাইতেছিলাম। কোথা দিয়া কোনখানে যাইতেছি তাহার কিছুই আন্দাজ ছিল না, কোন গতিকে উহার পিছন ধরিয়া

চলিয়াছিলাম। এক একবার সে স্থির হইয়া দাঁড়ায়, চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া লয়, আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করি: কি? কোন কিছু দেখতে পাচ্ছ নাকি? ঘনশ্যাম জবাব দেয়: না, চলুন। আবার অগ্রসর হইতে থাকে। হঠাৎ একবার পিছনে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, সর্বনাশ, শুধু হাতে আসছেন নাকি? শিগগির একটা জিওলের ডাল ভেঙে নিন। শিগগির—

ক্রমে খালের ধারে পৌঁছিলাম। মেঘ ও অন্ধকার আবার এত জমিয়া আসিল যে ঘনশ্যামকেও আর দেখা যায় না। অতঃপর চোখ দিয়া দেখিয়া নয়—পা দিয়া স্পর্শ করিয়া বুঝিলাম, বাঁশের সাঁকোর উপর উঠিয়াছি। একখানি মাত্র বাঁশ। পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার উপর দিয়া যাইতেছি, হাতে ধরিবার জন্য আর একখানি বাঁশ উপরে বাঁধা আছে। দুইটা মানুষের ভারে বাঁশ মচ মচ করিতে লাগিল, বুঝি-বা সবসুদ্ধ ভাঙিয়া চুরিয়া নিশীথরাত্রে খালের জলে গিয়া পড়িতে হয়।

ঘনশ্যাম উপরে গিয়া নিশ্বাস ফেলিল। বলিল, যাক, নিশ্চিন্ত। খাল পার হয়ে কোন শর্মা আর এদিকে আসছেন না। এই খাল হল আমাদের এলাকার সীমানা—

আবার বলিল, এখনো পার হতে পারলেন না? তা আসুন—আস্তে আস্তেই আসুন মশায়। খুব সাবধান হয়ে ধরে ধরে আসবেন, বৃষ্টির জলে বাঁশ পিছল হয়ে গেছে। সেদিন একটা লোকের এইখান থেকে পড়ে যা দুর্গতি! ভাসতে ভাসতে আর একটু হলে বেড়জালের মধ্যে ঢুকে গেছল আর কি!

খাল পার হইয়াও পথ ফুরাইল না। কত পথ চলিলাম জানি না, শেষে বাঁশের বেড়া ডিঙাইয়া এক গৃহস্থের বাহিরের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলাম। ঘনশ্যাম বলিল, নীলাম্বর বিশ্বাসের বাড়ি।

তবু ভাল। ভাবিয়াছিলাম, তাহার ঐ আধ ক্রোশ পথ চলিতে বুঝি সমস্ত রাত্রিতেও কুলাইবে না।

ঘনশ্যাম বাহিরের আলগা বড় ঘরখানির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। কিন্তু পা দিয়াই চক্ষের নিমেষে নামিয়া পড়িল। যেন সাপ দেখিয়াছে। এদিকে কাদায় বৃষ্টিতে সমস্ত কাপড়চোপড় মাখামাখি, মাথা দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে, একটুখানি আশ্রয় পাইলে বাঁচিয়া যাই। আবার নামিয়া আসিতেছে দেখিয়া বিরক্তি ধরিল। সারারাত এমনি করিয়া ঘুরাইয়া বেড়াইবে নাকি? এমন দগ্ধিয়া মরার চেয়ে সড়কির আঘাতে প্রাণ দেওয়া যে ঢের ভাল ছিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম: কি হল?

জবাব দিল: এখানে হবে না। এ ঘরে কেউ শোয় না বলে জানতাম; আজকে দেখছি এক পাল মানুষ—

আমি কহিলাম, হোক গে। মানুষ শুয়েছে, বাঘ ত নয়। তুমি ওদের ডেকে বল। দু-জনে একটা রাত মাথা গুঁজে পড়ে থাকব, তা দেবে না? যেখানে হয় শুয়ে পড়ি—

ঘনশ্যাম মাথা নাড়িয়া কহিল, তা হয় না। ডেকে তুলব কি, হঠাৎ যদি কেউ জেগে উঠে আমাদের দেখে ফেলে তা হলে সর্বনাশ, তা বুঝছেন না? কাল যদি এ অবস্থা জানাজানি হয়ে যায়, এ অঞ্চলে কোন বেটা আর মানবে? চলুন, আর এক বাড়ি যাই। এবারে ফিরব না, এবারে নির্ঘাত—

হায় ভগবান!

ঘনশ্যাম বলিল, দূর নয়, কাছেই। আধ ক্রোশও হবে না। উঠুন।

ফের আধ ক্রোশ! আধ ক্রোশের কথা শুনিয়া শুনিয়া যে আর পারি না। আমি ছাঁচতলায় বসিয়া পড়িয়াছিলাম, মরিয়া হইয়া বলিলাম, নায়েব মশায়, আর এক পা ও যাচ্ছি নে। যা থাকে কপালে, এখানে হয়ে যাক। কোথাও না জোটে এই উঠোনেই শুয়ে পড়ব। কার মুখ দেখে যে কাশী থেকে বেরিয়েছিলাম!

ঘনশ্যাম চিন্তিত হইল। কহিল, ভারি মুশকিলে ফেললেন। কি করা যায়, তাইত···আচ্ছা দেখি। বলিতে বলিতে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, আসুন, হয়েছে—

জিজ্ঞাসা করিলাম: কত দূর?

এই বাড়িতেই। নিতান্ত মন্দ হবে না।

ঢুকিতে হইল গোয়ালঘরে। গোরু এবং বাছুরে ঠাসাঠাসি, তিল ফেলিলেও বোধ হয় স্থানাভাবে গোরু-বাছুরের গায়ের উপর রহিয়া যাইবে। এবং গোবর ও গোমূত্র সহযোগে মেজের উপর এমন গভীর সুপবিত্র কর্দমের সৃষ্টি হইয়াছে যে তাহার মধ্যে কোথায় যে শুইতে হইবে ভাবিয়াই পাইলাম না।

কিন্তু শুইবার জায়গা ঠিক হইয়াছে নিচে নয়, উর্ধ্বলোকে।

আড়ার উপর বর্ষার জন্য সঞ্চিত শুকনা বাঁশের চেলাকাঠ সাজানো, ঘনশ্যাম অবলীলাক্রমে খুঁটি বাহিয়া তাহার উপর উঠিল। আমাকে কহিল, হাত ধরব নাকি?

হাত আর ধরিতে হইল না। স্বর্গারোহণ করিলাম। দেখি, সেখানেও সুখের অতি উত্তম ব্যবস্থা। মশা ভন ভন করিতেছে, পিছনের ডোবা হইতে

কোলাব্যাঙের একটানা আওয়াজ, ফুটা চাল হইতে দু এক ফোঁটা বৃষ্টিও যে গায়ে আসিয়া না লাগিতেছে এমন নয়। মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয়, যদি ইহার একখানা বাঁশের চেলা এদিক ওদিক সরিয়া যায় তাহা হইলে এই জীবনে একটা রাত্রি অন্তত মহাদেব হইয়া গোপৃষ্ঠে চড়িয়া দেখা যাইবে।

ঠাণ্ডা বাতাস, সমস্তটা দিন মনের উপর দুশ্চিন্তা চাপিয়াছিল,—এতক্ষণে একটু চোখ বুজিলাম। ঘুমাইয়া পড়িতে দেরি হইল না। পরক্ষণে বাঁশ মচ মচ করিয়া উঠিল। গ্রহের দৃষ্টি বুঝি কাটে নাই, ভাঙিয়া পড়ে নাকি? তাড়াতাড়ি চোখ মেলিয়া দেখি তাহা নয়, ঘনশ্যাম নামিয়া যাইতেছে।

কহিল, শুয়ে থাকুন, এক্ষুনি ঘুরে আসছি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আবার কোথায়?

কাছারিবাড়ি। বড্ড একটা ভুল হয়ে গেছে। যাব আর আসব। আপনি স্বচ্ছন্দে শুয়ে থাকুন।

ঘুম এমন আঁটিয়া আসিয়াছিল যে আর দ্বিরুক্তি করিলাম না। তারপর আর কিছুই জানি না। জাগিয়া উঠিলাম যখন ঘনশ্যাম হাত ধরিয়া টানাটানি করিয়া ডাকিতেছে: উঠুন, শিগগির উঠুন, ভোর হয়ে এল। কেউ না উঠতে কাছারির বিছানায় গিয়ে ভালমানুষের মতো শুতে হবে—

বাহিরে আসিয়া দেখি, আকাশ পরিষ্কার—মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের শেষাশেষি কি একটা তিথি। বিগতপ্রায় রাত্রির আকাশে পাণ্ডুর ক্ষীণ চাঁদ উঠিয়াছে। সাঁকোর উপর উঠিয়া ডান হাত দিয়া বাঁশ ধরিতে যাইতেছি, হাতের দিকে নজর পড়িতে চমকিয়া উঠিলাম। একি, রক্ত কোথা হইতে আসিল? দুপুর হইতে রক্তের বিভীষিকা দেখিতেছি, রাত্রির শেষ প্রহরে মুক্ত বিলের সীমানায় আমার সর্বাঙ্গ রক্তের আতঙ্কে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ঘনশ্যাম পিছনে ছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম: ঘনশ্যাম, দেখ, দেখ, আমার হাতে রক্ত এল কোত্থেকে?

চাহিয়া দেখি, ঘনশ্যামের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। জবাব কি দিবে, তাহারই কাপড়-চোপড় যেখানে সেখানে গাঢ় রক্তের মাখামাখি। কি-একটা অস্ফুট ভাবে বলিয়া তাহাই সে একনজরে দেখিতেছিল।

সাঁকো হইতে নামিয়া আসিলাম। কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম: এ কি? কি করেছ? আমায় সত্যি কথা বল।

ঘনশ্যামের কথা নাই।

তাহার দুই কাঁধ ধরিয়া প্রচণ্ড নাড়া দিয়া কহিলাম, শুনতে পাচ্ছ? রাত্তিরে বেরিয়েছিলে, কার সর্বনাশ করে এলে?

জিভ দিয়া ওষ্ঠ ভিজাইয়া লইয়া কোন গতিকে সে কহিল, ও এমনি—

এমনি এমনি আকাশ ফুঁড়ে রক্ত এল? আজ পাঁচ ছ-দিন ধরে তোমার কাণ্ড দেখছি। মালিক আমরা, মুনাফা আমাদের, কথা বলতে পারিনে। কিন্তু এর কি সীমা নেই? কাল পুলিশ এলে আমি নিজে সাক্ষি দিয়ে তোমায় খুনী বলে ধরিয়ে দেব।

বলিতে বলিতে মনে হইল বুঝি-বা কাঁদিয়া ফেলিলাম।

ঘনশ্যাম এমনি করিয়া তাকাইল, যেন আমার কথা বুঝিতে পারিতেছে না। কহিল, বাবু, ঠাণ্ডা হন—খুন হল কোথায় যে অমন করছেন?

রাত্তিরে উঠে কোথায় বেরিয়েছিলে? বলো, বলতে হবে—

এবার ঘনশ্যাম বিরক্ত হইল। কহিল, বলেছি ত কাছারিবাড়িতে। এক-শ বার এক কথা। বলে, যার জন্যে চুরি করি—যাকগে, কর্তা নিজে যদি আসতেন আমার কদর হত। একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল, তাই গিয়েছিলাম। ভুলচুক কার না হয় মশায়?

বলিয়া খালের কিনারায় হাত ও কাপড়ের রক্ত ধুইতে বসিয়া গেল। বলিল, আপনার হাতটা ধুয়ে ফেলুন, চিহ্ন রাখতে নেই। হাত ধরে আপনাকে ডেকে তুলবার সময় একটুখানি লেগে গেছে। যে ঘুরঘুটি অন্ধকার, আগে টের পাই নি, এত রক্ত লেগেছে।

আমি কিন্তু অমন শান্ত হইয়া বসিয়া হাত ধুইতে পারিলাম না। বলিলাম, ঘনশ্যাম, কথাটা ভাঙছ না কেন? কি করে এলে বলো শিগগির।

ঘনশ্যাম কহিল, ভুল করে ফেলেছিলাম। থানায় এজাহার দিলাম, পাইকের পায়ে সড়কি মেরেছে। দারোগা জিজ্ঞাসা করল: কোন পায়ে? বললাম, বাঁ-পায়ে। শুয়ে শুয়ে মনে হল, বাঁ-পায়ে তো নয়—ডান পায়ে। ভাগ্যিস কথাটা মনে উঠল।

কহিলাম, ডান পায়েই ত। রজনীর প্রাণটা যাচ্ছিল আর একটু হলে, চোখ মেলে ওর দিকে কি চেয়েও দেখনি একটা বার?

ঘনশ্যাম বলিল, দেখেছিলাম বৈকি। সবই ঠিকঠাক লিখিয়ে দিয়েছি—কেবল ঐ একটা ভুল। ভুল আর কার না হয় বলুন, তবে বড় মারাত্মক ভুল। সকালে দারোগা আসবে তদন্তে, মামলা ফেঁসে যাওয়ার জোগাড়। তাই রাত থাকতে থাকতে একবার নিজের চোখে দেখতে গেলাম।

কহিলাম, দেখে আর কি হল, গোলমাল যা হবার সে ত হয়েছেই।

আজ্ঞে, গোলমাল হবে ত এ অধীন আছে কি করতে? ভাবনা নেই, সব ঠিক করে দিয়ে এসেছি। রজনীর বাড়ি আপনি দেখেন নি। চার পোতায় মাত্র

একখানা ঘর; সে ঘরের আবার সামনে বেড়া নেই। সুবিধে হল। গিয়ে দেখলাম, বেহুঁস হয়ে ঘুমুচ্ছে। বৌটাও আর এক পাশে। ঠাউরে দেখি, জখম ডান পায়েই বটে। তখন সড়কি দিয়ে বাঁ-পায়ে আবার এক খুঁচিয়ে দিয়ে এলাম। বাবা গো—বলে যেই চেঁচিয়ে উঠেছে, আমি অমনি সুড়ুৎ করে সরে পড়লাম।

বলিয়া ঘনশ্যাম নিজের চতুরতায় হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল, ডবল সুবিধে হল মশায়। এই নিয়ে রাইচরণের নামে ফের আর এক নম্বর চালাব। এখন বাকি রইল, ডান-পা বাঁ-পায়ের গোলমাল। আমি আগেই যাচ্ছি রজনীর বাড়ি, দারোগা জিজ্ঞাসা করলে যাতে বলে দিনে মেরেছিল বাঁ-পায়ে, রাতে ডান পায়ে। আজ আর রজনী হেঁটে কাছারি আসতে পারবে না। তা শুয়ে শুয়েই সাক্ষি দেবে।

অভিভূতের মতো শুনিয়া যাইতেছিলাম।

ঘনশ্যাম কহিল, কই, হল আপনার হাত ধোয়া? চলুন।

কাছারিবাড়ির কাছাকাছি আসিয়াছি, এই সময়ে ঘনশ্যাম ডাইনের পথ ধরিল। বলিল, আপনি সোজা চলে যান। আমি রজনীর বাড়িটা ঘুরে এক্ষুনি যাচ্ছি।

কহিলাম, দাঁড়াও ঘনশ্যাম—

বোধ করি কণ্ঠস্বরের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু প্রকাশ পাইয়া থাকিবে। সে চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

বলিলাম, আমি আর থাকব না এখানে। এক্ষুনি কাশী চলে যাচ্ছি। তোমার ফেরবার আগেই রওনা হব। পয়লা মোটরে মধুগঞ্জে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে।

ঘনশ্যাম সন্ত্রস্ত হইয়া হাতজোড় করিয়া কহিল, আজ্ঞে, কি অপরাধ করলাম?

আমি বলিলাম, অপরাধের কথা নয়। আমি এ সব পেরে উঠছি নে, বাবাকে পাঠিয়ে দেব, তাতে কাজের সুবিধে হবে।

ইহাতে ঘনশ্যামের মতদ্বৈধ নাই, অতএব প্রতিবাদ করিল না। কেবলমাত্র কহিল, কিন্তু অন্তত আজকের দিনটে থেকে যান। দারোগাবাবু আসবেন—আমরা আইন-টাইন ত তেমন বুঝি নে।

বলিলাম, ফল তাতে বড় সুবিধে হবে না ঘনশ্যাম, দারোগার সামনে হয়ত কি বলে বসব, কেস মাটি হয়ে যাবে। তাতে কাজ নেই।

বলিয়া হন হন করিয়া পথটুকু পার হইলাম।

কাশী গিয়া বাবাকে যেই খবরটা জানাইয়াছি অমনি যেন বারুদে আগুন লাগিল। বলিলেন, যাক প্রাণ, রোক মান। তুমি কোন লজ্জায় পালিয়ে এলে বাপু? রাইচরণের মুণ্ডুটা আনতে পারলে না, যেত দু-পাঁচ হাজার—যেত। আমার কি? আমার আর ক'দিন? চোখ বুজলে সব ফক্কিকার—

বলিয়া গুম হইয়া বসিয়া খানিকক্ষণ বোধকরি সংসারে নশ্বরতাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, এই গ্যাঁট হয়ে বসে রইলাম। নাগপুরেও যাচ্ছি নে, দেশেও না। বিষয় আশয় কারবার পত্তোর সব গোল্লায় যাক, কারও খগন গরজ নেই। 'আর যদি কোনদিন নড়ে বসি তা হলে—

একটা ভয়ানক রকমের শপথ করিতে গিয়ে সামালাইয়া লইলেন। বুদ্ধির কাজ করিয়াছিলেন, কারণ শপথ সন্ধ্যা নাগাদ ত ভাঙিতেই হইল।

বিকালবেলায় জিনিসপত্র গোছাইবার ধুম পড়িয়া গেল। আয়োজন গুরুতর। পাঁচজন পশ্চিমা গুণীলোক সঙ্গে যাইতেছে। আর যে কি কি যাইতেছে তাহার সঠিক খবর বলিতে পারি না, আন্দাজ করা চলে। বলিলেন, না মরলে আমার অব্যাহতি আছে!' ছাগল দিয়ে লাঙল চষা হলে লোকে আর ষাঁড় কিনত না।

ইঙ্গিতটা আমাকে উপলক্ষ করিয়া। কিন্তু অনর্থক। আমি ত কোনদিন ষণ্ডত্বের গৌরব করি নাই।

বাবা ততক্ষণে ট্রেনে চাপিয়া হয়ত মোগলসরাই পার হইয়া গেলেন। বীণা প্রশান্ত চোখ দুটি আমার দিকে মেলিয়া শুইয়াছিল। আমি রজনী পাইকের গল্প বলিতেছিলাম। হঠাৎ সে চোখ বুজিয়া জড়সড় হইয়া মাথাটি আমার কোলের মধ্যে গুঁজিয়া দিল। বলিল, তুমি থাম, আমার ভয় করে—

আমি কহিলাম, বীণা, তবু ত সে রক্ত তুমি চোখে দেখনি। বলির পাঁঠার রক্ত যেরকম গলগল করে বেরিয়ে আসে, তেমনি—

বীণা কথা কহিল না। আলগোছে হাত দুখানা বাহির করিয়া আমার মুখ চাপিয়া ধরিল। চক্ষু তেমনি বোজাই আছে।

খানিক পরে চোখ মিট-মিট করিয়া চাহিয়া দেখিল, চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া আমি কি করিতেছি। আর মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তারপর আবার চোখ বুজিয়া দিব্য ভালোমানুষের মতো ঘুমাইতে শুরু করিল।

বাবা ফিরিলেন দিন পনের পরে। আবার গেলেন। এমনি যাতায়াতে বছর খানেক কাটিল। আগে যে মুখ গম্ভীর বিমর্ষ থাকিত, ক্রমশ তাহাতে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন, ঘনশ্যাম খুব জাঁহাবাজ। টাকাকড়ি একটু এদিক-ওদিক করে বটে, কিন্তু ক্ষমতা আছে। ত্যাঁদোড় যে কটা ছিল, সব

ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এখন উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে। মহলী একেবারে যাকে বলে পায়রা-চোখো—

আমার কেমন ধারণা হইয়াছিল, রাইচরণ বাঁচিয়া থাকিতে বিবাদ মিটিবে না। বাবার সেই পাঁচ হাজারের বিনিময়ে মুণ্ড আনিবার আক্রোশটাও মনে ছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম: রাইচরণ মরেছে না দেশ ছেড়েছে?

বাবা কহিলেন, মরেও নি, দেশও ছাড়ে নি। উচ্ছেদ করেছিলাম, তা বউ ছেলেপিলে নিয়ে কাছারি এসে পায়ে জড়িয়ে ধরল। ভাবলাম, চাষীদের মধ্যে সব চেয়ে মানীবংশ—যখন এতটা কাবু হয়েছে, যাকগে। পাইপয়সা না নিয়ে সেই মৌরুসী পঁচিশ বিঘে কবলা করে দিয়ে গেল। আর ঘনশ্যামকে বলেছে ধর্মবাপ। এবার একবার গিয়ে দেখে এসো না—মাথা তুলে কথা কইবে, তেমন বাপের বেটা ও-তল্লাটে কেউ নেই।

মধুসূদনকে মনে মনে স্মরণ করিয়া সভয়ে প্রার্থনা করিলাম, যেন দেখিয়া আসিবার প্রয়োজন সেবারকার মতো আর কখনো না হয়।

কিন্তু মধুসূদন সে প্রার্থনা শুনেন নাই।

ইহার কিছুদিন পরেই কেবলমাত্র চোখের-দেখা দেখিয়া আসা নয়—দেশে চিরস্থায়ী বসবাস করিবার প্রয়োজন ঘটিল। বাবা স্বর্গীয় হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কারবারটিও। বীণা বাপের-বাড়ি গিয়াছিল, মাকে শ্যামবাজারে মাতুলালয়ে আনিয়া রাখিলাম। তারপর বাড়িঘর মেরামত করিয়া বাসযোগ্য করিবার জন্য ঘনশ্যামের সুশাসিত নিরুপদ্রব মহালে অনেকদিন পরে আবার আসিয়া পৌছিলাম।

না, ইতিমধ্যে দেশের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে বটে। গঞ্জের আটখানা দোকানে টিনের চাল দিয়াছে। আধঘন্টা অন্তর বাস, কোন অসুবিধা নাই। বাসের ছাতের উপর বাক্স বোঝাই হইয়া শহরে মাছ চালান যায়। নূতন পোস্ট-অফিস হইয়াছে। মাঝে মাঝে দেশ-বিদেশের ভদ্রলোকেরা বন্দুক লইয়া বিলে পাখী শিকার করিতে আসেন। মাছ চালান দিতে অনেক বরফের দরকার হয় বলিয়া একটি আইস-ফ্যাক্টরি খুলিবার কথা হইতেছে। কোন একটা কোম্পানি জায়গাও দেখিয়া গিয়াছে। গ্রামের প্রান্তে তিনটি তাড়িখানা। এবার নাকি একটি মদের দোকানের ডাক হইবে। মোটের উপর সর্বরকমে সুবিধা—যা চাও তা-ই মিলিবে।

সর্বাগ্রে উঠানের জঙ্গলগুলি কাটাইবার দরকার। সকালবেলা ঘনশ্যামকে লইয়া নিজেই বাহির হইলাম—প্রাতর্ভ্রমণ হইবে, মজুরের তল্লাসও হইবে।

কিন্তু মজুর পাওয়া কিছু কঠিন—অঞ্চলে মোটে চাষাভুষা নাই, তা পাইবে কোথায়? খালি খালি ভিটা পড়িয়া রহিয়াছে। দু-চারজন যাহারা আছে, অবস্থা ভাল হইয়া গিয়া তাহারা আর মজুরি করিতে চাহে না। অবস্থা ভাল হইয়াছে, ঘনশ্যামের মুখে শুনিলাম। নিচু নিচু জীর্ণ কুঁড়েগুলি দেখিয়া মনে হয় বইয়ে যে ধীবরের বাসস্থান পড়িয়াছি, তাহা বোধ করি এই প্রকার। ইহার মধ্যে মানুষ যে সত্যসত্যই ঘরসংসার করিয়া বাঁচিয়া থাকে, আর তাহাদের ভাল অবস্থা হইয়াছে চোখে না দেখিলে তাহা বিশ্বাস হইবার কথা নয়।

দুই জনের বাড়ি হইয়া তারপর গেলাম চরণ বেপারির বাড়ি। চরণ দেখি কাঁচের গেলাসে করিয়া কি খাইতেছে। ঘনশ্যামকে বলিল, নায়েব মশায়, বিশ্রী অভ্যাস হয়ে গেছে। সকালে উঠে আগে চাই মিছরির পানা। নইলে মাথা ধরবে।

রোগ কঠিন বটে।

বলিলাম, ও চরণ, ভাল আছিস? আজকাল বেশ পয়সাকড়ি কামাচ্ছিস—না?

চরণ চিরদিনই বিনয়ী লোক। মুখখানা কাচুমাচু করিয়া জোড়হাতে বলিল, যে আজ্ঞে। লক্ষ্মীর কিরপা মুখ ফুটে কি বলব, আপনার মা-বাপের আশীর্বাদে হচ্ছে একরকম। বাবু, এলেন কবে?

ঘনশ্যাম বলিল, বাবুরা সব দেশে-ঘরে চলে আসছেন। বাড়ির বাগান সাফ হবে। আজকে জোন খাটবি চরণ?

চরণ বলিল, খাটব। তারপর ঘাড়টা ডানদিকে কাত করিয়া আবার বলিল, খাটব। বাবুরা এসেছেন, খাটব না?—নিশ্চয় খাটব।

তবে যাস সকাল সকাল। বলিয়া বাহির হইলাম। পিছন হইতে ডাকিল: নায়েব মশায়।

দুজনেই ফিরিয়া দাঁড়াইলাম।

চরণ হাসিয়া বিচিত্র ভঙ্গিতে বলিল, একটা টাকা। জোনের দাম আগাম না দিতে পারেন, চোটা হিসেবে দিন। দিন দু' পয়সা সুদ—যা রেট আছে। আজকের সুদ কেটে নিয়ে সাড়ে পনেরো আনাই দিয়ে দিন বরং।

ঘনশ্যাম কহিল, সকালবেলা টাকা কি হবে?

আমরা বাড়ির মধ্যে ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গে চরণের বৌ মাথায় কাপড় টানিয়া লজ্জায় জড়সড় হইয়া উঠানের এককোণে বসিয়া ঝাঁট দিতেছিল। আঙুল দিয়া তাহাকে দেখাইয়া চরণ কহিল, মাগীর বজ্জাতি। বলছে চাল বাড়ন্ত। সব চাল বেচে খেয়েছে, থাকবে কোত্থেকে?

এতবড় অভিযোগের পর লজ্জাবতী আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘোমটা আরো একটু বাড়াইয়া দিয়া এক প্রকার স্বগত ভাবেই বলিয়া উঠিয়া, বেয়াক্কিলে কথা। সব চাল বেচে খেয়েছে—কত চাল এসেছিল শুনি?

চরণ কহিল, কাল পাঁচসিকের মাছ বিক্রি হল, তার হিসেব দে। দে গিগ্‌গির।

বৌয়ের হিসাব জ্ঞান খুব প্রখর বলিতে হইবে। অমনি মুখে মুখেই তৎক্ষণাৎ শুরু করিল: শোন্। চুরি করে খেয়েছি নাকি? এই সরু বালাম চাল দু সের ছ আনা, ঘি সাড়ে সাত আনা, মিছরি গরমমশলায় হল সাত পয়সা আর রইল এক পয়সা, তুই বললিনে যে এক পয়সা রেখে কি হবে—কপ্পূর কিনে নিয়ে আয়, জলে দিয়ে খাওয়া যাবে। সে কি আমার দোষ?

হিসাব পাইয়া চরণের আর কথা বলিবার উপায় রহিল না।

ঘনশ্যাম জিজ্ঞাসা করিল: কাল রাত্তিরে বুঝি কিছু হয় নি?

চরণ কহিল, না। কাল বড্ড পাহারায় ছিল। কোন দিন যে কি হবে, কিছু ঠিক করে বলবার যো নেই। তবে মোটের উপর ব্যবসাটা ভাল। বেশ আছি, কোন ঝক্কি নেই বাবা। মাঠের উপর হাঁটুজলে হৈ হৈ করে গোরু তাড়িয়ে লাঙল চযে বেড়ানো -রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, ও সব কি আর পোষায়?

পথে আসিয়া চরণ বেপারির ব্যবসার কথাটা পাড়িলাম। কি এমন সুবিধা-জনক ব্যবসা সে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে?

ঘনশ্যাম খুলিয়া বলিল। একা চরণ বেপারি নয়, চাষীদের মধ্যে যাহারা এখনো এ অঞ্চলে টিকিয়া রহিয়াছে, সকলেই ইহা ধরিয়াছে। ব্যবসাটা ভাল। রাত্রিবেলা ঘণ্টা তিন-চারের কাজ মোটে। সারা দিনমান সকাল দুপুর সন্ধ্যা কখনও কোন পুরুষ মানুষকে নড়িয়া বসিতে হয় না। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া দেখ—হয় ঘুমাইতেছে, নয় তাস খেলিতেছে, নয় ত তাড়ি খাইতেছে। দশটা বেলা না হইতেই সাবান ও গন্ধতৈল লইয়া দলে দলে পুকুরঘাটে নাহিতে বসে। চুল বাগাইয়া টেরি কাটিতে সময় কিছু যায়। গভীর রাত্রিতে গ্রামের মধ্যে যখন নিশ্চল নিষুপ্তি, সেই সময়ে জাল ঘাড়ে কুঁড়ে হইতে টিপি টিপি এক এক জন বাহির হইয়া পড়ে। পরস্পর ফিসফিস করিয়া কথা, ঝুপ করিয়া এক এক বার জাল পড়ার শব্দ—আবার ভোর হইবার আগে যে যার ঘরে ফিরিয়া আসে। জেলেদের পাহারার যে ব্যবস্থা আছে তাহা যথেষ্ট নয়। অতবড় সুবিস্তীর্ণ বিলের সবদিকে তাহারা নজর রাখিতে পারে না। আর ইহারাও সুযোগ সন্ধান সমস্ত শিখিয়া ফেলিয়াছে। তবে নিতান্ত বেকায়দায় পড়িলে

পিঠের উপর কোন দিন দুই-এক ঘা যে না পড়ে তাহা নহে। কিন্তু তাহার বেশি আর কিছু নয়। দু দশটা মাছ চুরি জেলেরা তেমন গ্রাহের মধ্যে আনে না।

সকাল হইতে কাজ মেয়েদের। মাছ গঞ্জে লইয়া বেচিয়া বাজার করিয়া যাবতীয় ঘরকন্নার কাজ সারিয়া রাঁধিয়া পুরুষমানুষদের ডাকিয়া তুলিয়া খাওয়াইতে হয়। তা মন্দ নয়, এরা আছে বেশ।

খালের জলে পা ধুইয়া উঠিব, খালধারের এক বাড়ির দাওয়া হইতে প্রবল চিৎকার আসিতেছে : নায়েব মশায়, ইদিকে আমাদের বাড়ি একবার হয়ে যাবেন—

ঘনশ্যাম বলে, এই রে! চলুন চলুন—

ডেকে ডেকে গলা ভাঙছে। শুনে এসো না, কি বলে।

ঘনশ্যাম বলিল, বদ্ধ পাগল। একদম মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

দ্রুত চলিতেছিল, পাগল দাওয়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আমাদের পথ আটকাইল। আমাকে দেখিয়া একগাল হাসিয়া ফেলিল। হাত জোড় করিয়া বলিল, ছোটবাবু পাড়ায় এলেন তা আমার বাড়ি পদধূলি পড়বে না?

ইহাকে চিনি ত। সেবার আসিয়া দেখিয়াছি, সুস্থ বলিষ্ঠ লোক। পাঠশালায় পণ্ডিতি করিত, পাড়ার বিবাদ বিসম্বাদে সালিসি করিত, চিঠিপত্র দলিল দস্তাবেজ লিখিয়া দিত। এখন যেন একটি মড়া হাত পা মেলিয়া বেড়াইতেছে।

ঘনশ্যাম বলিল, না খেয়ে শুকিয়ে নির্বংশ ভিটেয় পড়ে আছ, গড়ভাঙায় চেপে বোসো না কেন? তারা যত্ন করছে, খাওয়া পরা দেবে, দু'টাকা নগদ মাইনেও দেবে বলছে—

পণ্ডিত আমার দিকে চাহিয়া বলে, শুনুন হুজুর, পাগলের কথাবার্তা শুনুন। ভিন গাঁয়ে গিয়ে পাঠশালা বসাব, ওদিকে যথাসর্বস্ব উচ্ছন্ন যাক। এঁদের তো তা হলে পোয়াবারো—

বলিয়া হা-হা করিয়া উচ্চহাসি হাসিতে লাগিল।

ঘনশ্যাম বিদ্রূপ করিয়া বলে, যথার মধ্যে ত ঐ ফুটো ঘর, আর সর্বস্বের মধ্যে ছেঁড়া দপ্তর—

পণ্ডিত এই কথায় জ্বলিয়া উঠিল।

ছেঁড়া বলে নাক সিঁটকাচ্ছ? ছেঁড়া দপ্তরে আমার লাখ টাকার দলিল, তা জানো?

পাগল একেবারে আমার হাত ধরিয়া ফেলিল : আসুন হুজুর, আসতেই

হবে আমার বাড়ি। মস্ত বড় উকিল আপনি, একবার এসে দেখে যান আমার দলিল বলছে, কিছু নেই নাকি আমার? বলছে, নির্বংশ ভিটে? আসুন আসুন—

সে কি টান। ঘোড়দৌড় করাইয়া লইয়া যাইতেছে। ঘরের ভিতর হইতে ছুটিয়া দলিলের দপ্তর আনিল। মলিন শতচ্ছিন্ন কাপড়ে বাঁধা। দপ্তর খুলিয়া এক একটা করিয়া কাগজ আমার হাতে দিতেছে। বলে, দেখুন, দেখছেন? কিচ্ছু নেই নাকি আমার? আপনি মনিব—আপনার নামেও মোকদ্দমা করব, যা ছিল বিলকুল আবার ফিরিয়ে আনব।

সত্যই পুঁটিমারির বিলে অনেক জমি পণ্ডিতের। বিশ বছরের দাখিলা বাহির করিয়া দিল। যেবার অজন্মা গিয়াছে, খাজনা দিতে পারে নাই—পরের বৎসর সুদ খেসারত দিয়া খাজনা শোধ করিয়াছে।

ঘনশ্যাম বলিল, এতকাল না হয় দিয়েছ মানি। কিন্তু এই পাঁচ বছর—বিলডুবি হয়ে গল যেখান থেকে? বাকি খাজনায় নিলাম হয়ে গেছে তোমার জমি, এস্টেট থেকে কিনে নিয়েছে। পচা দাখলেয় তা ফিরবে না। ফেলে দাও ফেলে দাও ওসব, পুড়িয়ে ফেল—

কষ্ট চোখে তাহার দিকে এক নজর তাকাইয়া পণ্ডিত দলিলের পর দলিল বাহির করিতে লাগিল। তারপর একগাদা চিঠি। সেগুলি ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম প্রাইভেট চিঠিপত্র—এগুলো আলাদা করে রাখবেন পণ্ডিত মশায়।

দৃঢ় কণ্ঠে পণ্ডিত বলে, এ ও দলিল আমার, বিষম দলিল। রেখে দিয়েছি, মোকর্দমা করব—

বড় মেয়ে বিজয়ার পর শ্বশুরবাড়ি হইতে প্রণাম জানাইয়া পোস্টকার্ড দিয়াছে কুশখালি হইতে লিখিয়াছে, কুটুম্বের দল সদলবলে ছেলের পাকা-দেখা দেখিতে আসিতেছে, নাতির অন্নপ্রাশনে পণ্ডিতের স্বহস্তে-লেখা লালকালির নিমন্ত্রণপত্র খান দুই বাড়তি ছিল, তাহাও রহিয়াছে অজস্র ভুল বানানে কাঁচা হাতের লেখা একখানা খামের পত্র—কোন এক নূতন বউ বরকে পাঠ দিয়াছে 'প্রাণেশ্বর'

পাগল পণ্ডিত সগর্বে বলে, দেখছেন? কিচ্ছু নেই নাকি আমার? ঘনশ্যামের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া অতিযত্নে সে দপ্তর বাঁধিতে লাগিল।

ফিরিবার পথে রাইচরণের বাড়ি। সেই রাইচরণ দাস, যাহার মুণ্ডের প্রতি বাবার মত আগ্রহ ছিল।

ঘনশ্যাম বলিল, যাবেন ওর বাড়ি? আজকাল মজুরি খাটে।

আমি বলিলাম, বলা হয়ে গেছে, আজ থাক।

ঘনশ্যাম বলিল, না না—দেখে যাই, চলুন। উঠানে গিয়া ডাকিল: রাইচরণ? ও রাইচরণ?

লম্বাচওড়া বিশাল দেহ লইয়া সামনে দাওয়ার উপর পড়িয়া আছে, তবু উত্তর দিবে না। বেটা মরিয়া গেল নাকি?

কিন্তু গরজ আমার, ডাক দিলাম: ও রাইচরণ, অসুখ করেছে?

এবার অস্ফুট সাড়া আসিল: উঁ?

বলিলাম, বেলা দুপুর হয়ে গেছে, এখনো ঘুমুচ্ছ?

চোখ দুইটা মেলিয়া আমার দিকে তাকাইল, টকটকে রাঙা যেন দু'টি গুলি। দেখিয়া ভয় করে। একেবারে মেয়েমানুষের মতো রাইচরণ ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ঘনশ্যাম বলিল, আকণ্ঠ তাড়ি গিলেছিস বুঝি? আজকে জোন খাটতে যাবি?

যাব বলিয়া স্বীকার করিয়া সে ঘুমাইতে শুরু করিল।

বেলা বাড়িতেছিল, ইহার কাণ্ড দেখিয়া আর রাগের সীমা রহিল না। ঘনশ্যামকে বলিলাম, চল, যাওয়া যাক। বেটা মাতাল—

কথাটা রাইচরণের কানে গিয়াছিল—ধীর গম্ভীরভাবে উঠিয়া বসিল। তারপর একখানা পা বাড়াইয়া দিয়া কোণের চাউলের কলসিটায় ঠন করিয়া লাথি মারিতেই ভিতরে নড়িয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ শুইয়া পড়িয়া কহিল, না, আমি যাব না।

ঘনশ্যাম কহিল, ঘরে চাল আছে, আর কি বেটা নড়বে? চলুন—

রাইচরণও হাত নাড়িয়া আমাদের চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, গতর খাটানো ছোট কাজ, ও-সব আমি করিনে—

দিন পনেরোর মধ্যে বাড়ির জঙ্গল একদম সাফ হইয়া গেল, আবার শ্রী ফিরিল। চার-পাঁচটা কুঠরির চুনকাম করিয়া একেবারে নূতনের মতো হইয়াছে, আর আর যাহা কাজ আছে ধীরে সুস্থে পরে করিলেই চলিবে। জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হইয়া গেল, আষাঢ়ের প্রথমেই নূতন সংসার পাতিবার আর কোন বাধা নাই। একদিন বিকালে সাগরগোপের ইস্কুলঘরের কাছে বল্লভ রায়ের রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। বেশিক্ষণ দাঁড়াইতে হইল না, বাস আসিল। গাড়িতে উঠিয়া দিব্য আরাম করিয়া গদির উপর বসিলাম।

আর একদিন ছেলেবয়সে ছোটকাকার বিয়ের এই পথে কত দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরিতে হইয়াছিল। দেশের কি আর সেদিন আছে?

তীরের মত ছুটিয়া চলিয়াছি। দূরের গ্রাম হইতে এক পাল গোরু চরাইয়া রাখালেরা ফিরিয়া আসিতেছে। গাড়ি হর্ন বাজাইতে বাজাইতে পালের মাঝখান দিয়া চলিল। এ পথে এমন হইয়াছে যে গোরুগুলো পর্যন্ত আজকাল মোটরগাড়ি ভ্রূক্ষেপ করে না।

মুক্ত বিলের বাতাসে রাস্তার দুই পাশে ছলছল শব্দে জলের আঘাত লাগিতেছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবলি সীমাহীন জলরাশি। জলের মধ্যে এখানে সেখানে তাল ও শিমূল গাছ। চারিদিক অন্ধকার করিয়া মেঘ জমিয়া আসিল। দু একটি লোক ছাতা খুলিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে, হেডলাইট জ্বালিয়া গাড়ি ছুটিতেছে, চতুর্দিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে মোটর-এঞ্জিনের একটানা আওয়াজ।

মাঝে মাঝে পথ গিয়াছে সাপের মতো আঁকিয়া বাঁকিয়া। বাঁক ফিরিবার মুখে গাড়ির তীব্র আলো এক একবার জলের উপর পড়ে। বল্লভ রায়ের উঁচু পাকা রাস্তা, মানুষের ঘরবাড়ি ডুবিয়া যায়, কিন্তু রাস্তার উপর জল উঠে না। মোটর হর্ন বাজাইয়া নির্বিঘ্নে ছুটিতে লাগিল।

হঠাৎ একটি গাছের তলায় আসিয়া গাড়ি থামিয়া গেল। ড্রাইভার নামিয়া পড়িল, ম্যাগনেটে কি দোষ হইয়াছে, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঠিক হইয়া যাইবে। যাত্রীরাও সকলে নামিয়া পড়িলাম। গাছটিকে চিনিলাম অশ্বত্থ গাছ। সামনেই নূতন পুল। দেখিতে দেখিতে পিছন হইতে তিনখানা বাস পর পর আমাদের পাশ কাটাইয়া আগে চলিয়া গেল। উজ্জ্বল আলোকে অশ্বত্থ গাছের আগাগোড়া, টার্নার ব্রিজ এবং রাস্তার বহুদূর অবধি উদ্ভাসিত হইল। এই অশ্বত্থ গাছের তলা দিয়া লক্ষ টাকা দিলেও কেহ যাইতে চাহিত না। আজ আর সেদিন নাই। গাছের ডালপালা ছাঁটিয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে গাড়ি চালাইবার কোন অসুবিধা না হয়।

পাঁচ মিনিটের জায়গায় পনের মিনিট কাটিয়া গেল, কিন্তু আমাদের গাড়িখানি যেমন স্থাণু হইয়া ছিল, তেমনি রহিল। বেড়াইতে বেড়াইতে ব্রিজের উপর গিয়া দাঁড়াইলাম। নিম্নে সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্য দিয়া পুঁটিমারি বিলের সুবিপুল জলরাশি বাহির হইবার চেষ্টায় পাক খাইয়া প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করিতেছে। লোহার কপাট ফেলা আছে। জলের এমন উন্মত্ত গর্জন, যেন এক সঙ্গে সহস্র মানুষ ঐ লোহার কপাটে মাথা ঠোকাঠুকি করিয়া মরিতেছে। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে হইল, এমনি একাগ্রে যদি নিশীথ রাত্রি অবধি কান পাতিয়া থাকিতে পারি, তবে নিশ্চয় জলের ভাষা বুঝিতে পারিব। বহুকাল পূর্বে এক নিরীহ ঘুমন্ত শিশুর রক্ত দিয়া এখানে বাঁধ বাঁধা হইয়াছিল,

জলস্রোত সে বাঁধ ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। এবার গভর্নমেণ্ট বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার লাগাইয়া লোহালক্কড়ে অপূর্ব সেতু বাঁধিয়াছেন—নিষ্ফল আক্রোশে বিলের জল গর্জন করিয়া মরিতেছে, সেতুর একটা লোহাও ঢিলা করিতে পারে না।

সেকালের নরবাঁধের কথা মনে পড়িল, ছোটকাকার বিয়ের কথা মনে পড়িল, দ্বারিক দত্তর কথা মনে পড়িল। একদিন আসন্ন সন্ধ্যায় গামছা পরিয়া কোমরজল ভাঙিয়া এই বাঁধ পার হইতে হইতে বলিয়াছিলেন, সহস্র নরবলি না হইলে এই খাল নাকি বাঁধা হইবে না। মিথ্যুক বুড়া। খাল বাঁধা হইয়া গিয়াছে, সহস্র বলি হইল কই ?

বরঞ্চ দেখি, দেশের দিন ফিরিয়াছে—চারিদিকে আনন্দ—হাসি। জলের শব্দে যেন উচ্ছল হাসির শব্দ শুনিতে লাগিলাম। চরণ বেপারি হাসিয়া বলিতেছে, হেঁ হেঁ সকালে উঠে মিছরির পানা আগে চাই। রাইচরণ পা দিয়া চালের কলসি নাড়িয়া দেখিতেছে, ঠন-ঠন করিয়া বিলের জলের মধ্যে যেন সেই কলসির আওয়াজ হইতে লাগিল। তাড়ি খাইয়া পাঁচু মণ্ডল, রাখু, বিশে সকলে যেন হল্লা করিয়া কোমরে হাত দিয়া ঐ জলের মধ্যে বাইনাচ করিতেছে, আর বলিতেছে, বেশ আছি·· বেশ আছি ঝক্কি নেই, খাসা আছি—

একজন সহযাত্রী আমার দিকে আসিলেন। কহিলেন, বড় ঘুরঘুট্টি অন্ধকার এই যা। নইলে, নরবাঁধ বেড়াবার বেশ জায়গা।

আমি বলিলাম, নরবাঁধ বলছেন কাকে ? সে সব আর নেই। এ হল টার্নার ব্রিজ—

একটা পয়সা—

কে রে ? তাকাইয়া দেখি, অন্ধকারের মধ্যে ছোট একটি ছেলে আসিয়া আমাদের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলাম : এইটুকু ছেলে তুই, এখানে কোত্থেকে এলি ?

জবাব না দিয়া ছেলেটি হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তারপর মুখ ফিরাইয়া দেখি, একটা দু'টা নয়—পিঁপড়ার সারির মতো অশ্বত্থতলা দিয়া ছায়াচ্ছন্ন অনেক মূর্তি আসিতেছে- গণিয়া শেষ করা যায় না, এত। বিলের কোন্ নির্নিরীক্ষ প্রান্ত হইতে বাহির হইয়া রাস্তা পার হইয়া একে একে টার্নার ব্রিজের উপরে তাহারা উঠিতে লাগিল। কঙ্কালসার দেহ—প্রাণ আছে কিনা সন্দেহ, কলের পুতুলের মতো আমাদের সামনে আসিয়া নিঃশব্দে হাত পাতিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। শিহরিয়া উঠিলাম। সহযাত্রী মহাশয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বলিলেন, দেখছেন কি, এই হয়েছে

বেটাদের পেশা। ঐ সব গ্রামের লোক, গ্রাম-ট্রাম আর নেই, তাই রাস্তার ধারে বসতি। চুরি চামারি করে বেড়াবে, আর একটা লোক পেলে যেন ছেঁকে ধরবে মশায়। হারামজাদাদের পুলিশেও ধরে না।

অকস্মাৎ সেই কৃষ্ণছায়াগুলি কথা কহিয়া উঠিল। অতি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর—কিন্তু সেই ছলছলায়িত বিলের প্রান্তে ঘনান্ধকার বর্ষারাত্রির উন্মুক্ত শীতল বায়ু-প্রবাহের মধ্যে আমার মনে হইল, ইন্দ্রিয়াতীত অশরীরী জগৎ হইতে রক্তমাংসের মানুষের উদ্দেশে শত সহস্র প্রেতমূর্তি হাহাকার করিয়া উঠিতেছে। কি তাহারা বলিল, বহুজনের সমবেত কাকুতির মধ্যে তাহার একবিন্দু বুঝিলাম না, শুধু মাথা হইতে পা অবধি বিদ্যুৎ স্পর্শের মতো সুতীব্র কম্পন বহিয়া গেল। হঠাৎ মোটর হইতে তীব্র আলো জ্বলিল, কল ঠিক হইয়া গিয়াছে। ড্রাইভার চিৎকার করিয়া উঠিল: রাস্তা ছাড়্. তফাৎ যা, তফাৎ—

মূর্তিগুলি ছুটাছুটি করিয়া রাস্তার নিচে যে অদৃশ্য প্রান্ত হইতে বাহির হইয়াছিল, মুহূর্ত মধ্যে সেখানে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

আবার দ্বারিক দত্তর কথা মনে পড়িল। দাড়ি নাড়িয়া তিনি কি বলিতেছেন। বুড়া মারা গিয়াছেন বছর আষ্টেক আগে। ভাবিলাম, বুড়াকে মিথ্যুক বলিয়াছিলাম—প্রেতভূমি হইতে তাই কি ডজন পাঁচ-ছয় আমদানি করিয়া বলির নমুনা দেখাইয়া গেলেন?

মা থু র

মাসখানেক মাত্র নিরুদ্দেশ থাকিয়া উমানাথ বাড়ি ফিরিয়াছে কাল রাত্রে। এত শীঘ্র ফিরিবার কারণ, মঠবাড়িতে মেলা লাগিয়াছে, ভাল ভাল কীর্তনিয়ারা আসিয়াছে, বিশেষ করিয়া এবার সোনাকুড়ের বালক-সঙ্কীর্তনের আসিবার কথা। খবরটা কাকপক্ষীর মুখে কি করিয়া তাহার কানে পৌঁছিয়াছিল।

বড় ভাই ক্ষেত্রনাথ দাওয়ায় বসিয়া সকালবেলার মিষ্ট রোদ সেবন করিতে করিতে একখানা দলিলের পাঠোদ্ধারের চেষ্টায় ছিলেন। দলিলটি বহু পুরানো, পোকায় কাটা, জায়গায় জায়গায় ছিঁড়িয়া এমন পাকাইয়া গিয়াছে যে, এক একটা জট খুলিতেই একটি বেলা লাগে।… উমানাথ সোজা সেইখানে উঠিয়া তড়বড় করিয়া আপনার বক্তব্য বলিতে লাগিল।

বিস্মিত চোখে ক্ষেত্রনাথ একবার মুখ তুলিয়া দেখিলেন। কথা শেষ হইলে প্রশ্ন করিলেন: জগদ্ধাত্রীর বাড়ি কবে গিয়েছিলে?

কুড়ি বাইশ দিন আগে।

হৃদয় ছিল সেখানে ?

না।

হুঁ—বলিয়া ক্ষেত্রনাথ চুপ করিয়া নিজের কাজ করিতে লাগিলেন। তারপর হাতের দলিল সযত্নে ভাজ করিয়া রাখিয়া বলিলেন, আমি জগদ্ধাত্রীর চিঠি পেয়েছি পরশুদিন। এখন তোমার ঐ বিশ দিনের বাসি খবর শুনে লাভালাভ নেই।

দলিল বাক্সবন্দি করিয়া ধীরেসুস্থে পরম নিশ্চিন্তভাবে তিনি তামাক ধরাইয়া বসিলেন। এবার বলিবার পালা তাঁহার। কণ্ঠ চিরদিনই প্রবল, আজও তাহার অন্যথা হইল না। বাক্যের তূণ একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেলে ক্ষেত্রনাথ অন্য কাজে চলিয়া গেলেন, তাহার পরেও উমানাথ সেখানে একই ভাবে বসিয়া রহিল।

ঘণ্টা দুই পরে বাড়ির মধ্যে গিয়া তরঙ্গিণীর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। তরঙ্গিণী ভালমানুষের ভাবে জিজ্ঞাসা করিল : বট্‌ঠাকুরের সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল ?

অর্থাৎ এবার দ্বিতীয় কিস্তি। উমানাথ চুপ হইয়া রহিল।

তরঙ্গিণী আবদারের ভঙ্গিতে মোলায়েম সুরে বলিতে লাগিল, তা বল, বল না গো—মেয়েমানুষ, ঘরের কোণে পড়ে থাকি, কামাই ঝামাই করে এলে এদ্দিন পরে, ভালমন্দ কত কি নিয়ে এলে, দেখে এলে, শুনে এলে—বল না দুটো কথা, শুনি।

উমানাথ বলিল, জগদ্ধাত্রী দিদি ওরা দেশে ঘরে ফিরেছেন, তাই বলছিলাম দাদাকে—

গুরুকন্যে ? মস্তবড় খোশখবর, গামছা বখশিস দিই ? তরঙ্গিণী হাসিয়া যেন গলিয়া পড়িতে লাগিল। গামছা হাতে মাথা মুছিতেছিল সেটাকে পরম পুলকে সে স্বামীর দিকে আগাইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, পুরুষের তো মুরোদ হল না যে জন্মের মধ্যে পরিবারের হাতে একটা কিছু দিই এনে, তা আমি দিচ্ছি এই গামছাখানা বখশিস—

মনে মনে আহত হইয়া উষ্ণকণ্ঠে উমানাথ বলিল, গামছা বখশিস কেউ আমায় দেয় না।

তরঙ্গিণী তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া লইল : না, তাও দেয় না। হাসিয়া কহিতে লাগিল, গামছা তো দেয় না, উত্তম মধ্যম দেয় কি-না বোলো তো একদিন—

উমানাথ এ কথায় একেবারে ক্ষেপিয়া গেল।

মহামিথ্যুক তোমরা। বখশিসের কত শাল-দোশালা এনে দিয়েছি এ-যাবৎ,

তবু বার বার ঐ কথা। উত্তম মধ্যম দেয় দিলেই হল অমনি। ডাকো দিকি দশগ্রামের সভা, ডাকো একবার এদিককার যত কবিওয়ালা।

বলিতে বলিতে উত্তেজনার মুখে কবিতা বাহির হইয়া আসিল—

হরেক কবি হরবোলা
সবার উপর ময়রা ভোলা,
তাঁর শিষ্য সহায়রাম,
গুরুর পায়ে কোটি প্রণাম—

গুরু সহায়রামের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া অবশেষে সে কিঞ্চিৎ শান্ত হইল।

তরঙ্গিণী কিন্তু একবিন্দু রাগ করে নাই, তেমনি হাসিভরা মুখ। খানিক পরে উমানাথের রাগ পড়িয়া আসিলে পুনরপি প্রশ্ন হইল: ঠাকরুনের ওখানে স্থিতি হয়েছিল ক'দিন, ওগো?

উমানাথ সদম্ভে বলিতে লাগিল, ক'দিন আবার, যাবার পথেই পড়ল বলেই তো। দলের সমস্ত লোক হাটখোলার পাশে উনুন খুঁড়ে নিল, আমি তো আর তা পারিনে? হাজার হোক পজিশন আছে একটা—

বলিয়া পজিশন মাফিক গম্ভীর হইল।

তবু তরঙ্গিণী সমীহ করিল না। বলিল, তা জানি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করছি, পজিশনটা টিকল কি করে? অতিথ বলে হাতজোড় করে গিয়ে তাঁর উঠোনে দাঁড়ালে?

কথাবার্তার ধরনে মনে মনে শঙ্কিত হইলেও উমানাথ মুখের আস্ফালন ছাড়িল না।

আমার বয়ে গেছে। হঠাৎ দেখা হল, তারপর আমারই হাত ধরে টানাটানি। সে কি নাছোড়বান্দা। কিছুতেই শুনবেন না—

তারপর?

তারপর বিরাট আয়োজন। জগদ্ধাত্রী দিদি আর বাকি রাখেন নি কিছু। দুধ-ঘি সন্দেশ রসগোল্লা মাছ মাংস বাটির পর বাটি আসছে পাতের ধারে। ফুরোয় না।

গম্ভীর কণ্ঠে তরঙ্গিণী কহিল, খাওয়া দাওয়ার পরে?

উমানাথ চমকিয়া গেল। ঝড় প্রত্যাসন্ন। সে পলাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু তাহার আবশ্যক হইল না। ছোটবউ আসিয়া ঢুকিল, তার পিছনে মেজবউ। দু'টিই অল্পবয়সী। ক্ষেত্রনাথের মেজ ও ছোট ছেলের বউ। বিয়ে এই বছর দুই তিন মাত্র হইয়াছে।

জলচৌকির পাশে তেলের বাটি নামাইয়া রাখিয়া ছোটবউ বলিল, নাইতে

যান কাকাবাবু, রাত্তিরে তো উপোস করে আছেন। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম- তা, আমাদের ডাকতে পারলেন না- এমনি আপনি। একদৌড়ে নেয়ে আসুন— নয় তো দেখবেন কি করি।

এই বলিয়া দু'টি বউ মুখোমুখি চাহিতেই ছোটবউ খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দেয়াপাড়া-জাগুলগাছি অঞ্চলে যাহাদের গতায়াত আছে, উমানাথ চাটুজ্জে অর্থাৎ ছোট-চাটুজ্জের পরিচয় তাঁহাদিগকে দিবার দরকার নাই। বর্ষার সময়টা এই সর্বসমেত মাস চারেক বাদ দিয়া বাকি দিনগুলি ছোট-চাটুজ্জের দলের গাওনা লাগিয়াই আছে। দলটা কিন্তু হিসাবমতো উমানাথের নয়, সে বাঁধনদার মাত্র। এবং রাহাখরচ ও টাকাটা-সিকিটা ছাড়া প্রাপ্তিও এমন কিছু নাই। তাই ঘর-বাহিরের ক্রমাগত হিতোপদেশ শুনিতে শুনিতে এক এক সময় উমানাথ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে, ছোটলোকের সমাজে ছড়া কাটিয়া বেড়াইয়া পিতৃপুরুষের মান-ইজ্জত যা ডুবিয়াছে তা ডুবিয়াছে— আর ডুবাইবে না। দিন কতক বেশ চুপচাপ কাটিয়া যায়, সে দিব্যি বাড়ি বসিয়া খাইতেছে, বেড়াইতেছে, ঘুমাইতেছে,—হঠাৎ কেমন করিয়া খবর উড়িয়া আসে, অমুক গ্রামে ভারি হৈ-চৈ—তিন দলে কবির লড়াই, কার্তিক দাস তার শিষ্য অভয়চরণ আর বেহারী ঢুলিকে লইয়া পূব অঞ্চলের সমস্ত বায়না ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিতেছে। পরদিন সকাল হইতে আর ছোট-চাটুজ্জের সন্ধান নাই, খেরো-বাঁধা খাতাগানাও ঐ সঙ্গে অন্তর্ধান করিয়াছে।

বিকালের দিকে মঠবাড়ি হইতে খোলের আওয়াজ আসিতে উমানাথ শশব্যস্তে ঘরে ঢুকিয়া চাদর কাঁধে ফেলিল। বগলে যথারীতি গানের খাতা রহিয়াছে।

দাঁড়াও ছোটদাদু, আমি যাচ্ছি।

ছ-সাত বছরের নিতাইচন্দ্র, কাল মারামারি করিতে গিয়া ফুলপাড় শৌখিন ধুতিখানার ক'জায়গায় ছিঁড়িয়া আসিয়াছে, তরঙ্গিণী তাহাই মেরামত করিতে লাগিয়াছে। উবু হইয়া বসিয়া বসিয়া নিতাই মনোযোগের সঙ্গে শিল্পকার্য দেখিতেছিল, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, আজকে আর থাক রাঙাদিদি, উ-ই দাও। ছোটদাদু মেলায় যাচ্ছে, আমি যাব।

তরঙ্গিণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, যাও ভাই : ছোটদাদু সন্দেশ কিনে খাওয়াবে।

তারপর তরঙ্গিণী নাতিকে কাপড় পরাইয়া সুন্দর করিয়া কোঁচা দিয়া দিল। গায়ে পরাইয়া দিল সবুজ একটি ছিটের জামা, ফুটফুটে মুখখানি অতি যত্নে আঁচলে মুছাইয়া মুগ্ধচোখে কহিল, বর-পত্তোরটি চলেছেন। বউ নিয়ে আসা চাই কিন্তু নিতু বাবু।

উদ্দেশ্যে কিল তুলিয়া নিতু বলিল, বুড়ী।

বুড়ী বলেই তো বলছি মাণিক। কাজ করতে পারিনে, তোমার কাকীরা মনে মনে কত রাগ করে। এমন বউ নিয়ে আসবে যে দু'বেলা আমাদের কাজকর্ম রান্নাবান্না করে খাওয়াবে, কোলে করে সকাল বিকাল তোমায় পাঠশালায় দিয়ে আসবে। কেমন ?

নিতু লজ্জা পাইয়া একদৌড়ে পলাইয়া গেল।

তারপর তরঙ্গিণী হাসিতে হাসিতে উমানাথের দিকে ফিরিয়া বলিল, তুমিও একটা জামা গায়ে দাও। শীতের দিন—এতে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না গো—

উমানাথের অত অবকাশ নাই। কাঁধের চাদরের উপরেই একটা কামিজ ফেলিয়া সে পা বাড়াইল।

পিছন হইতে তবু বাধা : শোন—

তরঙ্গিণী কহিতে লাগিল, ভাসুর ঠাকুর খেতে বসে বড্ড দুঃখ করছিলেন। আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে সব বলছিলেন।

ভূমিকার রকম দেখিয়া উমানাথের মুখ শুকাইল। এক কথায় হাঁ-না করিয়া সরিয়া পড়িবার ব্যাপার ইহা নহে। ওদিকে খোল-করতালের ধ্বনি ক্ষণপূর্বে থামিয়া গিয়াছে ; অর্থাৎ গৌরচন্দ্রিকা সারা হইয়া নিশ্চয় এবার পালা আরম্ভ হইল।

তরঙ্গিণী বলিল, তুমি সাতেও থাক না, পাঁচেও থাক না। অমন দাদা —বাপের মতন বললেই হয়—তাঁর সঙ্গে এসবের কি দরকার ছিল বল তো ?

উমানাথ সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, কিন্তু কথাটা মিথ্যে নয়। সহায়রামের ভিটে থেকে এক সরষেই বিক্রি হয় বছরে কত টাকার ? এতকাল জগদ্ধাত্রী-দিদি বিদেশে পড়ে ছিলেন, নিতে-থুতে আসেন নি—এখন কিছু না দিলে চলবে কেন ?

তরঙ্গিণী ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া তীব্রকণ্ঠে কহিল, এই যুক্তিগুলো কার শেখানো ? জমাজমি আমাদের কি আছে না আছে—কোনো দিন তুমি চোখ মেলে দেখেছ, না খবর রাখ ? জগদ্ধাত্রী-দিদির মায়ায় আজ বড্ড